অলৌকিক চিত্র।

—○০○—

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

—◦○০○◦—

বসুমতী আফিস
১১৫।৪ নং গ্রেষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩১৩ সাল, ১লা ফাল্গুন।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

Calcutta :

PRINTED BY H. L. MUKHERJEE
AT THE
MAKHODA PRESS,
6, Ram Hurry Ghose's Lane, Champatala,
AND
PUBLISHED BY GURUDASS CHATTERJEE,
201, Cornwallis Street.

উৎসর্গপত্র।

অশেষ গুণালঙ্কৃত ও স্বধর্ম্মপরায়ণ জমীদার

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কুন্দনলাল কপূর

মহাশয়ের প্রাতঃস্মরণীয় নামে গ্রন্থকারের

আন্তরিক আশীর্ব্বাদের সহিত

এই যৎসামান্য পুস্তক

উৎসর্গীকৃত

হইল।

অলৌকিক চিত্র।

——:০:——

যোগমায়া।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ শিবরাত্রি। কাশীধামের বিশ্বেশ্বরের মন্দির আজ লোকে লোকারণ্য। সন্ধ্যার সময় অসংখ্য লোক দলে দলে আরতিদর্শনে আসিয়া মন্দির পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে—কাহার সাধ্য এখন আর মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে! এই জনতার মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, যুবতী ও বালিকা, সকলেই যেন—লজ্জাভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, পাগলিনীর ন্যায় সেই অসংখ্যজনতা ভেদ করিয়া বিশ্বেশ্বরের আরতিদর্শনলালসায় মন্দিরের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে! আর তিলার্দ্ধ স্থান নাই! কিন্তু এদিকে জনতারও হ্রাস নাই। ক্রমশঃ মন্দিরের সম্মুখস্থ নাট্য মন্দির ও প্রাঙ্গণাদি জনস্রোততে পরিপপূর্ণ হইয়া

গেল। দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে যেন এক পর্ব্বতবাহিনী স্রোতোস্বিনী আসিয়া, নিম্নস্থ নদ, নদী, তড়াগ পুষ্করিণী প্রভৃতি অকস্মাৎ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল।

"হর হর—বোম্ বোম্—বিশ্বেশ্বর!" কি প্রাণারাম! কি মনোমুগ্ধকারী শব্দ। এককালে অসংখ্যকণ্ঠে নিনাদিত হইয়া, চারিদিক কম্পিত করিতেছে। শঙ্খঘণ্টার সেই ভীষণ রোল, আজ মনুষ্যকণ্ঠের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে। শঙ্খ-ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্য-স্তম্ভনকারী গুরুগম্ভীর কণ্ঠনিঃসৃত সেই "হর বোম্ বোম্ বিশ্বেশ্বর"— কি হৃদয়োন্মাদকারী! আকাশে বিলীন হইতে না হইতেই, ভক্তের হৃদয়োচ্ছ্বাসিত ভক্তিস্রোতে চতুর্দ্দিক যেন একেবারে প্লাবিত হইয়া গেল—ভক্তগণ তখন অশ্রুপ্লাবিত বক্ষঃস্থলস্থাপিত যোড়-করে, গললগ্নীকৃতবাসে এবং গদগদকণ্ঠে সমস্বরে প্রতিধ্বনি করিতেছিল—"হর হর—বোম্ বোম্—বিশ্বেশ্বর!"

ধূপ-ধূনার গন্ধে চারিদিক আমোদিত। ধূনার ধোঁয়ায়, সে আরতির প্রদীপ—ক্ষীণপ্রভ; সুতরাং মন্দিরাভ্যন্তর ঈষৎ অন্ধকারে পরিপূর্ণ। অন্ধকারের মধ্যে চক্রাকারে ক্রমোর্দ্ধনিম্নগামী আরতির আলোকমালা—কি সুন্দর! পুরোহিতগণের বামহস্তে ঘণ্টা আর দক্ষিণহস্তে এই আলোকমালা—সারি—সারি—সারি—কি সুন্দর! আর চতুর্দ্দিকস্থ ভক্তিরস-বিহ্বলচিত্ত অসংখ্য নরনারীর শ্রেণী—কি সুন্দর!

দেখিতে দেখিতে আরতি শেষ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে এককালে অসংখ্য নরনারীর মস্তক বিশ্বেশ্বর-চরণে প্রণত হইল। শঙ্খঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যও থামিল। কিন্তু অদূরে অতি সুললিত

কণ্ঠে তখন বেদমন্ত্র-পঠন-ধ্বনি সকলের শ্রুতিগোচর হইল। সে প্রাণারাম ওঁকার ধ্বনি যে শুনিল, সেই স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তাহারই শরীর তৎক্ষণাৎ রোমাঞ্চিত হইল। কেবল এক জন বাঙ্গালী যুবকের এ সকল দিকে কিছুই লক্ষ্য ছিল না। তিনি যে দেবারাধনার জন্য এ মন্দিরে আসিয়াছেন, তাঁহার আকৃতি দেখিলেও, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার চক্ষু বড়ই অস্থির, সর্ব্বদাই চঞ্চলভাবে মন্দিরের চারিদিকে যেন কাহার অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ক্রমে ক্রমে যখন ধূনার ধূমরাশি অপসারিত হইয়া মন্দিরের আলোকমালা উজ্জ্বলভাব ধারণ করিল, তখন যুবক অদূরে সেই জনতার মধ্যে যাহা দেখিলেন,—তাহাতে তাঁহার সেই সুদীর্ঘ দেহের আপাদমস্তক যুগপৎ কাঁপিয়া উঠিল! পতনোন্মুখ যুবক মন্দিরের একটা স্তম্ভ ধরিয়া অতিকষ্টে দাঁড়াইয়া থাকিতে সমর্থ হইলেন।

যুবক দেখিলেন—সেই মুখখানি! যে মুখ তিনি আজ চারি বৎসর কাল নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন—সেই মুখখানি! যে মুখ তাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে—সেই মুখখানি! যে মুখ শয়নে স্বপনে দিবারাত্রি তাঁহার প্রাণের ভিতর জাগিতেছে—সেই মুখখানি! কিন্তু যুবক শেষবার সে মুখ যেরূপ প্রফুল্ল ও হাস্যময় দেখিয়াছিলেন, এখন কি সে মুখ সেরূপ প্রফুল্ল? সেই চিরপ্রফুল্ল মুখ, এখন যেন একটা বিষাদের আবরণে ঢাকা রহিয়াছে। সেই চম্পক-পুষ্পতুল্য বর্ণ—এখন একেবারে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই আকর্ণ-বিস্তৃত চক্ষুর কোলে কে যেন কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে। নিদাঘ-কিরণ-তাপিত প্রফুল্ল নলিনী, যেন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

তথাপি—এ সেই মুখ! আনন্দোচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে সেই মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া যুবক মনে মনে বলিতেছেন,—"এ সেই মুখ! নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়—সেই মুখ!"

অল্পক্ষণ পরেই সেই জনতা ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। একটি প্রশান্ত সাগর হঠাৎ যেন তরঙ্গাকুলিত হইয়া উঠিল। তখন সেই তরঙ্গ-তাড়িত মনুষ্য-সমুদ্রে অকস্মাৎ সেই মুখখানি যেন ডুবিয়া গেল। যুবক, আকুলপ্রাণে সেই দিকে দৌড়িতে গেলেন; কিন্তু সেই অসংখ্য জনতা ভেদ করিয়া কে দৌড়িতে পারে? অতিকষ্টে দুই-এক পা মাত্র অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেরূপ বলিষ্ঠ না হইলে, নিশ্চয় তাঁহাকে এই সময় সেই অসংখ্য জনতার পদ-দলিত হইতে হইত। অবশেষে, প্রাণপণে, গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে, যুবক মন্দিরের বাহিরে আসিয়া পৌঁছিলেন।

এই গোলযোগের মধ্যে রমণীর কোমল কণ্ঠ-বিনিঃসৃত উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছিল। কেহ, দলভ্রষ্টা হইয়া সঙ্গিনীর নাম উচ্চরবে ডাকিতেছিল; কেহ বা পুত্রকন্যা হারাইয়া, আকুল-কণ্ঠে তাহাদিগের নামে গগন কম্পিত করিতেছিল। যুবক, একমনে সেই সকল কণ্ঠস্বরের প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। সেই বহু কণ্ঠস্বর হইতে—নিশীথে দূর-সমাগত বংশী-রবের ন্যায়—তাঁহার সেই কোকিল-কণ্ঠীর সুমধুর কণ্ঠস্বর কি যুবক চিনিয়া লইতে পারিবেন? অন্য স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর, কখনই সেরূপ মধুর হইতে পারে না! অন্য কণ্ঠস্বর কেবল কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিয়াই বিলীন হইয়া যায়; কিন্তু তাহার সে কণ্ঠস্বর, হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া থাকে। প্রণয়ীর কর্ণ, সাধারণ কর্ণ হইতে অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন; সহস্র কণ্ঠ-স্বরের মধ্যে সে,

আপনার প্রণয়িনীর কণ্ঠস্বর বাছিয়া লইতে পারে। যুবক, এই সময়, সেই অসংখ্য কণ্ঠস্বরের মধ্য হইতে তাহার প্রণয়িনীর কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিলেন। সে কণ্ঠস্বর, তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিল। কিন্তু কৈ? তাঁহার সে প্রণয়িনীকে ত দেখিতে পাইলেন না। যুবক চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন!

কিছুক্ষণ পরে, অদূরে, পথপার্শ্বস্থিত দীপালোকে বেনারসী শাড়ী-পরিহিতা একটী স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইয়া, যুবকের মন হঠাৎ সেইদিকে আকৃষ্ট হইল। দেখিতে দেখিতে, সেই স্ত্রীলোকটী একটা সংকীর্ণ গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। যুবক, তাহাকেই আপন হৃদয়েশ্বরী স্থির নিশ্চয় করিয়া, সেইদিকে ছুটিলেন। কিন্তু সেই সংকীর্ণ গলি—মন্দির হইতে প্রত্যাগত জনতায় তখন পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই আবার স্ত্রীলোক; সুতরাং কিরূপে তাহাদিগকে ঠেলিয়া যুবক অগ্রসর হইবেন? অগত্যা, জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করিয়া, ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। এইরূপে, কিছুদূর গিয়া যুবক দেখিলেন—সেই স্ত্রীলোক বামপার্শ্বস্থ এক সুন্দর অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিল। যুবক, স্থানীয় ক্ষীণালোকে সেই অট্টালিকা বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়া রাখিলেন। কিন্তু যখন সেই অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন, ভিতর হইতে অট্টালিকার প্রবেশ-দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অকস্মাৎ যুবকের মস্তকে যেন ভীষণ বজ্রাঘাত হইয়া গেল। যুবক, কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। পরে, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া, দরজায় আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ

পরে, একজন দ্বারবান দরজা খুলিয়া দিয়া, বিশেষ সমাদরের সহিত তাঁহাকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই, যুবক সম্মুখে একটি নানা ফলপুষ্পসুশোভিত উদ্যান দেখিতে পাইলেন। 'গেটের' সম্মুখ হইতে দুইটি প্রশস্ত সুরকির রাস্তা অট্টালিকা বেষ্টন করিয়া উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই রাস্তার দুই পার্শ্বে ছোট ছোট ফুল-গাছের শ্রেণী এবং মধ্যে মধ্যে আলোক-স্তম্ভ। অদূরে লতা-গুল্মবেষ্টিত দুই একটি তোরণও দেখা যাইতেছিল। জ্যামিতির নানাপ্রকার ক্ষেত্রতত্ত্ব এই উদ্যানে বিরাজমান। ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, বৃত্ত প্রভৃতি আকারের ক্ষেত্রের উপর, গোলাপ, মল্লিকা, জুঁই, কামিনী, বেল প্রভৃতি নানারূপ দেশীয় পুষ্প যথাস্থানে সুশোভিত। অট্টালিকার পশ্চাৎভাগে নারিকেল, আম, জাম, প্রভৃতি নানারূপ ফলের গাছ; তাহাও শ্রেণীর পর শ্রেণী—এইরূপ সুনিয়মে সজ্জিত। উদ্যানের মধ্যস্থলে একটী ফোয়ারা; তাহার চারিদিকে বিশ্রামের জন্য বেদী নির্ম্মিত ছিল।

এই মনোরম উদ্যানে আসিয়া যুবকের চৈতন্য হইল। কি নিমিত্ত এ স্থলে আসিয়াছেন—এরূপ প্রশ্ন কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, কি উত্তর দিবেন, তখন কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে অন্য কাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, এবং তাঁহাকে কেহ কোন প্রশ্নও করিল না। অট্টালিকা জন-

শূন্য নহে, তাহার মুক্ত বাতায়ন হইতে আলো দেখা যাইতেছিল, এবং তাহার প্রকোষ্ঠগুলি যে উত্তমরূপ সুসজ্জিত, যুবক, তাহাতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, তাহা বুঝিতে পারিলেন। দ্বারপালক এইরূপ একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের মধ্যে তাঁহাকে লইয়া গেল। প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াই, যুবক সম্মুখে এক অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি দেখিলেন।

সে মূর্ত্তি দেখিয়া, যুবক আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন; বুঝিলেন—তিনি যাঁহাকে তাঁহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনে করিয়া অযাচিতভাবে এই অজ্ঞাত অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, —এ রমণী তাঁহার হৃদয়ের সে অধিষ্ঠাত্রী দেবী নহেন। আকার ও পরিচ্ছদের সাদৃশ্য থাকাতেই, তাঁহার এইরূপ ভ্রম ঘটিয়াছে। যুবক নির্ব্বাক্ ও নিশ্চল। এরূপ নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতীর সম্মুখে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া, তিনি মনে মনে ভীতও হইয়াছিলেন। আর এই সময় নৈরাশ্যের একটা নিদারুণ যন্ত্রণাও তাঁহার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়াছিল। রমণী কোনরূপ বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ না করিয়া কহিল,—"আপনি কে?"

যুবক কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন; রমণীর প্রশ্নের কোন উত্তরই দিতে পারিলেন না। তার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন,—"আমি বিদেশী।"

রমণী। তা তো আপনার আকার ও পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝিতেছি, কিন্তু কি প্রয়োজনের জন্য আপনি এখানে আসিয়াছেন বলুন।—এ স্থান সম্বন্ধে আপনি পূর্ব্বে কোন কথা শুনিয়াছিলেন কি না?

যুবক।—এ স্থান সম্বন্ধে কোন কথাই আমার জানা নাই। আমি ভ্রমে পড়িয়া এ স্থানে আসিয়াছি।

রমণী।—কি রূপে ভ্রমে পড়িলেন ?

যুবক তখন একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। রমণী সে ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিল,—"আপনি অবাধে সকল কথা সত্য বলুন, কোন কথা গোপন করিবেন না। আমার নিকট মিথ্যা কথা কহিলে, আমি এখনি সমস্তই জানিতে পারিব।"

যুবক বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"বঙ্গদেশের হুগলি জেলার কোন পল্লীগ্রামে আমার নিবাস। আমি ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করি। আমার নাম বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য। আমি অল্পবয়সেই পিতৃমাতৃহীন হই। সংসারেও আমার আর কেহ ছিল না; সেই কারণ যৌবনের প্রারম্ভেই আমি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশ-পর্য্যটনে বহির্গত হই। এইরূপ দুই বৎসর এদেশ-সেদেশ করিয়া বেড়াই। অবশেষে কিছুদিন মুঙ্গেরে অবস্থিতি করি। এই খানে রামকমল বন্দোপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত আমার পরিচয় হয়। ব্রাহ্মণ বৃদ্ধবয়সে স্ত্রীপুত্রবিয়োগশোকে কাতর হইয়া ছয় বৎসর হইল, স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কন্যার সহিত মুঙ্গেরে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার কন্যার নাম প্রভাবতী, বয়স তখন প্রায় চৌদ্দ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত রামকমল কন্যার বিবাহ দেন নাই, এবং বিবাহ দিবার ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। কোন জ্যোতিষী কন্যার হাত দেখিয়া কহিয়াছিলেন যে, বিবাহ দিলেই কন্যার মৃত্যু ঘটিবে। সেই হইতে কন্যার বিবাহ দিবার পক্ষে ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রভাবতীর ন্যায় সুন্দরী রমণীরত্ন আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। তাহার গুণও অসাধারণ ছিল। সেই বালিকার রূপে ও গুণে আমি একেবারে মোহিত হইয়া গেলাম। বালিকাও আমার

ভালবাসিতে আরম্ভ করিল; ক্রমে আমাদের উভয়ের প্রণয় গাঢ়তর হইল। তখন ব্রাহ্মণ সমস্তই জানিতে পারিলেন। একদিন বৈকালে ইহার জন্য ব্রাহ্মণ কন্যাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন —আমি গোপনে দাঁড়াইয়া শুনিলাম। সেদিন ব্রাহ্মণের বাড়ী যাইতে আর আমার সাহস হইল না। পরদিন প্রভাতে গিয়া দেখি—ব্রাহ্মণ, কন্যাকে লইয়া সে বাসা পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। সেই দিন হইতে আজ পাঁচ বৎসর কাল আমি প্রভাবতীর অনুসন্ধানে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। অনেক স্থানে তাহার সন্ধান পাইয়াছিলাম, কিন্তু কোথাও তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি নাই। আজ সন্ধ্যার সময় বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আমি তাহার সাক্ষাৎ পাই; কিন্তু অসংখ্যলোকের জনতায় তাহাকে ধরিতে পারি নাই। তাহারও পরিধানে বেগুণে রংয়ের বেনারসী শাড়ী ছিল, এবং আপনার আকারের সহিত কিছু সাদৃশ্যও ছিল। সেই কারণ প্রভাবতী-ভ্রমে আপনার অনুসরণ করিয়া এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।”

বসন্তকুমারের জীবনী শুনিয়া, রমণী সকটাক্ষে কহিল— “আমি প্রভাবতী নই, আমি যোগমায়া।”

রমণীর নাম শুনিয়া বসন্তকুমার বিস্মিত-নেত্রে তাহার প্রতি চাহিলেন। দেখিলেন—রমণীর চক্ষু দুইটির কিছু বিশেষত্ব আছে। একটি চক্ষুর তারা পিঙ্গলবর্ণ, কিন্তু অপরটি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ! চক্ষের তারার এই বিভিন্নতায়, যুবতীর সৌন্দর্য্যের হ্রাস—না বৃদ্ধি হইয়াছে,—যুবক তাহা সহজে অনুমান করিতে পারিলেন না। কিন্তু চক্ষুর কটাক্ষের যে কিছু বিশেষত্ব

আছে, তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ অনুভব করিতে পারিলেন। সে কটাক্ষে হঠাৎ যেন তাঁহার সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। চৈতন্যের বিলোপ আশঙ্কা করিয়া তিনি মনে মনে বড়ই ভীত হইলেন। বাত্যাহত কদলীপত্রের ন্যায় তখন তিনি ভয়ে কাঁপিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় ঈষৎ হাসিয়া যোগমায়া কহিল—"বসন্তকুমার, কোন ভয় নাই। এখানে কোনরূপ অনিষ্ট আশঙ্কা করিও না। আরও কথা আছে—যদি তুমি আমার বশীভূত হও, তবে নিশ্চয়ই সেই প্রভাবতীকে আমিই তোমায় দিব। আমার এ প্রস্তাবে তুমি সম্মত কি না বল?"

বসন্তকুমার, এই অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীকে পূর্ব্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া, বহুদিনের পরিচিতের ন্যায় আত্মীয়ভাব প্রকাশ করিতে দেখিয়া, মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ যোগমায়ার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। যোগমায়া তখন উচ্চহাস্য করিয়া কহিল—"তুমি যাহার জন্য আপনার এই নবীন জীবন উৎসর্গ করিয়াছ, তাহাকে পাইলেও আমার বশীভূত হও না? এই কি তোমার প্রভাবতীর প্রতি ভালবাসা?"

তখন যোগমায়ার চরিত্রের প্রতি বসন্তকুমারের ভয়ঙ্কর সন্দেহ উপস্থিত হইল। সুতরাং সে স্থান অবিলম্বে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর মনে মনে স্থির করিয়া, তিনি কহিলেন,—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রভাবতী এখন এই কাশীধামেই বাস করিতেছে। যদি আমি চেষ্টা করিয়া তাহার কোন অনুসন্ধান করিতে না পারি, তবে আপনার শরণাগত হইব।"

যোগমায়া বিরক্ত হইয়া কহিল,—"তবে অগ্রে সে চেষ্টা করিয়া দেখুন।"

বসন্তকুমার আর মুহূর্ত্তকাল সে স্থানে অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া আসিলেন। এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই—যোগমায়ার সৌন্দর্য্য বসন্তকুমারের উপর কিছুমাত্র আধিপত্য করিতে পারিল না কেন? ইহার উত্তর—সৌন্দর্য্য নানা প্রকার। যে পূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না ভালবাসে, সে কি নিদাঘের তীব্র সূর্য্যকিরণ পাইলে সুখী হয়?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন অতি প্রত্যূষে, বসন্তকুমার, কাশীর দশাশ্বমেধের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় অসংখ্য নরনারী গঙ্গাস্নানে আসিতেছে ও যাইতেছে—দেখিলেন; কিন্তু তাহাদের মধ্যে তিনি প্রভাবতীকে দেখিতে পাইলেন না। সেখান হইতে নিরাশ হইয়া, তিনি প্রত্যেক দেবালয় ও ছত্র অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইল না। অবশেষে তিনি, কাশীধামের প্রত্যেক ভাড়াটিয়া বাড়ী খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; কিন্তু কোথায়ও কোনরূপ সন্ধান পাইলেন না। ক্রমে দিবাবসানপ্রায় হইল; বসন্তকুমার ক্লান্ত হইয়া এক স্থানে বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিলেন, তার পর কি একটা কথা মনোমধ্যে উদয় হওয়ায়, তিনি

তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং দ্রুতপদে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দিকে চলিলেন।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল; সুতরাং বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আরতির ধুম লাগিয়া গিয়াছে। আজিও মন্দির লোকে লোকারণ্য। কিন্তু বসন্তকুমার যাহার দর্শন-লালসায় সমস্ত দিন অনাহারে ও পদব্রজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, এই লোকসমাগমের মধ্যে তাঁহার সেই জীবনসর্ব্বস্বধন আছে কি? বিগত সন্ধ্যায় যাহাকে দেখিয়া তিনি স্বর্গসুখ অনুভব করিয়াছিলেন, আজি এক মুহূর্ত্তের জন্য একবার তাহার দর্শন মিলিবে না কি? তাঁহার অবশিষ্ট সমস্ত জীবনের বিনিময়ে কি সেই শুভ মুহূর্ত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না? বসন্তকুমার অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু আজ আর তাঁহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন নহে। তখন বিষণ্ণ মনে ধীরে ধীরে মন্দিরের বাহিরে আসিতে লাগিলেন। এই সময়, পথিমধ্যে এক সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া, এবং তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া, তিনি সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"কি পাগ্‌লা বাবা, আমায় চিনিতে পারেন?"

সন্ন্যাসী অল্পক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বসন্তকুমারের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন,—"হাঁ বাবা, চিনিতে পারি বৈ কি। তুমিও যে এক জন পাগ্‌লা ছেলে—তোমায় আর চিনিতে পারিব না? আজও সেইরূপ ঘুরিয়া বেড়াইতেছ?"

বসন্ত।—আপনি বোধ হয়, তার পর অনেক তীর্থ পর্য্যটন করেছেন। আপনার সহিত প্রয়াগে আমার শেষ দেখা হয় নয়?

সন্ন্যাসী।—হাঁ, প্রয়াগেই শেষ দেখা হয়। কিন্তু এখন আমি আর তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াই না। আমি যাঁহাকে খুঁজিয়া

বেড়াইতে ছিলাম, এই কাশীধামেই তাঁহার দর্শনলাভ পাইয়াছি। মানুষ যাহা চায়, চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই তাহা পায়। এখন আমি কাশীবাসী হইয়াছি। এ জীবনে আরও যাহা কিছু আশা আছে, তাহা এই স্থান হইতেই সফল হইবে।

বসন্ত।—আপনার হৃদয়ে নিরাশা কখনও স্থান পায় না। আপনি পুণ্যাত্মা; আপনাকে দর্শন করিলেও দেহ পবিত্র হয়। কিন্তু আমার প্রতি আপনার কৃপা কি হইবে না?

সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন,—"বাবা, তুমি যাহাকে চাও, যদি তাহাকে চিনিতে পারিয়া থাক, তবে সে কোথায় আছে, এ কথাও সেই সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই জানিতে পারিবে। তোমার প্রাণ যাহাকে চায়, তুমি আজও তাহাকে চিনিতে পার নাই বাবা —তাই ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। আমার দ্বারা তোমার কি উপকার হইবে?"

বসন্ত।—আপনার কৃপায় কি না হইতে পারে? এমন অসাধ্য কার্য্য নাই, যা আপনার দ্বারা সাধ্য হইতে পারে না।

সন্ন্যাসী।—আছে বাবা—আমার প্রথম অসাধ্য কার্য্যত—মৃত মনুষ্যকে জীবিত করা, আর দ্বিতীয় অসাধ্য কার্য্য হইতেছে— জীবিত মনুষ্যকে অমর করা। আমি আপাততঃ এই দুই কার্য্যের সাধনায় ব্যস্ত।

বসন্তকুমার, বিস্মিত হইয়া একদৃষ্টে সন্ন্যাসীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"কি বাবা, আমায় পাগল মনে করেতেছ নয়? যোগবলে কি না সম্ভব হয়? শাস্ত্রাধ্যয়ন না করিয়া থাক, কখন কি শুন নাই যে, অমুক যোগী কমণ্ডলুর জল দিয়া অমুক মৃত্যব্যক্তিকে জীবিত করিয়া-

ছেন ? আচ্ছা বাবা, সে সকল উপকথা হইতে পারে। তোমাদের পাশ্চাত্যবিজ্ঞান আজকাল পাশ্চাত্য-প্রদেশে কিনা বিস্ময়কর কার্য্য করিতেছে ? আরও কিছু দিন পরে এই বিজ্ঞানের আরো উন্নতি হইলে দেখিতে পাইবে যে, পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান-বলেই মৃত-ব্যক্তি জীবিত হইবে। আমেরিকা ও ইউরোপে এখন সেই চেষ্টা চলিতেছে। আমি যোগবলের সহিত বিজ্ঞান-বলের মিলন করিয়া দিব—এই দুই অসাধ্য কার্য্য সাধন করিব।"

বসন্ত।—এ যে এক ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য নাই !

সন্ন্যাসী।—কেন বাবা ? তুমি তো এইমাত্র বলিলে যে, এমন অসাধ্য কার্য্য নাই, যাহা আমার দ্বারা সাধিত হইতে পারে না !

বসন্ত।—সে অসাধ্য কার্য্যের সীমা আছে। আমি সসীম অসাধ্য কার্য্যের কথা বলিয়াছিলাম, অসীম অসাধ্য কার্য্যের কথা বলি নাই। আপনার এরূপ চেষ্টা নিশ্চয়ই বৃথা হইবে।

সন্ন্যাসী তখন যেন বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—"তবে তোমারও এই রূপ ঘুরে-বেড়ান নিশ্চয়ই বৃথা হইবে।"

তার পর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন,—"বাবা, তোমার বিজ্ঞানই বলে যে, পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই, যার সম্পূর্ণ ধ্বংশ আছে। আর পৃথিবীর সকল বস্তুর শ্রেষ্ঠ মনুষ্য জীবনটা একেবারে ধ্বংশ হইয়া যাইবে—এ কি সম্ভব ? এই তো গেল তোমার বিজ্ঞানের কথা। এখন বল দেখি বাবা, তুমি কত বৎসর কাল একজন মনুষ্যকে জীবিত থাকিতে দেখিয়াছ ?

বসন্ত।—আমি মনুষ্যের এক শত বৎসর পর্য্যন্ত পরমায়ু দেখিয়াছি।

সন্ন্যাসী।—আমি এখনি তোমায় এমন যোগী দেখাইতে পারি, যিনি যোগবলে আজও সহস্র বৎসর জীবিত আছেন!

বসন্ত।—কোথায় গেলে, এরূপ মহাপুরুষের দর্শনলাভ হয়?

সন্ন্যাসী।—এই কাশীধামে সেরূপ মহাপুরুষের অভাব নাই, যোগমায়ার গৃহে যোগাশ্রমেও এরূপ যোগী আছেন।

বসন্তকুমার বিস্মিত হইয়া কহিল,—"কি! যোগমায়ার গৃহে!"

সন্ন্যাসীও বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন,—"তুমি যোগমায়াকে জান নাকি?"

বসন্ত।—গতকল্য মাত্র আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি।

সন্ন্যাসী।—সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কি বুঝিলে?

বসন্ত।—আমি তাঁহার চরিত্র-সম্বন্ধে বড়ই সন্দিহান হইয়াছি।

সন্ন্যাসী।—তবে তুমি তাঁহাকে কিছুই বুঝিতে পার নাই। যোগিনীর আবার চরিত্র কি?

বসন্ত।—যোগমায়া আবার যোগিনী! যোগিনীর কি সেরূপ বেশভূষার পরিপাট্য থাকে? তবে বোধ হয়, আমি যে যোগমায়ার কথা বলিতেছি, ইনি সে যোগমায়া নন। আমি তাঁকে, এই বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের উত্তরের গলির ভিতর, এক উদ্যান-মধ্যস্থিত অট্টালিকার মধ্যে দেখিয়াছি।

সন্ন্যাসী।—আমিও সেই যোগমায়ার কথা বলিতেছি। যোগমায়া কখনও সন্ন্যাসিনী, কখনও বা বিলাসিনী। বেণারসী শাটী, গেরুয়া বসন—তাঁহার পক্ষে উভয়ই সমান।

বসন্তকুমার তখন অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন,—"তাহা হইলে যোগমায়ার চরিত্র-সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া, আমি বড় অন্যায় কাজ

করিয়াছি। যোগমায়া আমার হৃদয়ে যে আশার সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন, আমার সে আশা কি সফল হইবে?"

সন্ন্যাসী তখন ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"যোগমায়ার অসাধ্য কার্য্য কি আছে?"

বসন্তকুমার আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন,—"তবে আজই আমি তাঁহার শরণাগত হইব।"

এই কথা বলিয়া, বসন্তকুমার দ্রুতপদে মন্দিরের বাহিরে আসিলেন। সন্ন্যাসীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পথে যাইতে যাইতে বসন্তকুমার বলিতে লাগিলেন,—"পাগলা বাবা, যোগমায়ার সহিত আমার বিশেষ কিছু পরিচয় নাই—এমন কি, যোগমায়া আমার নাম পর্য্যন্ত জানেন না। তবে আমার জীবনের কতকগুলি ঘটনার কথা তিনি কেবল শুনিয়াছেন। তাই শুনিয়া, আমায় সাহায্য করিতে তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার সাহায্য লইতে আমি সম্মত হই নাই; কারণ, তাঁহার দ্বারা যে আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে, আমার সে বিশ্বাস হয় নাই।"

সন্ন্যাসী কহিলেন,—"বিশ্বাস! বিশ্বাস না হইলে কি কার্য্যোদ্ধার হয় না? জ্ঞানী লোকে নিজের অস্তিত্বে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেন না; কিন্তু তাঁহাদের কি কার্য্যোদ্ধারের বাকি থাকে?"

বসন্ত।—আপনার মতের সহিত আমার মতের একতা নাই।

যাহা হউক, এখন, যোগমায়া সম্বন্ধে আপনি কি জানেন, আমায় অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

সন্ন্যাসী।—সকলের প্রতি যোগমায়ার এ অনুগ্রহ হয় না। তুমি অতি সৌভাগ্যবান, তাই তোমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ হইয়াছিল। সে অনুগ্রহ পুনরায় হইবে কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না।

বসন্ত।—আচ্ছা, তাঁহার পরিচয়-সম্বন্ধে আপনি কি জানেন, আমায় বলুন। এরূপ মনোরম উদ্যানের মধ্যে এরূপ বৃহৎ অট্টালিকা, অট্টালিকার গৃহগুলিও কেমন সুন্দররূপে সুসজ্জিত—এ সমস্তই কি যোগমায়ার নিজের সম্পত্তি?

সন্ন্যাসী।—সমস্তই যোগমায়ার নিজের সম্পত্তি। ইহা ব্যতীত তাঁহার আরও অনেক সম্পত্তি আছে। যোগমায়ার পিতা, দিল্লীর এক জন প্রধান বণিক ছিলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া তিনি বিশেষ ধনশালী হন। একমাত্র শিশু কন্যা রাখিয়া, হঠাৎ তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তিনি, সেই শোকে অধীর হইয়া পড়েন; এই সময়, এক মহাপুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। মহাপুরুষের জ্ঞানপূর্ণ উপদেশে তাঁহার সকল শোক দূর হয়। তখন, তিনি সেই মহাপুরুষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন; এবং তাঁহার আজ্ঞানুযায়ী ব্যবসা-বাণিজ্য ও দিল্লী সহর পরিত্যাগ করিয়া, শিশু কন্যাটিকে সঙ্গে লইয়া, এই কাশীধামে বাস করিতে আরম্ভ করেন। যোগমায়ার বয়ঃক্রম যখন দ্বাদশ বৎসর, তখন তাঁহার পিতারও মৃত্যু ঘটে। সেই সময় হইতে যোগমায়া, পিতৃত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী। এখন যোগমায়াও সেই মহাপুরুষের শিষ্যা, এবং তাঁহারই নিকট শিক্ষালাভ করিতেছেন। সেই কারণ, যোগমায়া

আজিও কুমারী, এ জীবনে কখন বিবাহ করিবেনও না। আমি যে সহস্র বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত মহাপুরুষের কথা বলিতেছিলাম, ইনি সেই মহাপুরুষ। আমিও তাঁহার শিষ্য। অনেক অনুসন্ধানের পর, যোগমায়ার গৃহে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনলাভ করিয়াছি। আর এই সূত্রে যোগমায়ার সহিত আমারও পরিচয়। এই মহাপুরুষের দ্বারা আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে বলিয়া, আমি সর্ব্বদাই সেখানে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই।

বসন্ত।—তিনি কি সেই সুসজ্জিত অট্টালিকার মধ্যেই বাস করিয়া থাকেন?

সন্ন্যাসী।—অট্টালিকার মধ্যে নয়, সেই উদ্যান-মধ্যস্থিত যোগাশ্রমে।

বসন্ত।—আমি কি সেই মহাপুরুষের শ্রীচরণ দর্শনলাভ করিতে পারিব না?

সন্ন্যাসী।—দর্শনলাভ পাইতে পার, কিন্তু কোনরূপ কথাবার্ত্তা হইবে না। তিনি এখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য, ধ্যাননিমগ্ন যোগী।

বসন্ত।—যোগমায়া যখন এরূপ মহাপুরুষের অনুগৃহিত, তখন তাঁহার দ্বারা আমার উদ্দেশ্যও সফল হইতে পারে। আমি প্রভাবতীর জন্য এ জীবন উৎসর্গ করিয়াছি; যোগমায়াও অনুগ্রহ করিয়া যখন প্রভাবতীকে পুনঃপ্রাপ্তির আশা দিয়াছেন, তখন আমি পুনরায় তাঁহার বাড়ী গিয়া তাঁহারই শরণাগত হইব।

সন্ন্যাসী।—যোগমায়ার অনুগ্রহ হইলে, এখনই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। প্রভাবতী জীবিতাই হউক, বা মৃতাই হউক, কিম্বা তোমার কল্পনার অপূর্ব্ব সৃষ্টিই হউক, যোগমায়ার গৃহে বসিয়া, এখনই তুমি তাহাকে দেখিতে পাইবে।

বসন্তকুমার বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—"যোগমায়ার কি এরূপ অমানুষিক ক্ষমতাও আছে নাকি ?"

সন্ন্যাসী, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"আছে। তবে ইহার জন্য তোমায় তাঁহারই বশীভূত হইতে হইবে। বশীভূত হওয়া আর কি—যোগমায়া তোমার প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলেই, ক্রমে ক্রমে তোমার নিদ্রা আসিবে। তখন তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, তৎক্ষণাৎ তোমার সে প্রার্থনা পূর্ণ হইবে।"

বসন্তকুমার আগ্রহের সহিত কহিলেন,—"তা হলে আমি কি কেবল স্বপ্নে প্রভাবতীকে দেখিতে পাইব ?"

সন্ন্যাসী পুনরায় হাসিয়া কহিলেন,—"স্বপ্ন বলিতে পার, আর ইচ্ছা কর—সত্য ঘটনাও বলিতে পার। তোমার সহিত আমার এখন যে কথাবার্ত্তা হইতেছে—এ ঘটনাকেও যখন তুমি স্বপ্ন বলিলে, আমি কিছুতেই সত্য ঘটনা বলিয়া প্রমাণ করিতে পারি না—তখন স্বপ্ন আর সত্য ঘটনায় প্রভেদ কি ?"

বসন্ত।—তাঁহার চক্ষের কিছু বিশেষত্ব আছে, আমি দেখিয়াছি। যোগমায়া কি যাদুবিদ্যা জানেন না কি ?

সন্ন্যাসী।—এ বিদ্যা, তাঁহার যাদুবিদ্যা নয়; এ বিদ্যা, যোগমায়া যোগবলে লাভ করিয়াছেন।

এই সময়, তাঁহারা যোগমায়ার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বসন্তকুমার, আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, সন্ন্যাসীর পশ্চাতে সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

'গেটের' মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র, বসন্তকুমার, প্রাণের ভিতর কেমন একটা যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। বসন্তকুমার যদিও তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু মনে মনে বড়ই ভীত হইলেন। প্রভাবতীর দর্শনলাভ আশায় আজ যেন কোন ভয়ানক পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাঁহার এইরূপ মনে হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী, তাঁহাকে একটি গৃহের মধ্যে লইয়া গিয়া, অপেক্ষা করিতে বলিলেন। গৃহতল সুমসৃণ শ্বেতকৃষ্ণ মার্‌বেল পাথরে মণ্ডিত। একজন ভৃত্য, সেই মার্‌বেলের উপর একখানি বহুমূল্য সুন্দর 'কার্‌পেট' বিস্তার করিয়া দিল। বসন্তকুমার, সেই কার্‌পেটের উপর উপবেশন করিয়া, যোগিনী যোগমায়ার গৃহের অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে লাগিলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে, গেরুয়া বস্ত্র-পরিহিতা এক যোগিনী-মূর্ত্তি, ধীরে ধীরে সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। বসন্তকুমার, বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া দেখেন—এ মূর্ত্তি সেই যোগমায়ার! বসন্তকুমার, সে মূর্ত্তি দেখিয়া, সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু যোগমায়া, ইঙ্গিতের দ্বারা তাঁহাকে উঠিতে নিষেধ করিলেন। তাহার পর, সেই কার্‌পেটের অপর প্রান্তে নিজে উপবেশন করিয়া কহিলেন,—"বসন্তকুমার, তুমি কি তোমার প্রভাবতীর কোন অনুসন্ধান পাইয়াছ?"

বসন্তকুমার বিনীতভাবে উত্তর করিলেন—"না, পাই নাই। সেইজন্য আপনার শরণাগত হইয়াছি। এখন আপনার অনুগ্রহ হইলে, আমি প্রভাবতীকে পাইতে পারি।"

যোগমায়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—"বসন্তকুমার, তুমি প্রভাবতীকে কিরূপ ভালবাস, প্রথমে তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। যদি সে ভালবাসা প্রকৃত ভালবাসা হয়, তবে তুমি প্রভাবতীকে লাভ করিতে পারিবে।"

বসন্ত।—আমি পাগলা বাবার নিকট আপনার যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে আপনাকে অন্তর্যামী দেবী বলিয়াই মনে হয়। আপনি আমার অন্তর সমস্তই জানিতে পারিতেছেন; আমি যে দিন প্রথম প্রভাবতীকে দেখিয়াছি, সেই দিন হইতে প্রভাবতী আমার ধ্যান, জ্ঞান, প্রাণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, সকলই।

যোগমায়া।—বহু কাল তুমি তাহাকে দেখ নাই। এই সুদীর্ঘ-কাল অদর্শনে, সে ভালবাসার কি কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই?

বসন্ত।—হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে—তাহার সহিত দেখা হইলে বোধ হয়, এরূপ হইত না। একত্রে থাকিলে, হয় তো উভয়ে পরস্পরের নিকট কোন না কোন অপরাধে অপরাধী হইতাম।

যোগমায়া।—তোমাদের এখনও বিবাহ হয় নাই। বিবাহের পূর্ব্বে পরস্পরের প্রতি এরূপ ভালবাসা জন্মান, হিন্দুর চক্ষে বড়ই কলঙ্কের কথা। তুমি প্রভাবতীকে ভালবাসিয়া ভাল কর নাই।

বসন্ত।—আমি তাহার সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইব বলিয়াই, আজ ছয় বৎসর কাল দেশে দেশে তাহার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি। আমার মনে অন্য কোন কু-অভিপ্রায় নাই।

যোগমায়া।—কিন্তু প্রভাবতীর পিতা তোমার সহিত তাহার

যদি বিবাহ না দেন, যদি কন্যার জীবনের আশঙ্কায় আজীবন তাহাকে কুমারী করিয়া রাখেন, তবে তোমার উপায় কি হইবে? সাক্ষাৎ হইলেও, প্রভাবতীকে লাভ করা তোমার দুঃসাধ্য হইবে। তুমি প্রভাবতীর আশা পরিত্যাগ কর।

বসন্তকুমার শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন,—"আমি এ জীবনে সে আশা কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এখন, সেই আশাই আমার প্রাণ। একবার সাক্ষাৎ পাইলে, আমি তাহার পিতার চরণে ধরিয়া, আমার সহিত বিবাহ দিবার সম্মতি প্রার্থনা করিব। আমি সে সময় সে চেষ্টা একবারও করি নাই।"

যোগমায়া।—কিন্তু জ্যোতিষীর গণনা যদি সত্য হয়, যদি বিবাহ দিলে যথার্থই প্রভাবতীর মৃত্যু ঘটে, তবে তুমি তাহাকে কিরূপে বিবাহ করিবে? বিবাহ করিলে, তুমিই তো তাহার মৃত্যুর কারণ হইবে! এই কি তোমার প্রভাবতীর প্রতি ভালবাসা?

বসন্ত।—যদি জ্যোতিষীর কথা যথার্থ হয়, তবে আমি তাহাকে বিবাহ করিব না।

যোগমায়া।—যদি বিবাহ করিবে না, তবে তাহাকে ভালবাসিবে কিরূপে?

বসন্ত।—আমি তাহাকে কেবল ভালবাসিয়াই সুখী হইব; আমি সে ভালবাসার প্রতিদান-প্রার্থী হইব না।

যোগমায়া, একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"তোমার ভালবাসা যথার্থ ভালবাসা বটে! প্রভাবতী কি এতই সুন্দরী?"

বসন্ত।—তাহার সৌন্দর্য্য জগতে অতুলনীয়।

যোগমায়া।—আমার সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে, এ কথা তোমার মুখেই শুনিয়াছি। প্রভাবতী-ভ্রমে আমার অনুসরণ করিয়া, গত কল্য তুমি আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলে। এখন, আমার প্রতি একবার চাহিয়া দেখ—তোমার অন্তরের সে সৌন্দর্য্যের সহিত বাহিরের এ অকিঞ্চিৎকর সৌন্দর্য্যের কি প্রভেদ আছে?

বসন্তকুমার, এ পর্য্যন্ত, যোগমায়ার সহিত কথা কহিতে কহিতে—তাহার প্রতি একবারও দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন নাই। নিম্ন দিকে চাহিয়া, এতক্ষণ ধীরে ধীরে তাঁহার কথার উত্তর দিতে ছিলেন। যোগমায়ার এরূপ প্রস্তাব শুনিয়া, লজ্জায় তাঁহার মুখ আর ও অবনত হইল। আর এই সময়, তাঁহার প্রাণের ভিতর, কি জানি কেন, গুর্ গুর্ করিতে লাগিল। যোগমায়া তখন পুনরায় কহিলেন,—"আমি তোমায় প্রভাবতীকে দেখাইব বলিয়াই, আমার দিকে চাহিতে বলিতেছি। প্রভাবতী এখন কোথায় —কি অবস্থায় কি করিতেছে, এই স্থানে বসিয়া এখনই স্বচক্ষে তুমি দেখিতে পাইবে।"

বসন্তকুমার তখন কম্পিত—হৃদয়ে ধীরে ধীরে যোগমায়ার প্রতি চাহিলেন। উভয়ের চারি চক্ষু একত্রিত হইল। কিন্তু এ কি! বসন্তকুমারের দেহ এরূপ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে কেন? দেখিতে দেখিতে, বসন্তকুমারের দেহ, সেই হর্ম্ম্যতলস্থ আসনে ঢলিয়া পড়িল যে! বসন্তকুমার, তুমি নিদ্রিত হইলে নাকি? বসন্ত-কুমার অকস্মাৎ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত; সুতরাং প্রশ্নের উত্তর আর কে দিবে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তাহার পর, নিদ্রিত বসন্তকুমারকে যোগমায়া প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন,—"তুমি এখন কাহার বশীভূত?"

বসন্তকুমার সেই নিদ্রিত অবস্থায় উত্তর করিলেন,— "আমি এখন আপনারই বশীভূত।"

যোগমায়া।—তুমি কি চাও?

বসন্ত।—আমি প্রভাবতীকে দেখিতে চাই।

যোগমায়া।—সম্মুখে এখন কি দেখিতেছ?

বসন্ত।—একটি ভগ্ন অট্টালিকা।

যোগমায়া।—উহার ভিতর চলিয়া যাও। এইবার বামদিকের প্রথম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখ। কিছু দেখিতে পাইলে কি?

বসন্ত।—যাহাকে দেখিতে চাহিয়াছিলাম, তাহাকেই দেখিতে পাইতেছি। ঐ যে—সম্মুখে আমার প্রভাবতী!

যোগমায়া।—প্রভাবতী এখন কি করিতেছে?

বসন্ত।—সম্মুখে শিবপূজার আয়োজন দেখিতেছি। পূজা শেষ করিয়া, প্রভাবতী এখন করযোড়ে কি প্রার্থনা করিতেছে।

যোগমায়া।—কি প্রার্থনা করিতেছে—মন দিয়া শুন দেখি। কেমন—শুনিতে পাইতেছ?

বসন্ত।—হাঁ, পাইতেছি। প্রভাবতী প্রার্থনা করিতেছে— "হে দেবাদিদেব মহাদেব! আর কত কাল পরে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে? আমি সমস্ত দিন উপবাসে থাকিয়া, কেবল তোমার আরাধনা করিয়া থাকি; এখনও তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইলে

না? আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তোমার আরাধনা করিয়া, আমি নিশ্চয়ই আমার মনোমত পতিলাভ করিব—তুমিই আমার বসন্তকুমারকে আনিয়া দিবে। এই পিতৃমাতৃহীনা অনাথার প্রতি দয়া কর প্রভু!" এই কথা বলিয়া প্রভাবতী, দেবতার চরণে প্রণাম করিতেছে। কি!—প্রণাম করিয়া, প্রভাবতী যে এ গৃহ হইতে চলিয়া যায়! আমাকে প্রভাবতীর সঙ্গে যাইতে দিন; এ জীবনে আমি আর তাহার সঙ্গ ছাড়িব না।

এই সময়, যোগমায়া, বসন্তকুমারের মুখমণ্ডলের উপর আপনার সুকোমল হস্ত তিন-চারি বার চালনা করিয়া, ঈষৎ ক্রোধভরে আজ্ঞা করিলেন,—"ঘুমাও।" তাহাতেই বসন্তকুমার নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন; তাঁহার আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। এমন সময়, পাগ্‌লা বাবা সেই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যোগমায়া, এতক্ষণ একদৃষ্টে বসন্তকুমারের সুষুপ্ত-মুখমণ্ডলের প্রতি চাহিয়াছিলেন; হঠাৎ পাগ্‌লা বাবাকে দেখিয়া যেন শিহরিয়া উঠিলেন! পাগ্‌লা বাবা, সে ভাব কোন লক্ষ্য না করিয়া, কহিলেন,—"আমি সমস্ত ঠিক করিয়া আসিয়াছি। এইবার কি লইয়া যাইতে পারি?"

যোগমায়া, প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিয়া, পরিশেষে স্পষ্ট কহিলেন,—"এ যুবাকে এ অবস্থায় আপনার হস্তে অর্পণ করিব না।"

পাগ্‌লা বাবা বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—"সে কি!"

যোগমায়া।—আপনার এ চেষ্টা বৃথা। মৃত মনুষ্য কখনই জীবিত হইবে না। কেন আপনি এমন সুন্দর যুবার দেহ জন্মের মত নষ্ট করিবেন?

পাগ্‌লা।—এ যুবার দেহে অনেক রক্ত আছে। এ সবল দেহ হইতে কতক রক্ত লইলে, বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না। আর এবার যে নূতন রক্ত সঞ্চালন-যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছি, তাহার পরীক্ষার জন্য আমি বড়ই ব্যগ্র। আমি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব। যোগমায়া, আর বিলম্ব করিও না।

যোগমায়া, তখন বিনীতভাবে উত্তর করিলেন,—"আমায় ক্ষমা করুন। আমি প্রাণ থাকিতে এ যুবাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিব না।"

পাগ্‌লা।—আজ এমন নূতন কথা কেন, যোগমায়া? তুমি এরূপ কত যুবাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছ; কখনও তো তোমার মুখে এরূপ কথা শুনি নাই! আজ তুমি নূতন হইলে নাকি?

অবনত মস্তক উন্নত করিয়া যোগমায়া কহিলেন,—"পাগ্‌লা বাবা, আজ আমি বাস্তবিকই নূতনই হইয়াছি। কাল প্রাতে যে যোগমায়াকে দেখিয়াছিলেন, আমি এখন আর সে যোগমায়া নই!"

বিস্মিত-নেত্রে পাগ্‌লা বাবা যোগমায়ার প্রতি চাহিয়া রহি-লেন! যোগমায়া বলিতে লাগিলেন,—"এখন ঐ যুবার এক বিন্দু রক্তের জন্য আমি হাসিতে হাসিতে আমার নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারি। এ যুবার রক্ত আমি কখনই তোমায় মোক্ষণ করিতে দিব না। আপনাকে মিনতি করি—চরণে ধরি—এরূপ প্রস্তাব আর আমার নিকট উত্থাপন করিবেন না।"

হঠাৎ পাগলা বাবার মুখ হইতে ক্রোধযুক্ত স্বরে নির্গত হইল,—"কেন?—এ যুবা তোমার কে?"

তৎক্ষণাৎ যোগমায়া উত্তর করিলেন,—“এ যুবাই আমার প্রাণেশ্বর! এ যুবা অন্য স্ত্রীলোকের প্রণয়প্রার্থী হইলেও আমি ইহাকেই আমার জীবন, মন, প্রাণ—সমস্তই অর্পণ করিয়াছি।”

পাগ্‌লা বাবা স্তম্ভিত! এরূপ বিস্ময়কর ঘটনা, তাঁহার কল্পনাতীত! তিনি স্বপ্নেও ইহা কখনও প্রত্যাশা করেন নাই। অনেক ক্ষণ পরে, পাগ্‌লা বাবা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“যোগমায়া, তুমি সন্ন্যাসিনী। সন্ন্যাসিনীর মুখে আজ আমায় এরূপ কথা শুনিতে হইল! তুমি যে এত দিন ধরিয়া যোগ-সাধন করিলে, তাহা সমস্তই পণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছ?”

যোগমায়া।—আমি এত দিন ভুল সাধনা করিয়াছি। স্ত্রীলোকের যাহা সাধনা, আমি এত দিন পরে তাহা বুঝিয়াছি। এখন আশীর্ব্বাদ করুন—আমার এ সাধনা যেন সিদ্ধ হয়—এই যুবা যেন আমায় ভালবাসে।

পাগ্‌লা বাবা, বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—“ভালবাসা নিদ্রিতের স্বপ্ন! তুমি কেন এই সার ও নিত্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া, এই অসার ও অনিত্য বস্তুর প্রতি ধাবমান হইতেছ? প্রণয়ের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী বস্তুর জন্য, তুমি চিরস্থায়ী অনন্ত সুখ পরিত্যাগ করিতেছ কেন? যোগমায়া, এই ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য, কেন তুমি তোমার অনন্ত সুখ হারাইবে?”

যোগমায়া তখন গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,—“পাগ্‌লা বাবা, আপনি প্রণয়কে যে চক্ষে দেখেন, বাস্তবিক প্রণয় সেরূপ অসার ও অনিত্য বস্তু নহে। প্রণয় পবিত্র, প্রণয় স্বর্গীয়, প্রণয় অনন্ত,। এ পৃথিবীতে যদি কোন সার ও চিরস্থায়ী বস্তু থাকে, তবে সে প্রণয়—তবে সে ভালবাসা।”

পাগ্‌লা।—যদি তোমার কথাই সত্য হয়—যদি তোমার' হৃদয়মন্দিরে এখন প্রণয়ই একমাত্র উপাস্য দেবতা হইয়া থাকে—যদি তোমার জীবনে প্রণয়ই একমাত্র বাঞ্ছিত সুখ-সপ্ন হয়—যদি এ পাপময় পৃথিবীতে প্রণয়ই তোমার একমাত্র স্বর্গ হয়; তথাপি জিজ্ঞাসা করি, যে যুবা অন্য এক জন স্ত্রীলোকের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী—যাহার জন্য সে এত দিন দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এত যুবা থাকিতে, তুমি এই অন্যাগত-প্রাণ যুবার প্রণয়প্রার্থী হইলে কেন—এ অপরিচিত যুবাকে ভালবাসিলে কেন?

যোগমায়া।—আপনার এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারিব না। সে উত্তর দিবার ক্ষমতাও আমার নাই। আমি আমার নিজের মনকেও এ প্রশ্ন করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কোন উত্তর পাই নাই!

পাগলা বাবা বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—"এ জীবনে প্রণয়ের আস্বাদ কখনই পাই নাই, কিন্তু ইহার কার্য্য দেখিয়া, আজ বড়ই বিস্মিত হইয়াছি। এ পৃথিবীভে প্রণয় পদার্থটা কি?"

যোগমায়া এবার উত্তেজিত হইয়া কহিলেন,—"এ পৃথিবীর সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্ত্তাই প্রণয়। যোগবলে অনেক বিস্ময়কর কার্য্য করিয়াছি; যাদুকরের ন্যায় জলকে এখনই রক্ত করিতে পারি, রক্তকে অগ্নি করিতে পারি, পক্ষীকে সর্প করিতে পারি ও সর্পকে পক্ষী করিতে পারি; কিন্তু প্রণয়ের কি অপূর্ব্ব ক্ষমতা দেখুন।—প্রণয়, মরুভূমিকে ফল-পুষ্প-সরোবর-সুশোভিত উদ্যানে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে—এই হিংসাদ্বেষ-পরিপূর্ণ পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিতে পারে! আর, আপনি যাহার জন্য আপনার

জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, এ পৃথিবীতে সে অসাধ্য-সাধন, কেবল প্রণয়ই করিতে সমর্থ। প্রণয় মৃতদেহকে জীবিত করিতে পারে—প্রণয়ই জীবিতকে অমর করিতে পারে!"

পাগলা।—মিথ্যা কথা। আজ অর্দ্ধশতাব্দী কাল, যোগবল ও বিজ্ঞানের দ্বারা যাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, সকল মনোবৃত্তির নিকৃষ্ট সেই প্রণয় দ্বারা তাহা সুসম্পন্ন হইবে? অসম্ভব—অসম্ভব। আচ্ছা, দেখাও—আমার কার্য্যসিদ্ধির উপায়, তোমার প্রণয়েরই দ্বারা দেখাও।

যোগমায়া।—সাধনা চাই। মনে করিলেই এ কার্য্য হয় না। যদি আমার ভালবাসা দ্বারা, এই অন্যগত-প্রাণ যুবকের মন আমার প্রতি আকৃষ্ট করিতে পারি, যদি এই পরের ধন আপনার করিয়া লইতে পারি, তবেই আমার প্রণয়-সাধনা সিদ্ধ হইবে—তখন আমি সিদ্ধিলাভ করিব। তখন, কিরূপে মৃতদেহ জীবিত হয়, আর জীবিত মানুষ অমর হয়, তাহা দেখাইব! আমি প্রণয়ে অসাধ্য সাধন করিব বলিয়া, এই অকুলসাগরে ঝাঁপ দিয়াছি। এখন, আশীর্ব্বাদ করুন—আমি যেন শীঘ্রই এই অকুলসাগরের কূল পাই।

পাগলা।—যোগমায়া, তুমি আমার আশা ভরসা সমস্তই। তুমি কুপথে গিয়া, সমস্তই নষ্ট করিতে বসিয়াছ। তোমার সাহায্য ব্যতীত, আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে না। তুমি অন্য-পথাবলম্বী হইয়া, আমায় নষ্ট করিতেছ; আর, জগতকেও এক মহা-মঙ্গলকর সিদ্ধিলাভ হইতে বঞ্চিত করিতেছ। এখন আমি চলিলাম; কিন্তু আমার অনুরোধ—তুমি বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও।

এই কথা বলিয়া, পাগ্‌লা বাবা, ধীরে ধীরে সে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। যোগমায়া, তখন সে গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়া দিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ !

গৃহের অর্গলাবন্ধের পর, যোগমায়া, বসন্তকুমারের পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধে মস্তক পর্য্যন্ত, তিন-চারি বার হস্ত-চালনা করিলেন। এই প্রক্রিয়া-দ্বারাই বসন্তকুমারের চক্ষু ধীরে ধীরে উন্মীলিত হইল! বসন্তকুমার সবিস্ময়ে গৃহের চারিদিক অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাহার পর, প্রকৃতিস্থ হইয়া, ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। উঠিয়া বসিয়াই, যোগ-মায়াকে প্রশ্ন করিলেন,—"আমার এ সুখস্বপ্ন ভঙ্গ করিলেন কেন ?"

যোগমায়া উত্তর করিলেন,—"বসন্তকুমার! তুমি যাহা দেখি-য়াছ, তাহা স্বপ্ন নহে—সত্য ঘটনা!"

বসন্ত।—সত্য ঘটনা! তবে কি প্রভাবতী যথার্থই এখন পিতৃহীনা! প্রভাবতী আজিও আমায় ভুলিতে পারে নাই! আমাকে পাইবার আশায়, আজিও সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া, শিবপূজা করে! এ সকল, সমস্তই কি সত্য ঘটনা? যোগমায়া, আপনার চরণে ধরি—মিনতি করি—আমায় প্রভা-বতীর কাছে লইয়া চলুন। আমি প্রভাবতীর জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছি।

বসন্তকুমারের এই কথায়, যোগমায়া শিহরিয়া উঠিলেন; হঠাৎ কি একটা কথা স্মরণ হওয়ায়, তাঁহার মন বড়ই অস্থির হইল। তিনি, কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে বসিয়া রহিলেন; বসন্তকুমারের কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। এদিকে, বসন্তকুমার অধিকতর ব্যাকুলতার সহিত পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"যোগমায়া, আমার প্রতি কি আপনার অনুগ্রহ হইবে না? আমি বড় আশা করিয়া আপনার গৃহে আসিয়াছিলাম; আপনিও অনুগ্রহ করিয়া আমায় প্রভাবতীকে দেখাইয়াছেন। এখন, আমার জীবনের একমাত্র আশা পূর্ণ করুন। কোথায় সেই ভগ্নঅট্টালিকা তাহার 'পথ আমায় দেখাইয়া দিন। প্রভাবতীর জন্য আমার প্রাণ বড়ই অস্থির। আপনার অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া, আমি বুঝিয়াছি যে, আপনি অন্তর্যামী দেবী—আমার অন্তর সমস্তই জানেন। তবে আর কেন আমায় কষ্ট দেন?"

এতক্ষণের পর, একটী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যোগমায়া উত্তর করিলেন,—"বসন্তকুমার, স্থির হও—এত অধীর হইও না। তুমি প্রভাবতীকে কিরূপ ভালবাস, আমি অগ্রে তাহা পরীক্ষা করিয়া, পরে তাহার সহিত তোমার মিলন করিয়া দিব।"

বসন্ত।—আপনি যেরূপে পারেন, সে পরীক্ষা করুন; আমি প্রস্তুত। কিন্তু বিলম্ব করিলে, সে পরীক্ষার আর অবসর পাইবেন না। প্রভাবতীকে না পাইলে, এ জীবন পরিত্যাগ করিব—এই আমার শেষ সঙ্কল্প।

যোগমায়া।—সেরূপ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় বলিতেছি

—আমি তোমায় সুখী করিব। আর অধিক দিন তোমায় প্রভাবতীর জন্য কষ্ট পাইতে হইবে না; আজ হইতে তুমি আমার বশীভূত হইবে—বল?

বসন্ত।—আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি—যদি প্রভাবতীকে পাই, তবে আপনার ঋণ এ জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না। আমি আজীবন আপনার বশীভূত হইয়া থাকিব।

যোগমায়া।—আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি—যদি আমার জীবন দিয়াও তোমায় সুখী করিতে পারি, তবে তাহাও আমি করিব। তুমি কেন এত অধীর হইতেছ?

যোগমায়ার এই কথায়, বসন্তকুমারের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় গলিয়া গেল। এরূপ পরোপকারিণী যোগিনীর প্রতি মনে মনে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধারও উদয় হইল। তখন বসন্তকুমার, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—"দেবি, আর একবার আমায় প্রভাবতীকে দেখান। আর একবার তাহাকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়াছে।"

যোগমায়া, অবনতমস্তকে কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর, মস্তক উত্তোলন করিয়া, গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—"বসন্তকুমার! একবার সতৃষ্ণনয়নে আমার প্রতি চাহিয়া দেখ।"

তখন, মন্ত্রবশীভূত সর্পের ন্যায়, বসন্তকুমার তাহাই করিলেন। কি জানি কেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীর অবসন্ন হইতে আরম্ভ হইল! কোথা হইতে পুনরায় নিদ্রা আসিয়া, তাঁহার চক্ষু একবারে মুদ্রিত করিয়া ফেলিল; বসন্তকুমার আবার ঢুলিতে আরম্ভ করিলেন। তখন, অতিযত্নে, যোগমায়া বসন্তকুমারকে সেই কার্পেটের উপর শয়ন করাইয়া দিলেন। বসন্তকুমারের

এখন আর সংজ্ঞা রহিল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া যোগমায়া, বসন্তকুমারের অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু-সংবলিত মুখখানি দেখিতে লাগিলেন। যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই যেন তাঁহার দর্শন-লালসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যোগমায়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন,—"সেরূপ অবস্থায় প্রভাবতীকে দেখাইয়া, আমি বড় অন্যায় করিয়াছি। প্রভাবতী কি অবস্থায় আছে, পূর্ব্বে তাহা আমার জানিবারও উপায় ছিল না। এখন, এ যে হিতে বিপরীত হইল! প্রভাবতীকে দর্শন করিয়া অবধি, বসন্তকুমারের মন, প্রভাবতীর জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অস্থির দেখিতেছি। আর আমি প্রভাবতীকে দেখাইব না। এখন কিরূপে প্রভাবতীর স্মৃতি ইহার মন হইতে কাড়িয়া লইতে পারি, তাহারই চেষ্টা দেখি।"

তার পর, যোগমায়া, বসন্তকুমারকে আবার প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন,—"বসন্তকুমার! এখন তুমি কার?"

বসন্তকুমার উত্তর করিলেন,—"আমি তোমার—সম্পূর্ণ তোমার।"

যোগমায়া।—তুমি এখন কি?

বসন্ত।—আমি তোমার চক্ষের পুত্তলি!

যোগমায়া।—তোমার দেহ কোথায়?

বসন্ত।—ঐ যে সম্মুখে কার্পেটের উপর পড়িয়া রহিয়াছে।

যোগ।—তুমি স্বচক্ষে আপনার মুখ দেখিতে পাইতেছ কি?

বসন্ত।—হাঁ, পাইতেছি।

যোগমায়া।—বসন্তকুমার, এখন বল দেখি—আজীবন আমার চক্ষের পুত্তলি হইয়া থাকিবে কি না?

বসন্ত।—হাঁ থাকিব।

কিছুক্ষণ যোগমায়া আর কোন প্রশ্ন করিলেন না; কেবল সতৃষ্ণনয়নে বসন্তকুমারের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। মধ্যে মধ্যে সশব্দে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন, এবং প্রতি নিশ্বাসের সহিত তাঁহার বক্ষ অসম্ভব স্ফীত হইতে লাগিল। এই-রূপ ভাবে অর্দ্ধ ঘণ্টা অবস্থিতির পর, যোগমায়া অধিকতর গম্ভীর-স্বরে প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন,—"বসন্তকুমার, এখন তুমি কি ?"

বস।—এখন আমি তোমার মন।

যোগমায়া।—তবে বল দেখি, আমার সম্বন্ধে কি গূঢ় কথা জানিয়াছ ?

বস।—আপনি এক বিদেশী যুবাকে ভাল বাসিয়াছেন।

যোগমায়া।—সে যুবা কি আমায় ভালবাসে ?

বস।—না, সে যুবা অন্য রমণীর প্রণয়-পাশে আবদ্ধ।

যোগমায়া।—আমি সে যুবাকে কিরূপ ভালবাসি ?

বস।—আপনি সে যুবাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন।

যোগমায়া।—তবে সে যুবার কি আমায় ভালবাসা উচিত নয় ?

বস।—উচিত বটে, কিন্তু সে তাহা পারিবে না।

যোগমায়া।—সে যুবা কে ?

বস।—আমি।

যোগমায়া।—তুমি কাহাকে ভালবাস ?

বস।—আমি প্রভাবতীকে ভালবাসি।

যোগমায়া।—আর যোগমায়ার প্রতি কি তোমার কিছুই ভালবাসা নাই ?

বস।—যোগমায়াকে ভালবাসি না; কিন্তু ভক্তি করি।

যোগমায়া।—ভালবাসার প্রতিদান কি ভক্তি?

বস।—প্রভাবতী থাকিতে, আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারিব না।

যোগমায়া।—তবে আমার কথা শোন। প্রভাবতী বলিয়া কোন স্ত্রীলোক—এ পৃথিবীতে নাই! প্রভাবতী তোমার বিকৃত-মস্তিষ্কের কল্পনা প্রসূত মূর্ত্তি-মাত্র। তুমি প্রভাবতীকে ভুলিয়া যাও। তোমার কিছুরই অভাব হইবে না। ভালবাসা, সৌন্দর্য্য, রূপ, যৌবন, ঐশ্বর্য্য—তুমি যাহা চাহিবে, সকলই আমি তোমায় দিব। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—তুমি কিসের প্রয়াসী, বল? সকলই আমার করায়ত্ব। তুমি কি চাও, এখনই বল? যাহা চাহিবে, সকলই দিতে প্রস্তুত আছি।

বসন্ত।—প্রভাবতী ব্যতীত, এ পৃথিবীর আর কিছুই আমি চাই না।

তখন, ক্রোধভরে যোগমায়া কহিলেন,—"এ পৃথিবীতে কিন্তু তোমার প্রভাবতী নাই। প্রভাবতী কাল্পনিক না হইলে, নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু হইয়াছে—জানিও।"

বসন্ত।—প্রভাবতী নাই—প্রভাবতী নাই—প্রভাবতী নাই!

উপরোক্ত কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে, বসন্ত কুমার, উন্মত্তের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন! তখন, সবিস্ময়ে যোগমায়া চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার যোগবল নিষ্ফল হইয়াছে!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বেলা অপরাহ্ন। ছয়টা উত্তীর্ণ হইয়াছে। নিদাঘ-তপনের সে তেজ আর নাই। তেজ চিরকাল কাহারও সমান থাকে না। পশ্চিম-গগনে, ধুনিত তুলারাশির ন্যায়; পুঞ্জীকৃত মেঘ স্তবক সজ্জিত রহিয়াছে। ক্বচিৎ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে আবৃত, ক্বচিৎ লোহিত-রঙ-রঞ্জিত, ক্বচিৎ ধূসর-পাটল-পরিবেষ্টিত। কি অপরূপ শোভা!

নীম্নে—যোগমায়ার উদ্যানেরই বা কি অপরূপ শোভা! বেলা, যুঁই, মল্লিকা, যুথী প্রভৃতি পুষ্পনিচয়—কেহ প্রস্ফুটিত, কেহ অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত, কেহ বা মুকুলিত। সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত। গন্ধবাহী মৃদুল হিল্লোল, সমীপস্থ কৃত্রিম-প্রস্রবণ-সলিল-স্নিগ্ধ হইয়া, পার্শ্বস্থিত বেদিকা-সমূহে জল-কণা সিঞ্চন করিতেছে। তাহারই একটী বেদীকায় বসিয়া, যোগমায়া গভীর চিন্তামগ্না। আকাশের বা উদ্যানের বাহ্য সৌন্দর্য্যে, তাঁহার কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। যোগমায়া, আপনার হৃদয়ের সৌন্দর্য্যেই আত্মহারা। যোগমায়া মনে মনে ভাবিতেছিলেন,—"কি অপরূপ রূপ! এমন রূপ তো কখনও দেখি নাই! কে এ যুবা? এ কি কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা—না মনুষ্য? যুবা যেই হউক, যুবাকে আমার করিব। এ জীবনে আর অন্য সাধনা নাই; এ হৃদয়-মন্দিরে আর কোন দেবতার স্থান হইবে না। এ পৃথিবীতে আর অন্য কাম্যবস্তু আমার নাই। এখন, এই যুবাই আমার সাধনা—এই যুবাই আমার হৃদয়-মন্দিরের একমাত্র দেবতা, এই যুবাই আমার এই পৃথিবীর একমাত্র কাম্যবস্তু। আমি কি এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব না?"

যোগমায়া এইরূপ আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে—এমন সময়, উর্দ্ধে—পশ্চিমাকাশে, কোথা হইতে অকস্মাৎ এক খণ্ড—প্রকাণ্ড কাল মেঘ উঠিয়া, আকাশের সে অপরূপ সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলিল। নীম্নে—উদ্যান-মধ্যেও সে অন্ধকারের কাল ছায়া আসিয়া পড়িল। সেই মৃদুল হিল্লোল তখন বিষম ঝঞ্ঝাবাতে পরিণত হইল। তথাপি যোগমায়ার চিন্তার বিরাম নাই। যোগমায়া তখনও ভাবিতেছিলেন,—"এ যুবা আমার হইবে না কেন? আমি, এত চেষ্টা করিয়াও, তাহার পূর্ব্বস্মৃতি লোপ করিতে পারিলাম না কেন? আমার যোগ শিক্ষায় ধিক্! আমার সাধনায় ধিক্! এখন, কিরূপে তাহার সেই স্মৃতি লোপ করিব? কিরূপে সেই যুবাকে আমার করিব?"

তখন অন্ধকারের মধ্যে বজ্রগম্ভীর-স্বরে নিনাদিত হইল,—"সে যুবা তোমার হইবে না!"

যোগমায়া শিহরিয়া উঠিলেন! সবিস্ময়ে একবার চারি দিক চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন—কেবল অন্ধকার চারিদিকে যেন ঘনীভূত হইতেছে। যোগমায়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এই সময় হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকিল। সেই বিদ্যুতালোকে যোগমায়া দেখিলেন—সম্মুখে এক দীর্ঘাকার ভীষণ মূর্ত্তি! তৎক্ষণাৎ যোগমায়ার মুখ হইতে বহির্গত হইল,—"পাগলা বাবা!"

মূর্ত্তি উত্তর করিল,—"আমি পাগলা বাবা নই। আমি পাগলা বাবার প্রেতাত্মা!"

মূর্ত্তির সেই বজ্রগম্ভীর-স্বর-সম্বলিত এই উত্তরে, যোগমায়া ভীতা হইলেন। তখন সেই মূর্ত্তি পুনরায় কহিল,—"যদি মঙ্গল চাও, আমার সঙ্গে এস।"

ভীতা যোগমায়ার মুখ হইতে নির্গত হইল,—"কোথায় ?"

মূর্ত্তি উত্তর করিল,—"যমালয়ে !"

যোগমায়া নিরুত্তর! মূর্ত্তি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল, —"যোগমায়া, স্মরণ করিয়া দেখ, তোমার যোগবল আমার উপর কখনও ফলদায়ক হয় নাই। সুতরাং আমার কথা কখনও অগ্রাহ্য করিও না। এখনই বৃষ্টি আরম্ভ হইবে। এস—আমার সঙ্গে এস। বসন্তকুমারের কথা ভুলিয়া যাও।"

পাগলা বাবার কথা শেষ হইতে না হইতেই, পুনরায় বিদ্যুৎ চমকিল। পর মুহূর্ত্তেই, ভীষণ শব্দের সহিত, অদূরে এক ভয়ঙ্কর বজ্রাঘাত হইল। মর্ম্মাহত যোগমায়া, মর্ম্মবেদনায় উত্তেজিতস্বরে কহিলেন—"তুমি পাগলা বাবাই হও, আর পাগলা বাবার প্রেতাত্মাই হও, তুমি আমার শত্রু—আমি তোমার সঙ্গে কখনই যাইতে প্রস্তুত নহি।"

এই বলিয়া, যোগমায়া, আপনার অট্টালিকার দিকে দৌড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মূর্ত্তিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। সিক্তবস্ত্রে যোগমায়া আপনার গৃহে প্রবেশ করিলেন।

গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, যোগমায়া, গৃহের অর্গল বন্ধ করিতে গেলেন। মূর্ত্তি, বাধা দিয়া, দরজার চৌকাটের উপর দাঁড়াইল। তখন, যোগমায়া বিস্মিত-নেত্রে দেখিলেন—তাঁহার দরজার উপর দাঁড়াইয়া, তাঁহারই সম্মুখে, পাগলা বাবা হাসিতেছে! হাসিতে হাসিতে পাগলা বাবা কহিলেন,— "যোগমায়া, তুমি আজ আমায় দেখিয়া ভীত হইয়াছ। তোমার

হৃদয়ের সে বল কোথায়? প্রণয় মানুষকে যে দুর্ব্বল করে, তুমিই তাহার প্রমাণ।”

যোগমায়া, ক্রোধ-বিস্ফারিত নয়নে, একবার পাগ্‌লা বাবার দিকে চাহিলেন। তাহার পর উত্তেজিত-স্বরে কহিলেন,—“আমি তোমায় দেখিয়া ভীত হই নাই। কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি।”

পাগ্‌লা বাবা উত্তর করিলেন,—“আমি তোমার মঙ্গলার্থী। মঙ্গলার্থীর কথা, চিরকালই অপ্রিয় হইয়া থাকে। যে পথে যাইতেছ—সে পথ পরিত্যাগ কর।”

যোগমায়া।—এরূপ প্রাণঘাতী উপদেশ, আমি আমার মঙ্গলার্থীর নিকট কখনই প্রত্যাশা করি না। আমি এতাবৎ কাল তোমার কার্য্যের প্রধান সহায় ছিলাম। এখন আমার কার্য্যের হন্তারক না হইয়া, সহায় হইলে, প্রকৃত মঙ্গলার্থীর কার্য্য করা হইত।

পাগলা বাবা।—এখন তুমিও আমার কার্য্যে পূর্ব্বের ন্যায় সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছ কি?

যোগমায়া।—তুমি আমার কার্য্যে সহায় হও; আমিও আজীবন তোমার কার্য্যের সহায়তা করিব।

পাগ্‌লা বাবা।—স্বীকার করিলাম। এখন তবে গৃহের মধ্যে যাইতে দাও।

যোগমায়া, হৃষ্টমনে পাগলা বাবাকে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন। পাগ্‌লা বাবা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কহিলেন,—“এখন আমায় কি সাহায্য করিতে হইবে, বল।”

যোগমায়া।—বসন্তকুমারের মন হইতে তাহার পূর্ব্বস্মৃতি যাহাতে লোপ হয়, সে উপায় করুন।

পাগ্‌লা বাবা, কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন—"আমি, তাহার সকল স্মৃতিই লোপ করিতে পারি। কিন্তু আমার সে ঔষধে বসন্তকুমার পাগল হইয়া যাওয়ারই সম্ভাবনা। তুমি ইহাতে সম্মত আছ কি ?"

যোগমায়া।—আমি এরূপ প্রস্তাবে কখনই সম্মত হইতে পারি না। বসন্তকুমার যাহাতে প্রভাবতীকে ভুলিয়া যায়-আমি কেবল এরূপ করিতে চাই। কেবল প্রভাবতীর স্মৃতি ভিন্ন অন্য স্মৃতি দূর করিতে আমি ইচ্ছুক নই।

পাগলা বাবা, কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া, কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর কহিলেন,—"আচ্ছা, প্রভাবতীকে দূর করিলে হয় না ?"

যোগমায়া।—কিরূপে কোথায় দূর করিবেন ?

পাগ্‌লা বাবা।—ঔষধ-প্রয়োগ-দ্বারা পৃথিবী হইতে দূর করিতে ইচ্ছা করি।

হঠাৎ পথিমধ্যে কালসর্প দেখিলে পথিক যেরূপ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, পাগ্‌লা বাবার এই আকস্মিক ভয়ঙ্কর প্রস্তাবে যোগমায়া তদ্রূপ শিহরিয়া উঠিলেন! ভয়-বিহ্বলিত-চিত্তে হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইল,—"কি—খুন !"

পাগ্‌লা বাবা, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"না, না—তা' কেন ? তবে আর ঔষধের নাম করিলাম কেন ? খুন করিলে পুলিশের যে ভয় আছে তা' কি আমি জানি না ?"

যোগমায়া।—মাথার উপর যে আর একজনের ভয় আছে, সেটা জানা আছে কি ?

পাগ্‌লা বাবা।—মিথ্যা কথা! পূর্ব্বে আমারও ঐরূপ সন্দেহ

ছিল। এখন, সে ভ্রম ঘুচিয়াছে। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস —মাথার উপর আর কেহ নাই!

যোগমায়া।—পূর্ব্বে আপনাকে নাস্তিক বলিয়া আমারও সন্দেহ হইয়াছিল। আজ সে সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইল। এখন, আপনার কথায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, আপনি একজন ঘোরতর নাস্তিক। নাস্তিক না হইলে, বিধাতার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, মানুষকে অমর করিবার জন্য, এরূপ বৃথা চেষ্টায় আপনি জীবন উৎসর্গ করিবেন কেন?

পাগ্‌লা বাবা।—তুমি স্ত্রীলোক। তোমার সহিত সে সকল তর্ক করিতে ইচ্ছা করি না। তবে একটি মাত্র কথা তোমায় স্মরণ করিয়া দিতেছি। তোমার কি মনে নাই—মহাপুরুষই বলিয়াছেন—যোগসাধনায় মানুষ অমর হয়। আমার কথায় বিশ্বাস না হ'ক, মহাপুরুষের কথায় কিরূপে অবিশ্বাস করিবে?

যোগমায়া।—আমি মহাপুরুষের কথায় অবিশ্বাস করি না। কারণ, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, প্রণয়-সাধনায় মানুষ অমর হইতে পারে। আর প্রণয়-সাধন সেই যোগ-সাধনায় একটি অঙ্গমাত্র; বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে।

পাগ্‌লা বাবা—তুমি আবার তর্ক আনিয়া ফেলিলে? এখন সে তর্ক থাক্। যখন আমাদের উভয়ের উদ্দেশ্য এক হইয়াছে, তখন উভয়ে ভিন্ন-পথাবলম্বী হইলেও ক্ষতি নাই। এখন কাহার দ্বারা উদ্দেশ্য সফল হয়, তাহাই দেখা কর্ত্তব্য। প্রভাবতীকে তোমার করায়ত্ত করা, এখন বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। প্রথমে এ কার্য্য না করিলে, তোমার উদ্দেশ্য সফল হইবে না। প্রভাবতী, তোমায় এখানে থাকিলে, বসন্তকুমার তোমার হাত-

ছাড়া হইতে পারিবে না। যদি হঠাৎ বসন্তকুমারের সহিত প্রভাবতীর সাক্ষাৎ হয়, তবে নিশ্চয়ই প্রভাবতীকে লইয়া, সে এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। সে সম্বন্ধে কি উপায় স্থির করিয়াছ?

যোগমায়া।—প্রভাবতী এই কাশীধামে আছে বটে; কিন্তু কোথায় আছে, তাহা আমি জানি না। যোগবলে বসন্তকুমারকে দেখাইয়াছিলাম যে প্রভাবতী এই কাশীধামের মধ্যে এক ভগ্ন-অট্টালিকায় বাস করিতেছে। কিন্তু সে ভগ্ন অট্টালিকা কোথায়, তাহার সন্ধান আমি কিছুই জানি না।

পাগলা বাবা।—আমি সে সন্ধান জানি।

তখন যোগমায়া, অধিকতর আগ্রহের সহিত কহিলেন,—"তবে অনুগ্রহ করিয়া প্রভাবতীকে আমার কাছে কোন সুযোগে লইয়া আসুন। অন্ততঃ তাহাকে একবার দেখিবার সাধ, আমার মনে উদয় হইয়াছে। আর, তাহাকে হস্তগত করিলে, বসন্তকুমারকে পাইবার আশাও মনে উদয় হইতেছে। আপনি এখনই তাহার উপায় করুন।"

পাগলা বাবা।—আজ রাত্রে, এই দুর্য্যোগের সময়, সে কার্য্য হওয়া সুকঠিন। আমি কল্য প্রাতে প্রভাবতীকে তোমার গৃহে আনিয়া দিব। আজ তবে এখন বিদায়।

যোগমায়া।—এই দুর্য্যোগে আপনি কিরূপে যাইবেন?

পাগলা বাবা, উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন,—"আমি দুর্য্যোগ বড় ভালবাসি।"

তাহার পরমুহূর্ত্তেই তিনি অদৃশ্য হইলেন। যোগমায়া আর কোন কথা বলিবারও অবসর পাইলেন না।

নবম পরিচ্ছেদ।

কাশীধামে বাঙ্গালীটোলার উত্তরাংশে একটি সঙ্কীর্ণ গলি। গলির দুইধারে, সারি সারি চারিপাঁচ-তালা বাড়ী। অধিকাংশই প্রস্তর-নির্ম্মিত। গলির মধ্যে সূর্য্যকিরণ কখন প্রবেশ করিতে পারে নাই। দুই ব্যক্তি মাত্র পাশাপাশি যাইতে পারে। তিনজন হইলে, আগুপিছু হইতে হয়। পূর্ব্বমুখে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দক্ষিণমুখে যাইতে হয়। এইরূপ কিছু দূর গিয়া, ঐ গলি, অন্ত একটী অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত গলির সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এই সংযোগ-স্থল হইতে বামদিকের দুইখানি বাড়ীর পর, এক ভগ্ন অট্টালিকা। এই অট্টালিকা, পূর্ব্বে কোন পশ্চিমদেশীয় রাজার ছিল। এক্ষণে, সেই রাজবংশের অবস্থান্তর হওয়ায়, অট্টালিকারও অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। অট্টালিকা জনশূন্য নহে। তিন-চারিটি নিরাশ্রয় নরনারীর আবাস-স্থান। অনেক জীব জন্তুও উহার মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। উহা, অসংখ্য কপোত কপোতী, বাদুড়, চামচিকা, চড়ুই প্রভৃতির লীলাভূমি। অট্টালিকার ছাদের আলিসা ও কার্ণিশ প্রভৃতি, কপোতকপোতী ও বাঁদরবাদরী-দিগের এক প্রকার রাজত্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উন্মত্ত কপোতের 'বক্ বকম্ কম্' রবে, সর্ব্বদাই কপোতী বিতাড়িত হইতেছে। তাহাদের আনন্দোচ্ছ্বাসে, সেই নির্জ্জন স্থান নিয়তই কলরবপূর্ণ। দলে দলে অসংখ্য পারাবত, উর্দ্ধে আকাশে উড়িতেছে; আবার দলে দলে তাহারা নামিয়া ছাদে বসিতেছে। অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি ছোট বড় বৃক্ষসমূহ, বর্দ্ধমান শিকড়সঞ্চারে, বিদীর্ণ ছাদ, আলিসা, প্রাচীর ও দালান প্রভৃতি বেষ্টন করিয়া, আপন অধিকার বদ্ধমূল করিয়া বসিয়া আছে।

এই ভগ্ন অট্টালিকার নিম্নস্থ একটী প্রকোষ্ঠে, এক বৃদ্ধা ও এক যুবতী উপবিষ্টা। উভয়ের মধ্যে, অনেকক্ষণ ধরিয়া, কি তর্ক বিতর্ক হইতেছে। শেষে, বৃদ্ধা, তর্কে পরাস্ত হইয়া, ক্রোধান্বিত-স্বরে কহিল,—"যদি আমার কথা না শুনিস্, তবে এখান হ'তে দূর হ'।"

যুবতী, আপন বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধা, যুবতীর ভাব-গতিক দেখিয়া পুনরায় নরম হইয়া গেল; ধীরে ধীরে যুবতীর হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইয়া, কহিল,—"পাগল মেয়ে আর কি! আমি তোমার ভালর জন্যই বলিতেছি। তোমার এমন রূপ, এমন বয়স; এ বয়সে কি এমন করিয়া থাকিতে আছে মা? মনে করিলে, তুমি রাজরাণী হইতে পার।"

যুবতী, অবনত-মস্তকে, নীরবে, আপন চক্ষের জলে কেবল সেই হর্ম্যতল সিক্ত করিতে লাগিল; বৃদ্ধার কথার কোন উত্তর করিল না।

বৃদ্ধা, পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল,—"রাজি হও মা, রাজি হও। তোমার গায়ে গহনা নাই, পরণে ভাল কাপড় নাই; তাহা দেখিয়া, আমার বুক ফাটিয়া যায়। আমার কথা শুনিলে, তোমার ঐশ্বর্য্যের সীমা থাকিবে না। কত দাসদাসী তোমার সেবা করিবে। তখন তুমি, যাহা মনে করিবে, তাহাই করিতে পারিবে। যাহা ভালবাস—কত দান-ধ্যান-ব্রত নিয়ম করিবে; গরীবদুঃখীকে খাইতে দিতে পারিবে; নিজেও কত সুখস্বচ্ছন্দে থাকিবে। এ সকল সাধ কি হয় না মা? আমার কথার উত্তর দাও।"

যুবতী, তদবস্থায়ই উত্তর করিল,—"আমি আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিব না। অধর্ম্ম পথে যে সুখৈশ্বর্য্য হয়, আমি তাহা চাহি না।"

এই উত্তরে, বৃদ্ধা পুনরায় ক্রোধান্বিতা হইয়া কহিল,—"তবে পেট চলিবে কি করিয়া? আমি আর তোমায় খাওয়াইতে পারিব না।"

যুবতী।—ভিক্ষা করিয়া দিনান্তে একমুষ্টি অন্ন খাইব, সেও ভাল; তথাপি, তোমার এ পাপ প্রস্তাবে কখনই সম্মত হইব না।

বৃদ্ধা।—দুর্গাবাড়ী গিয়া, যে কুমারী হইতে পারে না, সে আবার ভিক্ষা করিবে কিরূপে?

যুবতী।—আমার ন্যায় বয়স্থা কুমারী দেখিলে, অনেকে ঠাট্টা করে; সেই কারণ, আমি দুর্গাবাড়ী যাই না।

বৃদ্ধা।—যে ঠাট্টার আঁচ সহিতে পারে না, সে আবার ভিক্ষা করিবে কিরূপে?

যুবতী।—না পারি, বিষ খাইয়া মরিব।

তখন বৃদ্ধার আর সহ্য হইল না। দন্তে দন্তঘর্ষণ করিতে করিতে, আরক্তলোচনে, বৃদ্ধা কহিল,—"তবে তুই মর্—মর্—মর্।—আর এখানে তোর স্থান হ'বে না। এখনই দূর হ'।"

যুবতী, দ্বিরুক্তি না করিয়া, ধীরে ধীরে আপনার বস্ত্রাদি গুছাইতে আরম্ভ করিল। বৃদ্ধা, তর্জ্জন গর্জ্জনের সহিত সে সকল দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইয়া, যুবতীকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিল। নীরবে নয়নজল মুছিতে মুছিতে, যুবতী রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। এমন সময়, সম্মুখে এক সন্ন্যাসী আসিয়া, রোরুদ্যমানা যুবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"কেন কাঁদ মা?"

সন্ন্যাসীর সান্ত্বনা-বাক্যে, যুবতীর মন কিন্তু আশ্বস্ত হইল না। যুবতী, ভীতমনে, সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিল। সন্ন্যাসী, সে ভাব বুঝিতে পারিয়া, কহিলেন,—"কোন ভয় নাই। এত দিন

পরে তোমার দুঃখের অবসান হইয়াছে। বসন্তকুমার তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমি তোমায় লইতে আসিয়াছি। প্রভাবতী, তুমি আমার সঙ্গে এস।”

প্রভাবতীর সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল! হঠাৎ একটা তাড়িত-প্রবাহ যেন, তাহার নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত, শরীর মধ্যে খেলিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, এই যুবতীই—বসন্তকুমারের সেই জীবনসর্ব্বস্ব প্রভাবতী। আর এই সন্ন্যাসী—আমাদের সেই পাগলা বাবা। এই আকস্মিক ঘটনা, প্রভাবতীর নিকট স্বপ্ন বলিয়া ভ্রম হইল। প্রভাবতী, আপন চক্ষু-কর্ণকেও বিশ্বাস করিতে পারিল না। সুতরাং কেবল বিস্মিত-নয়নে, অবাক্ হইয়া, সন্ন্যাসীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; সন্ন্যাসীর কথার কোন উত্তরই, তাহার মুখে আসিল না। সন্ন্যাসী পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—“তোমার অনুসন্ধানে অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়া, বসন্তকুমার সম্প্রতি কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তোমার জন্য সে বড়ই অধীর। আর কালবিলম্ব করিও না। শীঘ্র আমার সঙ্গে এস।”

তখন প্রভাবতী, প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল,—“আপনি নিশ্চয়ই কোন অন্তর্যামী দেবতা। সন্ন্যাসী বেশে, লুব্ধ আশ্বাসে, আমায় ছলনা করিতে আসিয়াছেন। আপনি জানিবেন, এরূপ লুব্ধ আশ্বাসে হতাশ হইলে আমার কিন্তু মৃত্যু সম্ভব।”

সন্ন্যাসী।—আমি অন্তর্যামী দেবতা নই—সামান্য সন্ন্যাসী। আমার এ সংবাদ—লুব্ধ আশ্বাস নয়—সত্য ঘটনা। মুঙ্গেরের সমস্ত ঘটনা, আমার নিকট কিছুই অবিদিত নাই। এক্ষণেও তুমি যে অবস্থায় আছ, তাহাও আমি জানি। এই মাত্র তুমি তোমার

আশ্রয় হইতে বিতাড়িত হইয়াছ। এখন তুমি নিরাশ্রয়া। কিন্তু তোমার দুঃখের অবসান হইয়াছে। এস মা, আমার সঙ্গে এস। আমি বসন্তকুমারের সহিত তোমার মিলন করিয়া দিব।

প্রভাবতী কি আর স্থির থাকিতে পারে? স্বর্গ হইতে স্বয়ং দেবরাজ পুষ্পরথ লইয়া উপস্থিত হইলেও, প্রভাবতী তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া, এই সন্ন্যাসীর সহিতই যাইত। সুতরাং প্রভাবতী, আনন্দে বিহ্বল হইয়া, নিশি আহূত নিদ্রাপরিত্যক্ত ব্যক্তির ন্যায়, সেই সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে পাগ্‌লা বাবা, প্রভাবতীকে সঙ্গে লইয়া, যোগমায়ার অট্টালিকা-সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই উদ্যান-সংলগ্ন তোরণ মধ্যে পাগ্‌লা বাবাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, প্রভাবতী বিস্মিত হইয়া, পাগ্‌লা বাবার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। পাগ্‌লা বাবা, সহাস্যবদনে নির্ভয়-সূচক ইঙ্গিত করিলেন। প্রভাবতী, ধীরে ধীরে পাগ্‌লা বাবার অনুসরণ করিতে লাগিল। তোরণ-মধ্যে প্রবেশ করিয়াই, তাহার মনে বিস্ময়ের পরিবর্ত্তে ভয়ের সঞ্চার হইল। প্রভাবতীর ক্ষুদ্র হৃদয় গুরু গুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। প্রভাবতী, কম্পিতহৃদয়ে, আরও কিছুদূর অগ্রসর হইল। এইবার প্রভাবতীর মনে হইল যে, সেই গৃহে প্রবেশ করিলেই, তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব বসন্ত

কুমারকে দেখিতে পাইবে। তখন উৎসাহ ও আনন্দে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। যেন উষা-সমাগমে অন্ধকার কোথায় অদৃশ্য হইল। সাহস ও আগ্রহে, প্রভাবতী পাগ্‌লা বাবার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্রুতপদে সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে সম্মুখের প্রকোষ্ঠের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। প্রভাবতী সবিস্ময়ে দেখিল—গৈরিক-বসন-পরিহিতা একটী স্ত্রীলোক, যোগাসনে সেই গৃহমধ্যে উপবিষ্টা আছেন। সে গৃহে আর অন্য কেহ নাই। তবে কৈ? প্রভাবতীর হৃদয়-সর্ব্বস্ব বসন্তকুমার কৈ? প্রভাবতী চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

পাগ্‌লা বাবার পশ্চাতে সেই অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যসম্পন্না যুবতীকে দেখিয়া, যোগমায়ার যোগভঙ্গ হইয়া গেল। যোগমায়া ধীরে ধীরে উঠিয়া, প্রভাবতীর অভ্যর্থনা করিলেন। যেন গঙ্গা আসিয়া যমুনায় মিলিত হইল। পাগ্‌লা বাবা সৌন্দর্য্যের ধার ধারিত না। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কে অধিকতর সুন্দরী, পাগ্‌লা বাবার সে লক্ষ্য ছিল না। যোগমায়া কিন্তু প্রভাবতীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে প্রথমে বিস্মিত হইল। তার পর ধীরে ধীরে তাহার সে বিস্ময় অপসারিত হইল। তখন ঈর্ষা আসিয়া, ক্রমে ক্রমে সে স্থান অধিকার করিতে লাগিল। হৃদয়ের মধ্যে সে ঈর্ষানল চাপিয়া রাখিয়া, যোগমায়া স্মিতমুখে কহিলেন,—"বহিন্, এ তোমার নিজের গৃহ মনে করিও।"

প্রভাবতীর সে সাহস—সে উৎসাহ এখন কোথায় চলিয়া গেল। সে আদর—সে অভ্যর্থনা—সে সুমধুর কণ্ঠস্বর—তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। নিরাশায়, প্রভাবতীর হৃদয় ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল। এই সময়, সতৃষ্ণনয়নে

প্রভাবতী একবার সন্ন্যাসীর প্রতি চাহিল। পাগ্‌লা বাবা, প্রভাবতীর তাৎকালিক মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, যোগমায়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বসন্তকুমার কোথায়? বসন্তকুমারকে দেখিবার জন্য, প্রভাবতী ব্যাকুল হইয়াছে।"

যোগমায়া।—বসন্তকুমার এখন স্থানান্তরে গিয়াছে। অল্পক্ষণ পরেই আসিবে।

প্রভাবতীর হৃদয় আশ্বস্ত হইল। এই সময়, পাগ্‌লা বাবা যোগমায়াকে দূরে লইয়া গিয়া, গোপনে কি কথা কহিলেন। যোগমায়া, সহাস্যবদনে, বিশেষ সমাদরের সহিত, প্রভাবতীকে পার্শ্বস্থিত এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ-মধ্যে লইয়া গেলেন। সেরূপ সুসজ্জিত গৃহ, প্রভাবতী জীবনে কখনও দেখে নাই। সন্ন্যাসিনীর এতাদৃশ গৃহশোভা দেখিয়া, প্রভাবতী অবাক্ হইল। সমস্ত ঘটনাই তখন তাহার নিকট প্রহেলিকাবৎ অনুভূতি হইল। প্রভাবতী মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—"এ সত্য না স্বপ্ন?" প্রভাবতী দুই হস্তে আপনার চক্ষু মার্জ্জনা করিল। পুনরায় চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—সেই সুসজ্জিত গৃহ ও সেই প্রফুল্লমুখী সন্ন্যাসিনী তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান! এইবার প্রভাবতী, একবার যোগমায়ার প্রতি চাহিল। উভয়ের চারিচক্ষু একত্রে মিলিত হইল। কিন্তু এ কি? অকস্মাৎ প্রভাবতীর দেহ এরূপ অবসন্ন হইতেছে কেন! অর্দ্ধ-নিদ্রিতাবস্থায় প্রভাবতী স্বপ্নবৎ দেখিল—তখনও যোগমায়ার সুতীক্ষ্ণ বিলোলকটাক্ষ তাহার নেত্রোপরি স্থাপিত রহিয়াছে! তার পর, প্রভাবতীর আর কোন সংজ্ঞাই রহিল না! প্রভাবতী, যেন নিদ্রাঘোরে অচেতন হইয়া পড়িল। এই সময় পাগ্‌লা বাবা আসিয়া সেই গৃহমধ্যে উপস্থিত হইলেন।

পাগ্‌লা বাবাকে দেখিয়া, যোগমায়া কহিলেন,—"সমস্ত প্রস্তুত। এইবার আপনার কার্য্য করিতে পারেন।"

ক্ষুধিত ব্যাঘ্র যেরূপ করায়ত্ত শিকারের উপর এক লম্ফে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, যোগমায়ার কথা শুনিয়া, পাগ্‌লা বাবাও তদ্রূপ আপনার বিশাল বাহুদ্বয়দ্বারা অচৈতন্য প্রভাবতীর দেহ বেষ্টন করিয়া, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাকে উত্তোলন করিলেন এবং দ্রুতপদে তাহাকে গৃহান্তরে লইয়া চলিলেন। যোগমায়াও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে, উভয়ে একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই গৃহের একটী টেবিলের উপর প্রভাবতীকে শয়ন করান হইল। সেই ক্ষুদ্র গৃহের দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর। দেওয়ালে অসংখ্য নরকঙ্কাল ঝুলিতেছিল। গৃহমধ্যস্থিত একটী আলমারীর মধ্যে অনেক ঔষধ ও যন্ত্রাদি সজ্জিত ছিল। তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া পাগ্‌লা বাবা একটী যন্ত্র বাহির করিলেন। তার পর, উর্দ্ধস্থিত অতি সূক্ষ্ম সূচ্যাগ্রভাগ প্রভাবতীর অঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিয়া, ভীষণ রক্তমোক্ষণ-কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। মধ্যে মধ্যে প্রভাবতীর নাড়ী-পরীক্ষাও করিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল, এই ভীষণ রক্ত-মোক্ষণ-কার্য্য চলিল। আবশ্যক-মত রক্ত, যন্ত্রমধ্যে সঞ্চিত হইয়াছে দেখিয়া, পাগ্‌লা বাবা, তখন প্রভাবতীর অচৈতন্য দেহ হইতে সে যন্ত্র উঠাইয়া লইলেন। নিদাঘ-তাপে প্রফুল্ল সরোজিনী যেরূপ ম্লান হইয়া যায়, প্রভাবতীর বিবর্ণীকৃত দেহ, তদ্রূপ মৃতবৎ টেবিলের উপর পড়িয়া রহিল। তার পর, যোগমায়া সেই অচৈতন্য-দেহে চৈতন্য সঞ্চারের প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও, যোগমায়া, প্রভাবতীর চৈতন্য সম্পাদন

করিতে পারিলেন না। যোগমায়া ভীত হইলেন। ভীত হইয়া, একবার পাগ্‌লা বাবার মুখের দিকে চাহিলেন। পাগ্‌লা বাবা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন! শ্মশানস্থিত প্রেতযোনীর বিকট হাস্যের ন্যায়, যোগমায়ার হৃদয়ে, তাহা অধিকতর ভীতি-সঞ্চার করিল! অগত্যা যোগমায়া, ব্যাকুল অন্তরে, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—"প্রভাবতী! প্রভাবতী!"

পুনরায় বিকট হাস্যের সহিত পাগ্‌লা বাবা উত্তর করিলেন,—"প্রভাবতী নাই!"

অকস্মাৎ রুদ্ধ দ্বার ভগ্ন করিয়া, উন্মত্তের ন্যায় এক ব্যক্তি দৌড়িয়া আসিয়া, কহিল,—"কি! প্রভাবতী নাই?"

যোগমায়ার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। ভয়-বিহ্বল-চিত্তে যোগমায়া চাহিয়া দেখিলেন—সম্মুখে বসন্তকুমার!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই, বসন্তকুমার, সম্মুখে এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া প্রথমে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন! তাহার পর উন্মত্তের ন্যায় প্রভাবতীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন,—"প্রভাবতী! প্রভাবতী!"

কিন্তু প্রভাবতীর কোন উত্তর পাইলেন না। তখন প্রভাবতীকে মৃত নিশ্চয় করিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"কে আমার এই সর্ব্বনাশ করিল? কে আমার প্রভাবতীকে খুন করিল?"

বসন্তকুমারের সেই বিকট চীৎকার চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যোগমায়া, কম্পিত-হৃদয়ে, নির্ব্বাক নিষ্পন্দ-ভাবে, খোদিত প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। সে চীৎকারে পাগ্‌লা বাবার নির্ভীক হৃদয়েও ভয়ের সঞ্চার হইল। পাগ্‌লা বাবার মুখে একটীও কথা বাহির হইল না। এদিকে, বসন্তকুমারের হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদের মধ্যে "খুন! সর্ব্বনাশ!"—শব্দ চারিদিক কম্পিত করিয়া তুলিল।

দেখিতে দেখিতে, পুনরায় সেই গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। তখন মহাতেজপুঞ্জ-কলেবর এক যোগীবর-মূর্ত্তি—ধীর পদবিক্ষেপে সেই গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। যোগীবরের বিশাল দেহ, প্রশস্ত ললাট, শুভ্র কেশ, শ্বেত শ্মশ্রু, আজানুলম্বিত বাহু, বাম হস্তে কমণ্ডলু, মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতির আভা—সকলই ভক্তিরসোদ্দীপক। যোগীবরকে দেখিয়া, যোগমায়া ও পাগ্‌লা বাবা, ভয়-বিস্ময়-বিহ্বলচিত্তে, কম্পিত-কলেবরে, ধীরে ধীরে আসিয়া, তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। যোগীবর, সে প্রণতদ্বয়ের প্রতি কোন লক্ষ্যই করিলেন না। একবার প্রভাবতীর মৃতদেহের প্রতি চাহিলেন; মুহূর্ত্ত-মধ্যে সে দৃষ্টি ঘুরিয়া বসন্তকুমারের প্রতি ন্যস্ত হইল। যোগমায়ার উদ্যানে মহাপুরুষের অবস্থানের কথা, তৎক্ষণাৎ বসন্তকুমারের স্মরণ হইল। বসন্তকুমার "প্রভু! রক্ষা করুন্—প্রভু! রক্ষা করুন্!" —বলিতে বলিতে সেই যোগীবরের চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

"বৎস, ভয় নাই।"—এই অভয়বাণী আশ্বাস দিয়া, মহাপুরুষ, ধীরে ধীরে বসন্তকুমারকে স্বহস্তে উত্তোলন করিলেন। যোগী

বরের আশ্বাস-বাক্যে বসন্তকুমারের মৃতদেহে যেন জীবন-সঞ্চার হইল। ভক্তি-গদগদ চিত্তে যোড়করে দাঁড়াইয়া, বসন্তকুমার, মহাযোগীর সেই অপরূপ রূপ অনিমিষলোচনে দেখিতে লাগিলেন। মহাপুরুষ তার পর, যোগমায়ার প্রতি এক সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—"একি কাণ্ড যোগমায়া?"

গললগ্নীকৃতবাসে, করযোড়ে কম্পিত কলেবরে, যোগমায়া ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—"প্রভু সর্ব্বজ্ঞ—অন্তর্যামী। সকলই জানেন,—সকলই দেখিতেছেন। তথাপি যদি এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, তবে আমায় জিজ্ঞাসা করিবেন না—ঐ পাগলা বাবাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

নৈশপ্রদীপ হস্তোত্থিত আলোকরশ্মি যেরূপ ক্রমে ক্রমে অন্ধকার মধ্যে যথা তথা স্থাপিত করা যায়, মহাপুরুষের সেই জ্যোতির্ময় চক্ষু, তদ্রূপ এইবার পাগলা বাবার ভীতি-বিবর্ণীকৃত মুখের উপর স্থাপিত হইল। সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে—পাগলা বাবার অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তত্ত্ব, মহাপুরুষের আর কিছুই অবিদিত রহিল না—যেন নবাবিষ্কৃত রঞ্জন-কিরণে (Rotengen rays) অন্তরস্থ সমস্তই তাহার চক্ষের উপর স্পষ্টতঃ প্রতিভাত হইল। পাগলা বাবা, অবনত-মুখে, যুক্ত-করে, কহিতে লাগিলেন,—"প্রভু! আপনি জ্ঞাত আছেন—মৃত মনুষ্যকে জীবিত করা এবং জীবিত মনুষ্যকে অমর করা আমার জীবনের প্রধান ব্রত। যাহার জন্য, বিংশতি বর্ষ কাল ধরিয়া, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াও, আমি কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। তার পর, প্রভুর মুখে যে দিন শুনিলাম যে, যোগ-সাধনায় মৃত মনুষ্যকে জীবিত করা যায় এবং জীবিত মনুষ্যে

অমর হইতে পারে—সেই দিন হইতেই প্রভুর ন্যায় যোগীবরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছি। বিজ্ঞান ও যোগ-বলে মৃত মনুষ্যকে জীবিত করিবার চেষ্টা করিতেছি, আর যোগ-বলে নিজে অমর হইবার বাঞ্ছাও রাখি। বিজ্ঞানে বলে, শোণিতই মনুষ্যের জীবন। যে দেহে শোণিত নাই, সেই দেহই মৃত। সেই কারণ জীবিত মনুষ্য-দেহ হইতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রক্ত-মোক্ষণ করিয়া মৃতদেহে তাহার পরীক্ষা করিতেছি। যোগমায়া যোগবল দ্বারা আমার এই কার্য্যে সহায়তা করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি যোগমায়া ঐ বসন্তকুমারের প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। যোগমায়া বলে—প্রণয়ই মৃতদেহ জীবিত করিতে পারে। আর সম্মুখের ঐ স্ত্রীলোক—যোগমায়ার সেই প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দিনী বলিয়া, ইহার অধিক রক্ত-মোক্ষণ করিয়া—"

পাগলা বাবার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। মহাপুরুষের ভ্রূভঙ্গিতে, পাগলা বাবার দেহ, থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পাগলা বাবার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। মহাপুরুষ, বজ্রগম্ভীর-স্বরে কহিলেন,—"থাম্ পাপিষ্ঠ—থাম্। তোরা দুই জনেই কুপথ-গামী হইয়াছিস্। আমি কুক্ষণে তোদের শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। যোগ-সাধনার অর্থ পর্য্যন্ত তোরা এখনও গ্রহণ করিতে পারিস্ নাই। যোগের অন্য অর্থ নাই। 'যোগ' অর্থ—সেই পরম ব্রহ্মের সহিত সংযোগ বা লয়। যে পরম ব্রহ্মে লয় হইল, তাহার আবার মৃত্যু কোথায় রে মূর্খ? সেই ত অমর।"

তার পর মহাপুরুষ, প্রভাবতীর নিকটস্থ হইয়া বামহস্তস্থিত কমণ্ডলু হইতে দক্ষিণ হস্তে গণ্ডুষ প্রমাণ বারি গ্রহণ করিয়া, প্রভাবতীর চক্ষে ও মুখে প্রদান করিলেন; এবং তাহারই কতক

অংশ, প্রভাবতীর গলাধঃকরণ করিয়া দিলেন। তার অল্পক্ষণ পরেই, বসন্তকুমার, বিস্মিত-নেত্রে দেখিলেন—যোগীবরের অপূর্ব্ব মৃত-সঞ্জীবনী শক্তিতে, প্রভাবতীর চক্ষু ধীরে ধীরে উন্মিলিত হইল। সুপ্তোত্থিতের ন্যায় প্রভাবতী, ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। প্রভাবতীর বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টি—প্রথমেই বসন্তকুমারের উপর পতিত হইল। এই সময় নিশ্চয়ই প্রভাবতী মূর্চ্ছিতা হইত, কিন্তু প্রভাবতী যে বসন্তকুমারকেই দেখিতে আসিয়াছে—এই কথা তখন হঠাৎ স্মরণ হওয়ায়, তাহার আর মূর্চ্ছা আসিল না। প্রভাবতী, উঠিয়া দাঁড়াইল। এই সময়, মহাপুরুষ কহিলেন,—"বৎস বসন্তকুমার, আমি আশীর্ব্বাদ করি তুমি প্রভাবতীকে লইয়া সুখী হও। এ পাপ স্থানে আর থাকিও না। এখনই প্রস্থান কর।"

অকস্মাৎ একটা গভীর আনন্দ-উচ্ছ্বাসে, বসন্তকুমারের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে, বসন্তকুমার, সেই মহাপুরুষের চরণে প্রণত হইলেন। বসন্তকুমারকে তদ্রূপ প্রণত দেখিয়া, প্রভাবতীর মস্তকও সেই মহাপুরুষের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। যোগীবর পুনরায় ইঙ্গিত করিবা মাত্র, প্রভাবতীকে সঙ্গে লইয়া, বসন্তকুমার, সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এইবার যোগমায়া ও পাগ্‌লা বাবা, মহাপুরুষের চরণে আছাড় খাইয়া পড়িলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"প্রভু, আমাদের উপায় কি হইবে?"

মহাপুরুষ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"তোমাদের জন্য অবশ্যই এক নূতন নরক সৃষ্টি হইবে।"

যোগমায়া।—প্রভু, ক্ষমা করুন। আমি অজ্ঞ স্ত্রীলোক। না বুঝিয়া, অপরাধ করিয়াছি। কি করিলে এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয়, বলুন। আমি এখনই প্রস্তুত আছি।

পাগ্‌লা বাবা।—প্রভু, আমি মতি-ভ্রান্ত। আমি মনুষ্য-নামের যোগ্য নহি। এ অপরাধের কি প্রায়শ্চিত্ত, দয়া করিয়া, আপনি বিধান করুন।

মহাপুরুষ।—যদি তোমাদের পাপের পরিমাণ নিজ নিজ অন্তরে অনুধাবন করিতে সমর্থ হও, তবেই তোমাদের উপায় হইবে। নতুবা তোমাদের অন্য উপায় আর নাই। যদি সেই পাপানুরূপ পুণ্য কার্য্যের দ্বারা, সঞ্চিত পাপ হইতে মুক্ত হইতে পার, তবেই তোমাদের পাপ-মুক্তি হইবে। নতুবা, মুক্তির আর অন্য উপায় নাই। এখন আমি চলিলাম। আর আমি এ স্থানে থাকিব না।

পাগ্‌লা বাবা, মহাপুরুষের চরণ দুই হস্তে ধারণ করিয়া কহিলেন,—"প্রভু, কত দিন পরে আবার সাক্ষাৎ হইবে?"

মহাপুরুষ।—এক বৎসর পরে। অদ্যকার এই ত্রয়োদশী তিথিতে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।

পাগ্‌লা বাবা।—কোথায় প্রভুর চরণ দর্শন পাইব?

মহাপুরুষ।—তোমার পূর্ব্ব পরিচিত সেই মিহালয় গিরি গহ্বরে।

পূর্ব্বোক্ত কথা কয়েকটী বলিয়া, নিমেষ মধ্যে মহাপুরুষ অদৃশ্য হইলেন!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"আর কতদূর?"

ক্ষীণকণ্ঠে এক পরিশ্রান্ত সন্ন্যাসিনী, সহযাত্রী সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর কতদূর?"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন,—"ঐ যে সম্মুখে সেই অভ্রভেদী হিমালয় পর্ব্বত দেখা যাইতেছে। দেখ, প্রভাতের অরুণ-আভায় শুভ্র শৃঙ্গগুলি কি সুন্দর দেখাইতেছে!"

সন্ন্যাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শৃঙ্গগুলি তো শুভ্র দেখিতেছি, কিন্তু পর্ব্বতের নিম্নাংশ এত কৃষ্ণবর্ণ কেন?"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন,—"নিম্নাংশে বৃক্ষাদি ও জঙ্গল। দূরতাপ্রযুক্ত, সে সকল বৃক্ষ দেখা যাইতেছে না, সেই কারণ ঐ অংশ কৃষ্ণবর্ণ মনে হইতেছে।"

সন্ন্যাসিনী।—পর্ব্বতে বৃক্ষাদিও জন্মে নাকি? প্রস্তরের উর্ব্বরতা-গুণ আছে কি?

সন্ন্যাসী।—হিমালয়ের নিম্নাংশ, বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ। শাল, তমাল প্রভৃতি বড় বড় বৃক্ষ, যথেষ্ট জন্মায়। নানা ফলপুষ্পেও অনেক স্থান সুশোভিত। এরূপ মনোহর পর্ব্বত, পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই।

সন্ন্যাসিনী।—মহাপুরুষের আশ্রম, এখান হইতে কতদূর?

সন্ন্যাসী।—এই যে মাঠ দেখিতেছ, এই মাঠ তিন ক্রোশ। তার পর এক ক্রোশ পর্ব্বতময় পথ ভাঙ্গিলে পর, পরিশেষে সেই আশ্রম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই কথা শুনিয়া, সন্ন্যাসিনী নীরব হইলেন। বলা বাহুলা,

সন্ন্যাসিনী আমাদের সেই যোগমায়া, আর সন্ন্যাসী সেই পাগ্‌লা বাবা। পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার পর, আজ বৎসরান্তে সেই ত্রয়োদশী তিথি। আজ হিমালয়-গিরি-গহ্বরে মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাতের দিন। সেই কারণ, যোগমায়া ও পাগ্‌লা বাবা, তাঁহার উদ্দেশ্যে চলিয়াছেন। বেলা দেড়প্রহরের মধ্যে তাঁহারা সেই মাঠ পার হইলেন। তার পর জঙ্গলমধ্যে সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া, পর্ব্বতে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। তিন ক্রোশ মাঠ হাঁটিতে যে কষ্ট না হইয়াছিল, পর্ব্বতের উপর এক ক্রোশ উঠিতে তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক কষ্ট হইতে লাগিল। সন্ন্যাসিনী বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে তাঁহার দেহের বল অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। কেবল মনের বলে তিনি সেই দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতে সমর্থ হইলেন। বেলা চারিটার সময়, তাঁহারা সেই গিরিগহ্বরের সম্মুখে আসিয়া পৌছিলেন। গহ্বর-পার্শ্বস্থ ঝরণার জলে ক্লান্তিদূর করিয়া গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাপুরুষ তখন যোগমগ্ন ছিলেন। উভয়ে গিয়া, সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে যোগিবরের যোগ-ভঙ্গ হইল। তিনি একবার উভয়ের প্রতি কটাক্ষ করিলেন। তখন, উভয়ে, পুনরায় প্রণাম করিয়া, করযোড়ে নিবেদন করিলেন,—"প্রভু, আমাদের প্রতি কি আদেশ হয়?"

মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎসে যোগমায়া! তুমি তোমার সঞ্চিত পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য, কি কার্য্য করিয়াছ, বল?"

যোগমায়া, বিনীতভাবে উত্তর করিলেন,—"প্রভু, কলিযুগে দানের অপেক্ষা পুণ্যকার্য্য আর কিছুই নাই—এই কথা শুনিয়া-

ছিলাম। আমি সেই কারণ আমার পিতৃদত্ত সমস্ত ধনসম্পত্তি অকাতরে দরিদ্রদিগকে দান করিয়াছি। নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য, এক কপর্দ্দক পর্য্যন্তও রাখি নাই—এখন আমি যথার্থ সন্ন্যাসিনী। প্রভু, দয়া করিয়া বলুন, আমি, এখন আমার পূর্ব্বকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি কি না?"

মহাপুরুষ, সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, গম্ভীরভাবে পাগ্‌লা বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূর্ব্বকৃত পাপনাশের কি উপায় তুমি করিয়াছ?"

পাগ্‌লা বাবা উত্তর করিলেন,—"প্রভু! পরোপকার অপেক্ষা এ পৃথিবীতে আর ধর্ম্ম নাই। আমি সেই পরোপকার-ধর্ম্ম-ব্রতে, আমার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলাম। আমার ধনসম্পত্তি নাই; কিন্তু কায়মনোবাক্যে যতদূর পরোপকার হইতে পারে, সে বিষয়ে কোন ত্রুটি করি নাই। যেখানে কোন পীড়িতকে দেখিয়াছি, আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস-মতে নিস্বার্থভাবে চিকিৎসা করিয়াছি। স্বহস্তে রোগীর সেবা করিতেও কুণ্ঠিত হই নাই; অম্লানবদনে তাহাদের মলমূত্র পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিয়াছি। এখন, বলুন প্রভু, ইহাতে আমার মুক্তির উপায় হইবে কি না?"

মহাপুরুষ, অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে, ঊর্দ্ধাঙ্গ দোলাইতে দোলাইতে বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"বৎসে যোগমায়া! বৎস পাগ্‌লা বাবা! তোমরা যে কার্য্য করিয়াছ, তাহাতে তোমাদের মুক্তির উপায় কিছুই হয় নাই। মুক্তি কি একটা গাছের ফল? এরূপ শত সহস্র জীবনেও কি হয় বলা যায় না।"

মহাপুরুষের ঈদৃশ-মর্ম্মভেদী কঠোর উক্তি শুনিয়া, উভয়েই যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। কিছুক্ষণ উভয়েই স্তম্ভিত—

উভয়েই নীরব! পরে যোগমায়া হঠাশ-ক্ষীণ-কণ্ঠে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভু, আমার কি পুণ্যসঞ্চয় হয় নাই?"

সঙ্গে সঙ্গে পাগ্‌লা বাবাও জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভু, আমার কার্য্যেও কি ধর্ম্মসঞ্চয় হয় নাই?"

মহাপুরুষ, স্মিতমুখে, সেইরূপ দুলিতে দুলিতে উত্তর করিলেন,—"যোগমায়া, তোমার কার্য্যে অবশ্যই পুণ্যসঞ্চয় হইয়াছে। পাগ্‌লা বাবা, তোমারও কার্য্যে ধর্ম্মসঞ্চয় হইয়াছে। এ পুণ্য ও ধর্ম্মের ফলে, তোমরা অবশ্যই স্বর্গসুখ লাভ করিবে। কিন্তু মুক্তির জন্য পূর্ব্বকৃত পাপরাশি নাশের উপায় কর। সে জন্য যে নরক ভোগও আছে।

বিস্মিতনেত্রে, কম্পিত-হৃদয়ে, তখন উভয়ে মহাপুরুষের সেই উজ্জ্বল মুখমণ্ডলের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে অতি ভীত-ব্যঞ্জক-স্বরে উভয়ে মহাপুরুষ চরণে নিবেদন কহিলেন,—"প্রভু! তবে দয়া করিয়া আমাদিগের পূর্ব্বকৃত পাপ নাশের উপায় বলিয়া দিন।"

মহাপুরুষ, তখন ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন,—"অনুতাপই পূর্ব্বকৃত পাপ নাশের একমাত্র উপায়। অবিশুদ্ধ স্বর্ণ যেরূপ অগ্নিসংযোগে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, কলুষিত হৃদয়ও সেইরূপ অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া পবিত্র হয়। বৎসে যোগমায়া! বৎস পাগ্‌লা বাবা! অনুতাপই তোমাদের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। যদি পূর্ব্বকৃত পাপনাশের একান্ত অভিলাষী হইয়া থাক, তবে আর সংসারে যাইবার আবশ্যক নাই। আমার এই আশ্রমে থাকিয়া, তোমাদের কলুষিত হৃদয় অগ্রে অনুতাপানলে পবিত্র কর। পরে মুক্তির উপায় জানিতে পারিবে।"

ধীরে ধীরে তখন সেই সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী সেই পর্ব্বতগহ্বরে বসিয়া পড়িলেন। তার পর যোগীবরের অনুগ্রহে তাঁহারা যোগ-সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। এইরূপে তাঁহাদের জীবনের যে কত কাল কাটিয়া গেল, তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহাদের সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইল কি না—সে সমস্ত আমাদের জানিবারও উপায় নাই।

প্রেমদাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চৈত্রমাস, সুতরাং বসন্তকাল। কেহ বিরহী কি বিরহিণী থাক—সাবধান! আমি বসন্তবর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বেলা তিনটা বাজিয়াছে, ইহারাই মধ্যে ঋতুরাজ বসন্তের দোর্দ্দিণ্ড প্রতাপে প্রাণীমাত্রেই ব্যতিব্যস্ত। বসন্তের মলয়-সমীরণ প্রবলবেগে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার সুখস্পর্শে সকলেরই গাত্রদাহ উপস্থিত। সকলেই 'ত্রাহি মধুসূদন, করিতেছে; কিন্তু ইহার মধ্যে কেবল বিরহিণীকুলই ধরা পড়িয়াছে। এখন বসন্তের চিরসহচর পিকবর সুহৃদ্‌বর কাকৃকে আপন স্থলাভিষিক্ত করিয়া কোথায় অন্তর্ধান হইয়াছে, সুতরাং সে দায়ে পড়িয়া আপনার সুমধুররবে সেই নীরব ও নিস্তব্ধ প্রকৃতিকে মাতাইয়া তুলিতেছে। তাহার সেই শ্রুতিসুখকর—"কা—কা—কা"—রব অনেক বিরহিণীর মনে অন্য কাহার কণ্ঠস্বরের কথা জাগাইয়া

তুলিতেছে! তাহাতেই সেই সরলা, অবলা, কুলবালা, অনাথিনী, কুরঙ্গ-নয়নী, বিরহিণীকুল বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে! তাহাদের রুচি আমের ঝোল ব্যতীত অন্নে রুচি হয় না, জলে বরফ না দিলে পিপাসার শান্তি হয় না, দিবসে আহারান্তে তিন ঘণ্টাকাল নিদ্রা না যাইলে, পেটের ভাত কোনক্রমেই পরিপাক হয় না! ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ-হেন বিরহিণীকুলের সকল দুঃখ বর্ণনা করিতে আমার এই ক্ষুদ্র লেখনী অক্ষম, আর বিশেষতঃ সহৃদয়পাঠকপাঠিকাগণের কোমল মনকে ব্যথিত করিবার ইচ্ছাও আমার নাই, সুতরাং এইখানেই সে দুঃখ বর্ণনায় ক্ষান্ত হইলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রাণীমাত্রেই বিরহ-যন্ত্রণায় অস্থির। এক্ষণে তাহারই দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। একটা কুক্কুর বিরহ-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া নিঃস্বার্থ প্রণয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য একটা ডোবায় ঝাঁপ দিয়াছিল, কিন্তু ডোবার সেই মলয়সমীরণ-সঞ্চারিত, সুতরাং সুখস্পর্শ জলে তাহার বিরহানল কি জানি কেন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল—সে জল হইতে দৌড়িয়া আসিয়া রসহীন সুদীর্ঘ রসনা বাহির করিয়া এখন ধুঁকিতে আরম্ভ করিয়াছে! একটা বৃষ বিরহজ্বালায় অস্থির হইয়া ময়দানস্থিত বৃক্ষচ্ছায়ার শরণাগত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও সে নিদারুণ জ্বালার উপশম না হওয়ায়, ভয়ে ভীত হইয়া এখন সে চক্ষুমুদিয়া আপন প্রভু কন্দর্পদর্পচূর্ণকারী মহাদেবের ধ্যানে মগ্ন হইয়াছে! কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা এই মহাপ্রতাপশালী ঋতুরাজ বসন্তের প্রধান শিকার আমাদের প্রেমদাস। এখন অন্যান্য বাজে কথা রাখিয়া প্রেমদাসের কথাই বলিতেছি।

প্রেমদাস আমাদের এই অধ্যায়িকার নায়ক, সুতরাং প্রেমদাস যে রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, মানে সকলের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, তাহা বোধ হয়, আমায় আর কষ্ট করিয়া কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। তবে নায়ককে আসরে নামাইবার সময় তাহার রূপ ও গুণ বর্ণনা করা গ্রন্থকারদিগের চিরপ্রথা, এই প্রথার অবমাননা করা অপরাধে পাছে নিরপেক্ষ-সমালোচনী বিচারালয়ে আমায় দণ্ডনীয় হইতে হয়, এই ভয়ে পূর্ব্ব হইতেই তাঁবা, তুলসি ও গঙ্গাজল হস্তে সভয়ে শপথ করিয়া বলিতেছি—হে পাঠকপাঠিকাগণ, আপনারা যেখানে যেটি থাকিলে সুন্দর বোধ করেন, আমার নায়কের সেই খানে সেইটিই আছে, অর্থাৎ আপনারা পটলচেরা চক্ষু ভাল বাসিলে, আমার নায়কের পটলচেরা চক্ষুই আছে, খঞ্জন আঁখি ভাল বাসিলে খঞ্জন আঁখিই আছে। ইত্যাদি—ইত্যাদি।

এখন রূপবর্ণনা শেষ করিয়া প্রেমদাসের গুণ-বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম। প্রেমদাস সুসভ্য ও সুশিক্ষিত। যে সে প্রকার বাজে সভ্যতা নহে, এই বিংশতি শতাব্দীর আসল খাঁটি সভ্যতা—মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্যের ন্যায় প্রেমদাসের হৃদয়-মন্দিরকে একেবারে আলোয় কুরখুট্টি করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রেমদাসের শিক্ষাও অসাধারণ শিক্ষা। প্রেমদাস নবেল পড়ে, নাটক পড়ে, থিয়েটারে যায়, স্পীচ দেয়, আর বাহাবা লয় ও হাততালী খায়। তবে সুশিক্ষার অনুরোধে এই নবেল ও নাটক পড়াটা বাস্তবিকই অসাধারণ হইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গালায় এমন নাটক বা নবেল নাই, যাহা প্রেমদাসের স্পর্শে পবিত্র হয় নাই। ইহা ব্যতীত ইংরাজী প্রধান প্রধান উপন্যাস ও নাটক (যথা—**Reynold's Mysteries,**

Joseph Andrews, Don Juan, Venus and Adonis, &c.) প্রেমদাসের ঠোঁটস্থ ছিল, সুতরাং এই সকল ইংরাজী পুস্তক পাঠে তাহার মন যে বিশেষ পবিত্র হইয়াছিল, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সত্যের অনুরোধে আমরা এই স্থলে ইহাও বলিতে বাধ্য যে, এইরূপ ক্রমাগত সুশিক্ষায় প্রেমদাসের হৃদয় বড়ই কোমল হইয়া পড়িয়াছিল। দেখিতে দেখিতে প্রেমদাসের এই কোমল হৃদয়ে অচিরেই প্রণয়-বীজ অঙ্কুরিত হইল! কিন্তু হায়! এ অঙ্কুর বৰ্দ্ধিত হইতে পারে নাই, কারণ অদৃষ্টের দোষেই হউক, আর পিতামাতার নির্বুদ্ধিতার দরুণই হউক, প্রেমদাসের এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই!

প্রেমদাস ভাবিত—তাহার সমবয়স্ক সকলেরই বিবাহ হইল, কিন্তু কি পাপে বিধাতা তাহার অদৃষ্টে বিবাহ লিখিলেন না! এই নিদারুণ চিন্তা সৰ্ব্বদাই প্রেমদাসের হৃদয় দগ্ধ করিত। শেষে প্রেমদাস আর এই হৃদয়দগ্ধকারী যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিল না। অগত্যা প্রেমদাস কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিল। কল্পনায় প্রেমদাস কোন বিংশতি বৎসরে বালিকার প্রণয়ে পড়িত, কল্পনায় সে প্রণয়ের প্রতিদান পাইত, কল্পনায় প্রণয়িনীর জন্য নানা প্রকার যন্ত্রণা সহ্য করিত, কল্পনায় আবার মিলনও হইত, এবং সৰ্ব্বশেষে কল্পনায় বিবাহ করিয়া প্রেমদাস অনন্ত সুখ অনুভব করিত। এইরূপ কিছুদিনের মধ্যেই প্রেমদাসের হৃদয়ে কল্পনা-শক্তির বিশেষ স্ফূর্ত্তি দেখা গেল। কিন্তু এই বসন্ত কালটা পড়িয়া অবধি কল্পনার সেবায় প্রেমদাসের আর সেরূপ সুখ হইত না, এখন প্রেমদাস কেবল ভাবিত—এ জীবনটা কি কেবল কল্পনাস্রোতেই ভাসাইয়া দিব? এ জীবনে কি কার্য্য হইবে না?

বিশেষতঃ এই ঋতুরাজ বসন্তের প্রতাপ এ বৎসর কিছু অধিক মাত্রায় বাড়িয়াছিল; সুতরাং প্রেমদাস সর্ব্বদাই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিত।

আজ ২৮শে চৈত্র। প্রেমদাস করতলে কপোলবিন্যাস করিয়া চিন্তার অনন্তসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছে। বন্ধুবর রাখালদাস নিকটেই বসিয়া তাহার সেই গভীর চিন্তা সাগরের ঢেউ গণনা করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রেমদাস বলিল—"সখে, এ সুখের বসন্ত তো ফুরাইল, এখন আমার দশা কি হইবে?"

বন্ধুবর রাখালদাস বলিল—"পেমা, তুই ছোঁড়া পাগল হ'লি নাকি?"

প্রেম। সখে পাগল হইলে ত সুখী হইতাম। হায়! আমি পাগল হইলাম না কেন? পাগলেরা কি এত যন্ত্রণা সহ্য করে?

রাখাল। তোর যন্ত্রণাটা কি রে প্রেমা?

প্রেম। আন সখে! আন তীক্ষ্ণ ছুরি।

হৃদয় চিরিয়া দেখাব তোমায়—
কি যন্ত্রণা আমি সহ্য করি!

রাখাল একটু মুচকিয়া হাসিয়া আপন পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া বন্ধুর হস্তে দিয়া বলিল—"কি ভাগ্যি, ছুরিখানা আমার নিকটেই ছিল, এখন ভাই, হৃদয় চিরিয়া তোমার যন্ত্রণাটা একবার দেখাও দেখি।"

ছুরির সেই সুচিক্কণ ফলা দেখিয়া তাহার তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধে প্রেমদাসের আর কোন সন্দেহ রহিল না। তখন প্রেমদাস ভীতমনে ধীরে ধীরে বলিল—"হায় সখে! আমি যথার্থই পাগল হইয়াছি।

তাহা না হইলে এ ভ্রম আমার হইবে কেন? সখে! মনে বড়ই কষ্ট রহিল,—এ হৃদয় যে দেখাইবার নয়। এ কথা আমি অনেক প্রণয়িণীর মুখে শুনিয়াছি, তাহা না হইলে আজ স্বহস্তে এ হৃদয় চিরিয়া তোমায় দেখাইতাম। রাখ ভাই! তোমার এ ছুরি লুকাইয়া রাখ।”

রাখাল। যন্ত্রণাটা তবে দেখা হ'লো না। এখন বল্ দেখি পেমা, তোর এ রোগটা কি?

প্রেমা। রোগ বড়ই কঠিন সখে!

রাখাল। কঠিন ঔষধও আছে হে সখে।

প্রেম। আর সহ্য করিতে পারি না! আজ তবে এই হৃদয়ের বোঝা তোমার নিকট নামাইব—

এই বলিয়া ঝনাৎ করিয়া প্রেমদাস আপন হৃদয়ের কপাট যেন খুলিয়া ফেলিল। কপাটের খিলটা বোধ হয় বড়ই আঁটিয়া ধরিয়াছিল, সেই কারণ প্রেমদাসের দীর্ঘ নিশ্বাস ও মুখভঙ্গীর সহিত যন্ত্রণাসূচক—'আঃ'—শব্দটার কিছু বিশেষত্ব দেখা গেল। প্রেমদাস হৃদয়ের কপাট খুলিয়াই হাঁপাইয়া পড়িল। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতে লাগিল। মুখ কিছু রক্তিমাবর্ণ হইল। প্রেমদাস প্রেমের বর্ণনা আরম্ভ করিল—“সখে, আমার হৃদয় তোমার হৃদয়ের ন্যায় মরুভূমি নহে। এ হৃদয়ে প্রণয়-বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। লোকলজ্জা ভয়ে এ কথা এতদিন প্রকাশ করি নাই, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, সে প্রণয় অঙ্কুর শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। আমি আর সেই বর্দ্ধিত প্রণয়কে এ ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে পূরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। সখে, তোমার চরণে ধরি, মিনতি করি, যাহা হয় শীঘ্র আমার একটা উপায়

করিয়া দাও। আজ ২৮শে চৈত্র—আর দুই দিন পরেই এই সুখের বসন্ত চলিয়া যাইবে, তখন এ প্রণয় লইয়া আমি কি করিব? তুমি ইহারই মধ্যে আমার একটা উপায় করিয়া দাও।"

এই সময় আমাদের সেই পরিচিত কোকিলস্থলাভিষিক্ত বসন্তের কাকটা "কা—কা—কা—" করিয়া ডাকিয়া উঠিল। প্রেমদাস অমনি রাখালদাসের গলা জড়াইয়া ধরিল, এবং চক্ষু মুদিয়া ভয়ে ঠক্ ঠক্ কাঁপিতে আরম্ভ করিল। রাখাল তাহার এই রকম অবস্থা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া গলা ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন প্রেমদাস সভয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"সখে, আমায় ধর, ধর, ধর! আমার বুঝি—বিরহ চাগাইল!"

রাখাল। কেন তোমার হ'য়েছে কি?

প্রেম। ঐ বসন্তের কোকিলের ডাকে আমার বুঝি বিরহ হ'লো।

রাখাল। ডাক্তার ডাক্‌বো নাকি?

প্রেম। না।

রাখাল। তবে কি ভূতের ওঝা?

প্রেম। তাহাও নয়। হায় সখে, বিরহের পর যে মিলন তাহাও তুমি ভুলিয়া গিয়াছ?

রাখাল। আমি কি তোমার বৃন্দে দূতী না কি? তা হঠাৎ এমন বিরহটা হ'লো কেন?

প্রেম। সে দোষ আমার নহে, তাহার জন্য যদি ভৎর্সনা করিতে ইচ্ছা কর, তবে ঐ পোড়া বসন্তের কোকিলটাকে ভৎর্সনা কর।

এই বলিয়া প্রেমদাস সেই কাকটাকে দেখাইয়া দিল। তখন

রাখালদাস হাসিতে হাসিতে বলিল—"তুমি কি চক্ষু কর্ণেরও মাথা খেয়েছ নাকি? ও ত তোমার কোকিল নয়—কাক যে!"

তখন প্রেমদাসের চৈতন্য হইল। তাড়াতাড়ি রাখালের গলা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—"তা ভাই, তুমি এতক্ষণ আমায় বল নাই কেন? সখে, আমার এ বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করাও বৃথা হইল।"

বলিতে বলিতে প্রেমদাসের চক্ষে অশ্রু দেখা দিল। প্রেমদাসের অবস্থা দেখিয়া রাখাল তখন মনে মনে ভাবিল, বন্ধুর রোগটা সহজ রোগ নহে, সুতরাং ইহার জন্য একটু কঠিন ঔষধের আবশ্যক হইবে। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া মনে মনে কি একটা মৎলব স্থির করিয়া প্রকাশ্যে বলিল—"সখে! তুমি কাহার রূপে মোহিত হইয়াছ?"

প্রেম। সে শুভাদৃষ্ট এখনও আমার হয় নাই। তাহা হইলে কি আর এ বিরহযন্ত্রণাকে যন্ত্রণার মধ্যে গণ্য করি? আমার এ প্রণয় আধারশূন্য, লক্ষ্যশূন্য, সুতরাং হৃদয়ভেদকারী!

রাখাল। হাঁ, এ নূতন রকমের প্রণয় বটে, তা ভাই, হৃদয়টা খালি রাখা আমার মতে ভাল বোধ হয় নাই। যা'কে হয় ধ'রে বেঁধে তোমার হৃদয়রাজ্যের অধিশ্বরী করিয়া ফেল। তার পর আমরা আছি, তখন প্রাণপণে উঠি-পড়ি করে লাগা যাবে।

তখন অকস্মাৎ অন্ধকার গৃহমধ্যে হঠাৎ আলো জ্বালিলে যেরূপ হয়, প্রেমদাসের হৃদয়ের মধ্যে বন্ধুর এই কথা কয়েকটিও সেইরূপ কার্য্য করিল। কাহাকে কোন কথা না বলিয়া প্রেমদাস তৎক্ষণাৎ হৃদয়রাজ্যের অধিশ্বরীর অন্বেষণে গৃহে হইতে বাহির হইলেন!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রেমদাস গৃহ হইতে বাহির হইয়া পদব্রজেই চলিল। বীর-বেশে, অশ্বারোহণে কিম্বা রাজপরিচ্ছদে যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখন তাহার প্রেমিকহৃদয়ে বড়ই একটা প্রেমের তুফান উঠিয়াছিল, সুতরাং প্রেমদাস আর সে বিলম্ব সহ্য করিতে পারিল না। তার পর অকস্মাৎ হবু-হৃদয়েশ্বরীর বিরহে প্রেমদাস ব্যতিব্যস্ত হইয়া বৎসহীন গাভীর ন্যায় দ্রুতপদেই চলিল। প্রেমদাস চলিল—আর মনে মনে ভাবিল—"পিতৃগৃহ ছাড়ি যবে বাহির হয় প্রেমিক, প্রণয়োদ্দেশে—কে রোধে তাহার গতি?" ঠিক্ এই সময় রাস্তার একদিকে খোঁটায় আবদ্ধ এবং অন্যদিকে একটা ছাগ-গ্রীবায় সংলগ্ন রজ্জু তাহার গতিরোধ করিল, কিন্তু তাহাতে প্রেমদাসের প্রেমিকহৃদয় ভীত বা সঙ্কুচিত হইল না, প্রেমদাস এক লম্ফে সে বাধা অতিক্রম করিল। মহৎ কার্য্য সাধনে বাধা বিস্তর,—একটা প্রচণ্ড বাতাস অসংখ্য ধূলা এবং শুষ্কপত্র প্রভৃতি সৈন্যসামন্ত সঙ্গে লইয়া প্রচণ্ডবেগে প্রেমদাসের সম্মুখে আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল, প্রেমদাস বীরের ন্যায় বক্ষ পাতিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরেই চক্ষুর বেদনায় অস্থির হইল বটে, কিন্তু ইহাতেও তাহার শরীর অক্ষত রহিল। এইরূপ নানা বাধা, নানা বিঘ্ন, অতিক্রম করিয়া আমাদের নায়ক দ্রুতপদে চলিল। এখন প্রেমদাসের অন্যান্য শত্রু পরাজিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বর্ত্তমান প্রধান শত্রু বিরহানলকে প্রেমদাস এখনও পরাজিত করিতে পারিল না। প্রেমদাস দেখিল—তাহার এই প্রধান শত্রু অজেয় এবং অমর

কস্মাৎ প্রেমদাসের মনে পড়িল where it is hard to ambat, learn to fly!" তখন এই নীতির অনুকরণ করিয়া প্রেমদাস উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। এইরূপে অনেকক্ষণ দৌড়িয়া প্রেমদাস বুঝিতে পারিল—এই প্রবল শত্রুকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাওয়া তাহার ক্ষমতাধীন নহে।

এই সময় প্রেমদাসের আর এক শত্রু ধীরে ধীরে রণভূমিতে অবতীর্ণ হইল। সে শত্রু অন্য কেহ নহে, ইহা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ মহাপরাক্রমশালী সেই জঠরানল। তখন প্রথমেই এই জঠরানলে আর বিরহানলে তুমুল একটা যুদ্ধ বাধিয়া গেল। জঠরানল বলিল—'আমি বড়।' বিরহানল বলিল—'আমি বড়।' উভয়েই প্রেমদাসকে মধ্যস্থ মানিল। প্রেমদাস অকস্মাৎ বাধ্য হইয়া জঠরানলকেই উচ্চাসন দিল। প্রেমদাস তখন ক্ষুধায় অস্থির হইয়াছিল। এখন এই অনল নির্ব্বাণ করিবার উপায় কি? ইহা ভাবিয়া প্রেমদাস বড়ই অস্থির হইল। তাহার নিকটে তখন এক কপর্দ্দকও ছিল না, কারণ প্রণয়োন্মত্ত নায়ক কখনও যে রাহাখরচ লইয়া বাহির হইয়াছে, এ কথা প্রেমদাস কোন উপন্যাসে এ পর্য্যন্ত পাঠ করে নাই। প্রেমদাস জানিত—প্রেমিকের ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না, কিন্তু তাহার অদৃষ্টে কেন তাহার বিপরীত ঘটিল, প্রেমদাস তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না!

ভাবিতে ভাবিতে প্রেমদাস এক মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ প্রেমদাসের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন নহে, তাহা না হইলে প্রেমিকের উপভোগযোগ্য সুন্দর অট্টালিকা, দুগ্ধফেননিভ শয্যা-যুক্ত সুখস্পর্শ পালঙ্ক, অথবা অন্ততঃপক্ষে একটা মনোরম পুষ্পো-দ্যান, কি একটা প্রস্ফুটিত কমলিনী সুশোভিত সরোবর কিম্বা

নিদেনপক্ষে একটা বকুলতলাও জুটিল না কেন? কি সর্ব্বনাশ! প্রেমদাস যে দিকে চায়, সেই দিকেই মাঠ ধূ ধূ করিতেছে! প্রেমদাস তখন অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া মনে মনে স্থির করিল, ইহা কখনই মাঠ নহে, নিশ্চয়ই কোন প্রকাণ্ড প্রান্তর হইবে। এই প্রান্তর অতিক্রম করিতে পারিলেই, হয়ত কোন নগর অথবা অন্ততঃপক্ষে একটা শিবের মন্দিরও নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। হয়ত সেই নগরের রাজকন্যা কিম্বা মন্দিরের আশ্রয়প্রাপ্তা কোন অপ্সরা বা সৌন্দর্য্যসম্পন্না রমণী তাহার রূপে মুগ্ধা হইয়া তাহাকে মনে মনে নিশ্চয়ই পতিত্বে বরণ করিবে। এই সময় প্রেমদাস একবার আকাশের দিকে চাহিল, কিন্তু আকাশ মেঘশূন্য দেখিয়া মনে মনে কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। পুনরায় প্রেমদাসের হৃদয়ে একটা চিন্তাস্রোত প্রবলবেগে বহিতে আরম্ভ করিল। প্রেমদাস ভাবিল —যদি এত সাধের প্রান্তর ইমিলিল, তবে 'আকাশে মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রধাবিত' দেখিতেছি না কেন? এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়িতেছে না কেন? মেঘ গর্জ্জন ও বজ্রনাদে তাহার কর্ণকুহর পরিতৃপ্তই বা না হইবে কেন? আর অন্ধকারের মধ্যে 'বিদ্যুদ্দীপ্ত-প্রদর্শিত পথে অশ্বচালনাই' বা তাহার অদৃষ্টে না ঘটিবে কেন?

সে সকল না ঘটিলেও এ সময় প্রেমদাস এক কাঁকুড় ক্ষেত্র দেখিতে পাইল। তাহা দেখিয়া অন্য চিন্তা আর তাহার হৃদয়মধ্যে স্থান পাইল না। তখন সর্ব্বপ্রথমে জঠরানল নিবারণ করাই তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল। প্রেমদাস তাড়াতাড়ি কাঁকুড় তুলিয়া ভক্ষণ আরম্ভ করিল। এমন সময় ঐ ক্ষেত্রের অধিকারী কৃষক এক সুদীর্ঘ যষ্টিহস্তে ক্ষেত্র-ফল-লুণ্ঠনকারীর প্রতি

ধাবিত হইল। তখন প্রেমদাসের চৈতন্ত হইল, কিন্তু প্রেমিক হইলেই বীর হওয়া চাই—এ ধারণা তাহার মনে বদ্ধমূল ছিল। সেই কারণ এবার উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলায়নে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। আর বিশেষতঃ এখনও তাহার সে জঠরানল নির্ব্বাপিত হয় নাই। প্রেমদাসের ধীরহৃদয়ে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। হৃদয় অতুল সাহসে পরিপূর্ণ, মুখগহ্বর চর্ব্বিত কাঁকুড়ে বোঝাই, আর হস্তে তখনও ভীমের গদার ন্যায় একটা প্রকাণ্ড কাঁকুড় শোভা পাইতেছিল। প্রেমদাস তখন বীরবেশে কাঁকুড় হস্তে আক্রমণকারী শত্রুর সম্মুখীন হইল। কৃষক এই কাঁকুড় অপহরণকারীকে পলায়নবিমুখ দেখিয়া কিছু থতমত খাইল। তাহা দেখিয়া অধিকতর সাহসে বজ্রগম্ভীরস্বরে প্রেমদাস বলিল—"জান তুমি কে আমি ?"

কৃষক আরো ভয় পাইল, মনে মনে ভাবিল—"হয়ত এনা এই স্থাশের জমীদার কি পুলিসের দারগা—এ রকম একটা কিছু হবে, তা না হ'লে এত সাহস কার ?"

কৃষক এইবার ধীরে ধীরে বলিল—"আপনি কেটা ?"

প্রেমদাস পূর্ব্বের ন্যায় গম্ভীরস্বরে বলিল—"আমি প্রে—ম—দা—স।"

কৃষক এই জমকাল নামটি শুনিয়া বিনীতভাবে বলিল—"এজ্ঞে, আপনার কোথায় গমন হ'চ্ছে ?"

প্রেমদাস সদম্ভে উত্তর করিল—"হৃদয়রাজ্যের অধিশ্বরীর অন্বেষণে !"

কৃষক বলিল, "এ রাজ্যি যে হুজুররের—তা আমি কেমনে জান্‌বো ? দাসের কসুর মাপ কর্‌বেন।"

প্রেম। রে বিজিতশক্র! তোকে এবার ক্ষমা করিলাম, এখন তুই প্রাণ লইয়া পলায়ন কর্।

কৃষক। এ দাস থাক্‌তে হুজুর হনুমানের মতন ক্ষেতে পড়ে কাঁকুড় খাবেন কেন? আমার সাথে বাকুলকে আসুন, ভাল ক'রে ছেড়িয়ে হুজুরকে খাওয়াব।

বিজিতশক্রর নিকট প্রাপ্য কর আদায়, আশা মনে করিয়া প্রেমদাস ইহাতে আর কোন আপত্তি করিল না, কৃষকের সঙ্গেই চলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বেলা ছয়টা বাজিয়াছে—সূর্য্যদেব সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর ধীরে ধীরে অবসর লইবার উপক্রম দেখিতেছেন। কিন্তু হায়! এ হেন সময় আমরা চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও একটি কমলিনী কিম্বা কুমুদিনীর সাক্ষাৎ পাইলাম না, সুতরাং দিনমণির জন্য কমলিনীর বিরহযন্ত্রণা কিম্বা নিশামণির জন্য কুমুদিনীর প্রণয়োচ্ছ্বাস বর্ণনা করিয়া পাঠকপাঠিকাগণকে পরদুঃখে কাতর বা পরসুখে উল্লাসিত করিতে পারিলাম না। পাঠক পাঠিকাগণ! ক্ষমা করিবেন; আমাদের মনের দুঃখ মনেই রহিল। তাহা না হইলে কোথায় আকাশের চন্দ্রসূর্য্য, আর কোথায় এঁদো পুকুরের কমলিনী আর কুমুদিনী—সুতরাং এরূপ নিকটসম্পর্কীয় প্রণয়ীযুগলকে আমরা অল্পে ছাড়িতাম না। আর সন্ধ্যা হইবার এখনও অর্দ্ধ ঘণ্টা বিলম্ব সুতরাং এখন

চন্দ্রের জ্যোৎস্নার অপূর্ব্ব শোভাও কাহাকে দেখাইতে পারিলাম না।

এই সময় আমাদের প্রেমদাস আর কৃষক গ্রামের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং এখন এই সন্ধ্যাকালে গ্রামের সেই হৃদয়স্তম্ভনকরী শোভা বর্ণনা করিয়াই আমরা মনের সকল ক্ষোভ মিটাইব। সে শোভা এইরূপঃ—

গাভীগণ উর্দ্ধপুচ্ছে হাম্বারবে মাঠ হইতে গৃহাভিমুখে দৌড়িয়াছে, আর বৃষগণ উর্দ্ধমুখে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতেছে। কোন মতেই তাহাদের সঙ্গত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহে। পাঠশালার বালকগণ ছুটি পাইয়া ছুটিতে ছুটিতে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে, আর তাহাদের গুরুমহাশয় সুদীর্ঘ বেত্রহস্তে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতেছে না। একটী স্ত্রীলোক গ্রামান্তর হইতে হাট করিয়া মোট মাথায় গৃহে আসিতেছে, আর একটী দীর্ঘকার কৃষ্ণবর্ণ কুকুর ঘেউ ঘেউ রবে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে। সকলেই যাহা হউক, যোড়ে যোড়ে চলিয়াছিল, কিন্তু এমন সময় চারিগাছা কাঁসার মলের শব্দে দিক্‌দিগন্তর কম্পিত করিয়া—আর তখনও সন্ধ্যা হয় নাই, সুতরাং রূপের জ্যোতিঃতে পশ্চিম গগন আলোকিত করিয়া কলসীকক্ষে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব রমণী প্রেমদাসের নয়ন পথের পথিক হইল। রমণীর সেই অপূর্ব্ব রূপমাধুরী দেখিয়া প্রেমদাসের প্রেমিক হৃদয় মোহিত হইয়া গেল। তখন সেই গোলাকৃতি সুতরাং চন্দ্রাননের চেপ্টা অর্থাৎ খাঁদা নাসিকা দেখিয়া চন্দ্রের কলঙ্কের কথা আর চন্দ্রাননীকে কৃষ্ণবর্ণা দেখিয়া পূর্ণিমার পর আমাবস্তার কথা—প্রেমদাসের মনে পড়িল। সুন্দরীর সকল

অঙ্গে মনোমত অলঙ্কার নাই দেখিয়া নিরাভরণা স্বর্গের অপ্সরা-দিগের কথাও এখন প্রেমদাসের মনে জাগিয়া উঠিল! রমণীর বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর। কিন্তু প্রেমদাস তখন ভাবিল—"এই অপরূপ দেববালা কি উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সহসা মর্ত্তলোকে আবির্ভূতা হইল? এরূপ রূপ ত কখন দেখি নাই। না জানি, কোন্ দেবী আজ স্বর্গসুখে জলাঞ্জলি দিয়া আমায় চরিতার্থ করিবার জন্য আমার সম্মুখীন হইয়াছেন।"

প্রেমদাস এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় তাহার সহচর কৃষক দৌড়িয়া গিয়া রমণীর কানে কানে কি কথা বলিল। রমণী একটু মুচকিয়া হাসিল। কিন্তু এই বালিকা বা রমণীর সেই বৈদ্যুতিক হাসি, প্রেমদাসের প্রেমিক হৃদয়ে যেন কড় মড় শব্দে এক ভীষণ বজ্রাঘাত করিল। প্রেমদাস তখন হৃদয়ের ব্যথায় অস্থির হইল। রমণীর (আমরা বালিকা বলিব—না রমণী বলিব?) আর জল আনা হইল না; শূন্য কলসী কক্ষে করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রে অগ্রে চলিল। রমণী অন্য কেহ নহে, আমা-দের এই কৃষকেরই পত্নী।

রমণী ধীরে ধীরে যায়, আর কৃষকের প্রতি ফিরিয়া ফিরিয়া চায়, আবার মধ্যে মধ্যে ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসে। এইবার সেই মধুর হাসিতে প্রেমদাসের হৃদয় স্নিগ্ধ হইল! প্রেমদাস তখন সেই সরলা, অবলা, স্বর্গীয় বালাকে বিশেষ প্রেমিকা ও রসিকা দেখিয়া, তাহার অনুগমনে অপার আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল; কিন্তু হঠাৎ এই সময় প্রেমদাসের সুখসাগরে দুঃখের তরঙ্গ উঠিল। প্রেমদাস বিজিত শত্রু কৃষককে আপনার প্রণয়সুখের মূর্ত্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখিল। তখন ঈর্ষানল,

কামানল, দাবানল, বাড়বানল, জঠরানল প্রভৃতি সকল অনল একত্রে ভীষণবেগে তাহার প্রাণের মধ্যে দাউ দাউ করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। প্রেমদাস আর স্থির থাকিতে পারিল না, হঠাৎ ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে আরম্ভ করিল। তৎক্ষণাৎ পথের পার্শ্ব হইতে একটী খোঁটা তুলিয়া লইয়া প্রেমদাস জলদ-গম্ভীরস্বরে কৃষককে সম্বোধন করিয়া বলিল—"আমি তোমাকে প্রণয় প্রতিযোগীতা যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি—তুমিও সশস্ত্র আছ. আজ এই সুন্দরীর সম্মুখে যুদ্ধ করিয়া 'হয় আমাকে বধ করিয়া আপনার পথ মুক্ত কর, নচেৎ আমার হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া পথ ছাড়িয়া দাও।"

কৃষক স্তম্ভিত হইল—বিস্মিতনেত্রে অনেকক্ষণ সেই যুবকের প্রতি চাহিয়া রহিল। কৃষক পত্নীও অবাক্! কাহারও মুখে আর কথা নাই, কেহই প্রেমদাসের এরূপ প্রেমরহস্য-ব্যাপারের অর্থ বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরে প্রেমদাসের হস্তে সেই উর্দ্ধোত্থিত খোঁটার প্রতি কৃষকের দৃষ্টি পড়িল—তখন তাহার কথার অর্থটা কতক কতক হৃদয়ঙ্গম হইল। কৃষক বলিল—"কেন আমার কসুর কি হুজুর ?"

প্রেমদাস। আমরা প্রেমিক—অন্তঃকরণ প্রজ্জ্বলিত হইলে উচিতানুচিত বিবেচনা করি না; পৃথিবী মধ্যে এই সুন্দরীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দুই ব্যক্তির স্থল হইবে না; একজন এইখানে প্রাণত্যাগ করিবে।

এই বলিয়া প্রেমদাস কৃষকের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া খোঁটা হস্তে তাহাকে আক্রমণ করিল। প্রেমদাস কৃষকের পত্নীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে সুন্দরী ইত্যাদি কি গালি দিয়া-

ছিল; সুতরাং কৃষকেরও মনে বড়ই রাগ হইল—তখন সে জমীদার অথবা জমীদারের রাজ্যে বাস করার কথা ভুলিয়া গেল—সুতরাং প্রেমদাসের আর কোন খাতির রাখিল না। হস্তে যষ্টি ছিল—আপনার ক্রোধের পরিশোধ হইল। প্রেমদাস প্রহার খাইয়া খোঁটা ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দৌড়—দৌড়—দৌড়। প্রেমদাস ঊর্দ্ধাশ্বাসে দৌড়িতেছে। প্রেমদাসের পৃষ্ঠে কৃষকের যষ্টি-পতনে যে কি এক আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া হইয়া গেল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু সে ক্রিয়ার ফল হইল—দৌড়—দৌড়—দৌড়। প্রেমদাসকে দেখিলে বোধ হয়, যেন এক অমানুষিক ক্ষমতাবলে প্রেমদাস দৌড়িতেছে। মানুষকে সেরূপ দ্রুতবেগে দৌড়িয়া যাইতে কেহ কখন চক্ষে দেখে নাই। সৌভাগ্যক্রমে প্রেমদাস মাঠের দিকে আসিয়া পড়িয়াছিল, নচেৎ গ্রামের মধ্যে সেইরূপ দৌড়িয়া যাইলে নিশ্চয়ই নানারূপ বাধা পড়িত। প্রেমদাস সেই বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে দৌড়িতেছে—কোন বাধা নাই, বিঘ্ন নাই, কাহার আপত্তি নাই, প্রেমদাস প্রাণ ভরিয়া—মন ভরিয়া—হৃদয় ভরিয়া—দৌড়িতেছে। কেবল দৌড়—দৌড়—দৌড়। এমন সময় প্রেমদাসের—মনে হইল—কে যেন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার সহিত দৌড়িতেছে! এইবার প্রেমদাস আপনার পদশব্দে আপনি ভীত হইল। তখন সময় সন্ধ্যাকাল, স্থান জনশূন্য

বিস্তীর্ণ প্রান্তর, আর পথিক আমাদের নায়ককুলতিলক বীর-শ্রেষ্ঠ প্রেমদাস স্বয়ং। সুতরাং ত্রয়স্পর্শ হইয়া গেল—প্রেমদাস মনে করিল যে নিশ্চয় কোন বিকটাকার একটা ভূত অথবা অন্তঃতপক্ষে একটা দস্যু তাহার সঙ্গ লইয়াছে—পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিবার সাহসও তাহার হইল না, অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া —প্রেমদাসের একমাত্র অবলম্বন হইল—দৌড়—দৌড়—দৌড়।

কিন্তু এবার প্রাণপণে দৌড়িয়াও—প্রেমদাসের নিস্তার নাই। প্রেমদাস যতই দৌড়ায়, পশ্চাতে কাহার পদধ্বনি যেন ততই স্পষ্ট শুনিতে পায়, তখন পুনরায় 'দৌড়—দৌড়—দৌড়। সে সময় প্রেমদাসের দৌড়িলেও প্রাণ যায়, আবার এদিকে না দৌড়িলেও প্রাণ যায়। প্রাণ এবার নিশ্চয়ই যাইবে, তবে ভূতের বা দস্যুর হস্ত অপেক্ষা দৌড়িতে দৌড়িতে প্রাণটা যাওয়াই প্রেমদাস শ্রেয়স্কর মনে করিল। সেই কারণ, তাহার দৌড় আর থামিল না; সৌভাগ্যক্রমে প্রেমদাস এই সময় এক গ্রামের সন্নিকটে আসিয়া পৌছিল। গ্রামের প্রান্তভাগে একটা প্রকাণ্ড বকুলতলায় বসিয়া সেই গ্রামের কয়েকজন কৃষক গ্রীষ্মাতিশয্য প্রযুক্ত সান্ধ্যসমীরণ সেবন করিতেছিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার গল্প করিতেছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া প্রেমদাসের মৃতশরীরে জীবন সঞ্চার হইল। প্রেমদাস তখন আর দৌড়িতে পারে না—অতি কষ্টে দৌড়িয়া আসিয়া তাহাদের সম্মুখে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। কৃষকেরা আশ্চর্য্য হইল, তাহাদের মধ্যে একজন "ভূত, ভূত" করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। অর্দ্ধমূর্চ্ছিতাবস্থায় সে কথা প্রেমদাসের কানে গিয়া পৌছিল।

অনেক কষ্টে কৃষকেরা সকলে মিলিয়া প্রেমদাসের চৈতন্য সম্পাদন করিল। এই চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চৈতন্য প্রেমদাসের মনের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রেমদাসের তখন মনে পড়িল যে, তিনি একজন বীর পুরুষ, সুতরাং এই দৌড়ান কার্য্যটা তাঁহার বীরপুরুষোচিত কার্য্য হয় নাই। তখন কি ভাবিয়া শয়নাবস্থাতেই দুই হস্ত তুলিয়া প্রেমদাস উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—"ভূত, প্রেত, রক্ষ, যক্ষ, কিন্নর যিনি হও—আইস, আমি আজ সম্মুখযুদ্ধে সকলকেই আহ্বান করিতেছি।"

প্রেমদাসের শ্রীমুখ হইতে এই প্রথম বাক্য নিঃসরণ হইল! সে কথা শুনিয়া সকলেই অধিকতর আশ্চর্য্য হইল। একজন কৃষক বলিল—"এ পাগল নাকি?"

দ্বিতীয় কৃষক বলিল—"না হে—নিশ্চয় একে ভূতে পেয়েছে।"

তখন ভূতের নাম শুনিয়া প্রেমদাস উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল—"ভূত! ভূত! কোথায় ভূত? প্রতিহিংসানল আমার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে, তাহার হৃদয়ের রক্ত পান করিয়া আমার এ অনল নির্ব্বাণ করিব।"

যষ্টির আঘাতের প্রতিশোধটা প্রেমদাস এখন অগত্যা ভূতের উপরই লইতে বড়ই ইচ্ছুক; কারণ এত লোকের সম্মুখে ভূত আসিবার সম্ভাবনা ছিল না। প্রেমদাসের ঈদৃশ অবস্থা এবং তাহার মুখে এরূপ প্রলাপ বাক্য শুনিয়া কৃষকেরা সকলেই তাহাকে পাগল অথবা ভূতযোনীগ্রস্ত মনে করিল! এই সময় আর একজন কৃষক তথায় উপস্থিত হইল। সে ব্যক্তি আসিয়াই জ্যোৎস্নালোকে প্রেমদাসকে চিনিতে পারিল; পূর্ব্বে

প্রেমদাসের গৃহে এ ব্যক্তি চাকর ছিল। ইহার নাম ভূতনাথ। ভূতনাথ আসিয়াই আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"বড় বাবু যে!"

প্রেমদাস গম্ভীর স্বরে বলিল—"কে তুমি?"

ভূতনাথ উত্তর করিল—"আমাকে চিন্‌তে পাচ্চেন না—আমি ভূতো।"

প্রেম। কি ভূত! তোমার সাহস দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, এখন আইস যুদ্ধ করি।

ভূত। আপনি এরূপ বল্‌চেন কেন?

প্রেম। নরাধম! কাপুরুষ! এই কি তোর বীরত্ব? বীরকুলগ্লানি! এখনি তোরে ইহার উপযুক্ত শাস্তি দিব।

এই বলিয়া প্রেমদাস ভূতনাথের সুদীর্ঘ চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিল। তখন অন্য তুই তিন জন কৃষক সেই দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টি ছাড়াইয়া দিল। তাহাদের মধ্যে একজন ভূতনাথকে বলিল—"বলি ও ভূতো! দ্যাখিস্ কি? তোর মনিবের ছেলেকে ভূতে ধরেছে।"

ভূত। এখন কি করি বল দেখি ভাই?

সেই ব্যক্তি উত্তর করিল—"শীঘ্‌গীর যা, মহেশ সাকে ডেকে আন, অমন ওঝা গ্রামে থাক্‌তে ভাব্‌না কি?"

অন্য এক ব্যক্তি বলিল—"সেই ভাল, তুই এখোন তোর বাবুকে বাকুলকে নিয়ে যা, আমি মহেশ সাকে ডেকে নিয়ে যাচ্চি।"

তখন প্রেমদাসকে তুই তিন জনে টানাটানি আরম্ভ করিল, প্রেমদাস বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল—"বিনা যুদ্ধে কখন পরাভব স্বীকার করিব না।" কিন্তু তাহার সে

কথা তখন কেহই শুনিল না, সকলে তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া চলিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রেমদাস ভূতনাথের গৃহে অর্গলাবদ্ধ হইয়া রহিল।

এখন প্রেমদাসের মনের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইল। এক নিদারুণ চিন্তা তাহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল,—বিনা যুদ্ধে প্রেমদাস বন্দী হইয়াছে, যখনই তাহার এই কথা মনে উদয় হইতে লাগিল, তখনই ক্রোধে, ক্ষোভে মনোবেদনায় প্রেমদাস অস্থির হইতে লাগিল। এমন কি মাতর্বসুন্ধরাকে দ্বিধা হইতে অনেকবার অনুরোধ পর্য্যন্ত করিয়াছিল, কিন্তু প্রেমদাসের দুর্ভাগ্যক্রমে মাতা বসুন্ধরা সে উপরোধ রক্ষা করেন নাই। তখন প্রেমদাস মনে মনে ভাবিল—"আমি বন্দী! বিনা যুদ্ধে পরাভূত ও বন্দী—শেষে কি না যবনের কারাগৃহে বন্দী! অহো! এ ক্ষোভ রাখিবার স্থান কোথায়? হায়! আমি কারাগারে!"

প্রেমদাস একবার করতলে কপোলবিন্যাস করিয়া স্থির হইয়া বসিল। তখন তাহার ঘন ঘন সুদীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতেছিল, তাহাতে সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার গৃহের মধ্যে যেন একটা শোঁ শোঁ শব্দ হইতে লাগিল। এই সময় দরজা খুলিয়া ধীরে ধীরে কে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। দরজা খোলার শব্দ শুনিয়া এবং অন্ধকারের মধ্যে কাহাকে ধীরে ধীরে আসিতে দেখিয়া প্রেমদাসের চৈতন্য হইল, হঠাৎ কি একটা কথা যেন তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। প্রেমদাস যেন আশ্চর্য্য হইয়া একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস এইবার জোর করিয়া ফেলিয়া বলিল—"কি! বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা!"

আগন্তুক কিছু কর্কশ স্বরে বলিল—"আমি ভূতের ওঝা—আমাকে চিনিতে পার না? আমার নাম মহেশ সা।"

প্রেম। কি ব'ল্লে—তুমি তিমোত্তমা নয়, তুমি আয়েসা। আয়েসা, তুমি এখানে কেন?

মহে। তোমায় ঝাড়িয়া দিতে এসেছি।

প্রেম। আমায় ছাড়াইয়া দিতে আসিয়াছ? তবে কি তুমি আমায় কারামুক্ত করিবে? কিন্তু আয়েসা, আমি মুক্তিলাভ ইচ্ছা করি না।

প্রেমদাসের কথায় ওঝার-পো হতবুদ্ধি হইল। এ কিরূপ ভূত কিছুক্ষণ স্থির হইয়া মনে মনে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। এদিকে প্রেমদাস কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনরায় এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"আয়েসা, তুমি কাঁদিতেছ?"

মহে। তুমি ছাড়িয়া যাবে কি না বল?

প্রেম। না আয়েসা, আমি এ কারা গৃহ ছাড়িব না।

মহে। তবে আমার ক্ষমতা দেখাই?

প্রেম। তোমার ক্ষমতা আমি জানি। তুমি উৎকোচদানে প্রহরীকে বশীভূত করিতে পার, অশ্বশালা হইতে অশ্ব দিতে পার। কিন্তু আমি তাহাতেও সম্মত নই।

এই সময় ভূতনাথ গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল। তখন ভূতনাথের সহিত মহেশ ওঝার গোপনে কি একটা পরামর্শ হইল। মহেশ স্পষ্টই বলিল যে, এ ব্যক্তি নিশ্চয় পাগল হইয়াছে, ভূতে পাইলে এরূপ কথা বলিবে কেন? তখন ভূতনাথ ক্ষুন্ন-মনে কহিল—"তবে এখন কি উচিত?"

এই উচিত কথাটি প্রেমদাসের কর্ণে গিয়া বাজিল। প্রেম-

দাস ক্ষিপ্তের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"উচিত! কি উচিত ওসমান্?"

কথা কয়েকটি বলিয়া পশ্চাতে হটিয়া আসিবার সময় প্রেমদাসের মস্তকে এক গুরুতর আঘাত লাগিল। অন্ধকারে কোথা হইতে এরূপ আঘাত পাইল, কেহ জানিতে পারিল না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রেমদাস মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। তখন দুই জনে তাহার শুশ্রূষা আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরে অল্প জ্ঞানের উদয় হইলে প্রেমদাসের মনে হইল—যেন এক স্বর্গীয় অপ্সরা তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া গর্ব্বিতস্বরে বলিতেছে—"এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর, শুন ওসমান্, আবার বলি—এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি আর অধিক নাই, এখন প্রায় চারিটা বাজিয়াছে। আবার আজ শেষ রাত্রেই জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে, সুতরাং যে টুকু রাত্রি অবশিষ্ট আছে, তাহাকে দিনের সামিল ধরিয়া লওয়া যাইতেও পারে। আকাশ নির্ম্মল, যেন একখানি অনন্তবিস্তৃত শ্বেতবর্ণ চন্দ্রাতপ মাথার উপর ঝুলিতেছে। আমরা অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আজিকার এ আকাশকে আমরা 'সুনীল নভোমণ্ডল' বলিতে পারিলাম না। সেই শ্বেতবর্ণ আকাশে এখন অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিয়া রহিয়াছে, যেন প্রকৃতির একটি প্রধান অঙ্গ আজ বসন্ত রোগাক্রান্ত! চারি দিক্ নিস্তব্ধ। সক-

সেই শয্যায় অথবা সহজ কথায় নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে অচেতন। কেবল এ দৃশ্য অসহ্য বোধ হওয়ায় কয়েকটা ঈর্ষাপরতন্ত্র ও দ্বিজকুলকলঙ্ক পক্ষী তাহাদের সেই সুখ-নিদ্রা ভঙ্গ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল।

এমন সময় আমাদের এই উপন্যাসের নায়ক প্রেমদাস কাহাকে কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে ভূতনাথের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিল। প্রেমদাস এইরূপে গোপনে সে গৃহ পরিত্যাগ না করিলে, ভূতনাথ নিশ্চয়ই প্রেমদাসকে ছাড়িয়া না দিয়া গৃহে রাখিয়া আসিত। প্রেমদাস এখন কারামুক্ত, সুতরাং স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তিতে তাহার হৃদয় উল্লাসিত। প্রেমদাস যখন এইরূপ উল্লাসিতহৃদয়ে দ্রুতবেগে গ্রাম হইতে গ্রামান্তর অতিক্রম করিয়া চলিয়াছিল, তখনও প্রকৃতি নীরব। কিন্তু উষাসতী পূর্ব্বদিক্‌ হইতে উঁকি মারিতে ছিল—যেন যাই যাই করিয়া লজ্জায় আসিতে পারিতেছিল না। এমন সময় সেই নীরব ও নিস্তব্ধ প্রকৃতি কম্পিত করিয়া কোথা হইতে রমণীর 'কোমল কণ্ঠ-বিনিঃসৃত করুণ বিলাপধ্বনি' প্রেমদাসের কর্ণকুহরে বেগে আঘাত করিল। প্রেমদাস স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইল! তাহার সেই উল্লাসিত বীরহৃদয় সেই করুণ-স্বরে ব্যথিত হইয়া গেল; প্রেমদাস মন্ত্রবশীভূত সর্পের ন্যায় কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সে স্বরের কি মোহিনীশক্তি আমরা জানি না, কিন্তু কি জানি কেন, এই সময় প্রেমদাসের বিরহানল পুনরায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন সেই স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণ তাহার গাত্রদাহ উপস্থিত করিল, সেই সুশীতল প্রাতঃসমীরণ যেন তাহার গাত্রে

অগ্নি বৃষ্টি করিতে লাগিল! আর বিশেষতঃ সেই সুদূরাগত বামা-কণ্ঠ-নিঃসৃত সকরুণ আর্ত্তনাদ, তাহার সেই বিরহানল-প্রজ্জ্বলিত বীরহৃদয়কে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। হায়! একজন বীরপুরুষের সম্মুখে রমণীর আর্ত্তনাদ! যে প্রেমদাস রমণীকুলের কাহারও পানের চূণ খসিলে, রাগে, ক্ষোভে, মনোবেদনায় হাসিতে হাসিতে আপনার জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে, আজ কি না সেই প্রেমদাসের সম্মুখেই একজন সরলা, অবলা, কুলবালা, রমণী কোন ষণ্ড, ভণ্ড, পাষণ্ড, নরাধম কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে! প্রেমদাসের আর সহ্য হইল না, কিসের একটা ভীষণ তরঙ্গ হৃদয় মধ্যে উত্থিত হইল! প্রেমদাস সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল।

কিছুদূর গিয়া প্রেমদাস দেখিল, একটা কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ—সুতরাং নিশ্চয় কোন ষণ্ড, ভণ্ড, পাষণ্ড, এক দীনহীনা মলিনবেশা রমণীকে সুতরাং সরলা, অবলা, কুলবালাকে—একবারে লণ্ডভণ্ড করিতেছে। দেখিবামাত্র প্রেমদাসের বিরহানলের সহিত ক্রোধানল ভীষণবেগে যোগদান করিল। প্রেমদাস উভয় বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ—"ভয় নাই—ভয় নাই" রবে দিগদিগন্তর কম্পিত করিতে করিতে সেই বিকটাকার কৃষ্ণবর্ণ পুরুষকে গিয়া আক্রমণ করিল। কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া প্রথমে বিস্মিত হইয়া রহিল! তার পর বলিল—"আপ্‌নি কি করেন মশায়? এ যে আমার ইস্‌তিরী মশায়। আমার সঙ্গে ঝগড়া করে, বাকুল থেকে পালিয়ে বাপের ঘরকে যাচ্ছিল মশায়, আমি এসে এখানে ধরেছি বলে, তাই কাঁদ্‌তে লেগেছে মশায়।"

তাহাকে একটু নরম দেখিয়া তখন প্রেমদাসের হৃদয় বীর

বসে ফুলিয়া উঠিল। প্রেমদাস বজ্রগম্ভীর স্বরে তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল—"নরাধম, তুই জানিস্ না যে, আজ তোর শেষ দিন উপস্থিত! প্রেমদাসের সম্মুখে রমণীর প্রতি অত্যাচার! এখন তার উপযুক্ত প্রতিফল পা।"

এই বলিয়া প্রেমদাস সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষকে সজোরে এক মুষ্টাঘাত করিল, এবং তাহার সুদীর্ঘ কেশ টানিয়া ধরিয়া সেই অত্যাচারিত স্ত্রীলোককে বলিল—"ভদ্রে, তুমি এই সুযোগে শীঘ্র পলায়ন কর, আমি এই নরাধমকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া পরে তোমার পশ্চাতে যাইতেছি।" কিন্তু তাহার কথা শেষ হইতেই না হইতেই, সেই পাষণ্ডকর্ত্তৃকই প্রেমদাসকে ধরাশায়ী হইতে হইল, এবং উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করার পরিবর্ত্তে প্রেমদাস নিজেই উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হইল। প্রেমদাস বিস্মিতনেত্রে আরো দেখিল যে, সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ যত প্রহার করিতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই অবলা সরলা কুলবালা—"পোড়ার মুখো, ড্যাক্‌রা, তোর মুখে নুড়ো জ্বেলে দি, তোর বুকে ভাতের হাঁড়ি বসাই"—প্রভৃতি মধুর সম্ভাষণে প্রেমদাসকে তাহার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছিল। পুরুষের প্রহারের অপেক্ষা এই রমণীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে প্রেমদাস হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু যখন দেখিল যে পুরুষ ও রমণী উভয়ে একত্রে চলিয়া যাইতেছে, তখন আর থাকিতে পারিল না, তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল—"রে বীরকুলগ্লানি! হয় ঐ রমণীরত্নকে আমার দিয়া যা, না হয় প্রচলিত প্রথানুযায়ী লতাপাশে কিম্বা রজ্জু দ্বারা আমার হস্তপদ আবদ্ধ কর্।"

কিন্তু সেই বীরকুলগ্লানি আর ফিরিয়াও চাহিল না। তখন

লতাপাশে কিম্বা রজ্জুদ্বারা অনাবদ্ধ প্রেমদাস ক্রন্দনে ভূতলে পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিল!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রভাত হইয়াছে, এই সময় সরোবরের কুমুদিনী কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল কি না, আমরা জানি না, কিন্তু অনেক গৃহ-কুমুদিনী যে গত রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়াছে, আমরা সে সংবাদ পাইয়াছি। এই সুযোগে প্রভাত সমীরণকে ধীরে ধীরে বহিতে আমরা অনেক অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু আজিকার প্রভাত সমীরণ আমাদের সে উপরোধ রক্ষা করে নাই, সুতরাং সমীরণের একটা শোঁ শোঁ শব্দ তখন চারিদিক কম্পিত করিতেছিল। যদিও ভোরের সময় হইতে আমরা বিশেষ সতর্ক ছিলাম, তত্রাচ ঊষাসতী আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া কোথায় যে পলায়ন করিল, আমরা তাহার কোন অনু-সন্ধানই করিতে পারিলাম না, নচেৎ এই প্রভাত বর্ণনার সময় সেই ঊষাসতীকে লইয়া আমরা অনেক রঙ্গ করিতে পারিতাম, আর তিনি সতী কি অসতী এই সুযোগে তাহারও পরীক্ষা লইতাম। এখন ঊষাসতী পলাইয়াছে বটে, কিন্তু সূর্য্যোদেব নিজে আসিয়া ধরা দিতেছেন, সুতরাং আমরা তাঁহার উপরই গায়ের জ্বালা ও কলমের ঠেলা মিটাইব। সূর্য্যোদেব মান্ধাতার আমল হইতে যেরূপ পূর্ব্বাকাশে উঠিয়া থাকেন, অদ্য তাহার কোন ব্যতিক্রমই হয় নাই। তবে ধীরে ধীরে না উঠিয়া আজ বরং কিছু দ্রুতপদে

দেখা দিতেছেন। আজ আমরা ব্যথিত হৃদয়ে সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে, তাঁহার সেই রক্তিম আভার কোন প্রশংসা আমরা করিতে পারিলাম না, কারণ যাঁহার এত তেজ বা অহঙ্কার, তাঁহার আবার প্রশংসার আছে কি? আর যখন কোন সুন্দরীই সূর্য্য কিরণের পক্ষপাতী নয়, তখন আমরা কিরূপে সেই সূর্য্য কিরণের সহিত সুবর্ণের তুলনা করিব? অতএব আমরা সূর্য্যদেবকে নিতান্ত অপদার্থ ও হেয় দেবতার মধ্যেই গণনা করিলাম, কারণ যখন ঐ আকাশের চন্দ্রদেবই সুন্দরিগণের প্রিয়, তখন কিরূপে আমরা সূর্য্যকে উচ্চাসন দিব? এখন কি বল সুন্দরিগণ? আমাদের এ প্রভাতবর্ণনা আপনাদিগের মনের মতন হইল কি?

এইরূপ প্রভাতে আমাদের নায়ক প্রেমদাস এক জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল। একদিনের মধ্যেই লোকালয়ের উপর আমাদের নায়কের শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়া গিয়াছে, সেই কারণ আজিকার এই প্রভাতে তিনি বনে বনে বেড়াইতেছেন। কিন্তু এ সময় প্রেমদাস এস্থান ভ্রমণের প্রকৃত কারণ মন হইতে দূর করিয়া দিয়া তাহার স্থানে কল্পনাবলে ভাবিতেছিল যেন তিনি আজ সঙ্গিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এই জনশূন্য ভীষণ সমুদ্র উপকূলে আশ্রয় অন্বেষণে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। প্রেমদাস চারিদিক চাহিয়া দেখিল যে, তথায় গ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, লোক নাই, আহার্য্য নাই, পেয় নাই, সুতরাং প্রেমদাসেরও আর আনন্দেরও সীমা নাই!

এখন প্রেমদাস মহাহ্লাদে বালুকাস্তূপের অন্বেষণে ব্যস্ত হইল। কিন্তু কোথায়ও মনোমত বালুকাস্তূপ পাইল

না। তখন প্রেমদাস সেই ফেনিল, নীল অনন্ত সমুদ্রের অনুসন্ধানে সেই সমস্ত বন পদতলে দলিল করিতে লাগিল। অবশেষে যখন সমস্ত জঙ্গল ভ্রমণ করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন তাঁহার আশালতা মুকুলিত হইল। প্রেমদাস সম্মুখে দেখিল এক অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! তাহার কেশভার অবেণীসম্বদ্ধ ও তৈলাভাবে রুক্ষ, সুতরাং মস্তকোপরি রাশীকৃত ও আগুল্‌ফলম্বিত। এ রমণী দেহও একবারে আভরণশূন্য, এ মূর্ত্তিতে মোহিনীশক্তিরও অভাব ছিল না। রমণী প্রেমদাসকে দেখিয়া কাষ্ঠান্বেষণ পরিত্যাগ করিয়া অনিমিক্‌ ও বিস্মিতলোচনে যেরূপ ভাবে তাহার প্রতি চাহিয়াছিল, সে দৃশ্য দেখিলে কে না মোহিত হয়? এখন যখন সমস্তই সঠিক মিলিয়া গিয়াছে, তখন প্রেমদাস কি এই রমণীরত্নকে 'কপালকুণ্ডলা' মনে না করিয়া থাকিতে পারে?

এখন রমণীর মধুর কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য প্রেমদাস অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ তাহাকে এ অবস্থায় থাকিতে হয় নাই, কারণ অল্পক্ষণ পরে রমণী তাহার সেই সুচিক্কণ মিশিরঞ্জিত দন্তপাটি বাহির করিয়া সুধাবর্ষণ করিল—"এ মিন্সে কি পথ ভুলে এখানে এসেছে নাকি?"

এই রমণীকণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমদাসের হৃদয়বীণাও বাজিয়া উঠিল। সে এখন আপনার কল্পনায় তন্ময় হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ স্থিরনেত্রে সেই পিঁচুটিনয়না কাষ্ঠকুড়ানীর প্রতি চাহিয়া রহিল। তখন তাহার মনোমধ্যে আন্দোলিত হইতেছিল—"এ রমণী দেবী—মানবী—না কাপালিকের মায়া মাত্র?"

এই সময় হঠাৎ প্রেমদাসের স্মরণ হইল যে, এই রমণীর সময়োপযোগী কার্য্য হইতেছে—তাহাকে কাপালিকের কুটীরে লইয়া যাওয়া, কিন্তু সে বিষয়ে রমণীকে এখনও অমনোযোগী দেখিয়া প্রেমদাস ক্ষুণ্ণ হইতেছিল, এমন সময় সেই কাষ্ঠ-কুড়ানী প্রেমদাসের রকম সকম দেখিয়া ভীত মনে অন্যদিকে চলিয়া যাইতে লাগিল। প্রেমদাস তখন আহ্বানের অপেক্ষা না করিয়া কাপালিকের কুটীরের আশায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতেই চলিল। মাগী যত দ্রুতপদে যায়, প্রেমদাস ততই তাহার পশ্চাতে দৌড়ায়। এইরূপ কিছুদূর চলিয়াছে, এমন সময় কোথা হইতে এক ব্যক্তি দৌড়িয়া আসিয়া বনমধ্যে লুক্কায়িত চোর মনে করিয়া প্রেমদাসকে দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করিল, এবং টানিতে টানিতে লইয়া চলিল। প্রেমদাসের উচ্চকণ্ঠ তৎক্ষণাৎ দিকদিগন্তর কম্পিত করিতে লাগিল—"কপালকুণ্ডলে! আমায় রক্ষা কর, এই ভীষণ কাপালিকের হস্ত হইতে আমায় রক্ষা কর। আর কিছু না পার, সেই তীক্ষ্ণ খড়্গাখানা লুক্কায়িত কর।"

কিন্তু এ কপালকুণ্ডলা রক্ষা করা দূরে থাকুক, আরো ঊর্দ্ধ-শ্বাসে দৌড়িল। এদিকে তাহার বিপরীত দিকে দৌড়িতে দৌড়িতে প্রেমদাসের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল; কিন্তু প্রেমদাস তাহার জন্য তত দুঃখিত হয় নাই, যত দুঃখিত কপালকুণ্ডলার এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারে হইয়াছিল। ক্রমে সে ব্যক্তি যখন তাহাকে টানিয়া টানিয়া এক গ্রামের মধ্যে আনিয়া ফেলিল, তখন সে দুই চারি কথা প্রশ্ন করিয়াই বুঝিতে পারিল যে, এই ধৃত ব্যক্তি চোর নয়, কিন্তু পাগল। তখন সে বিরক্ত হইয়া প্রেমদাসকে ছাড়িয়া দিল। সে ব্যক্তি যখন চলিয়া যায়, তখন

প্রেমদাস চীৎকার করিয়া উঠিল—"কাপালিক! তুমি যেথা ইচ্ছা তথায় যাও, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে আমার কপালকুণ্ডলাকে দিয়া যাও, নচেৎ আমি নদীর জলে ডুবিয়া মরিব।"

কথা শেষ হইতে না হইতেই প্রেমদাসের হঠাৎ কি মনে পড়িয়া গেল। তথন কি ভাবিয়া "মৃণ্ময়ি!" রবে গগন ফাটাইতে ফাটাইতে প্রেমদাস ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। দৌড়িতে দৌড়িতে প্রেমদাস এক নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই সে চারিদিকে যেন কাহার অন্বেষণ করিতে লাগিল। তখন এক ঘাটে একজন স্ত্রীলোক একগলা জলে দাঁড়াইয়া স্নান করিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া মহাহ্লাদে—"আমার মৃণ্ময়ি—আমার মৃণ্ময়ি" বলিতে বলিতে প্রেমদাস তাহারই ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল। কিন্তু সে একজন নীচবংশীয়া স্ত্রীলোক, সুতরাং সে প্রেমদাসকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া অতি সুশ্রাব্য ও সুসভ্য ভাষায় গালি দিতে দিতে গৃহে চলিয়া গেল। প্রেমদাস কিন্তু কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। কারণ এই সময় কি জানি কেন তাহার হৃদয়ের মধ্যে অনেক তরঙ্গ উঠিতে ছিল।

এখন প্রেমদাস বিষম গোলে পড়িল। তাহার সে প্রেমিক জীবন কি প্রেমের আস্বাদন পাইবে না? এত চেষ্টাতেও সে এত অকৃতকার্য্য হয় কেন? তবে বিধাতা কি তাহার অদৃষ্টে প্রেম লেখেন নাই? প্রেমদাস একবার মাত্র সেই পবিত্র প্রেমের আস্বাদপ্রার্থী,—ইহাও কি তাহার অদৃষ্টে ঘটিবে না? একবার মাত্র সে আস্বাদনে জীবনকে কৃতার্থ করিয়া তার পর প্রেমদাস অনায়াসে সেই ক্ষণিকপ্রেমলাভের জন্য অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহিত করিতে পারে। তাহার অদৃষ্টে কি এ সুখ

ঘটিবে না? সে হৃদয়ে তখন এই সকল নানা চিন্তার তরঙ্গ উঠিতেছিল।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর প্রেমদাস শেষে স্থির করিল—যদি বিধাতা তাহার অদৃষ্টে নবকুমারের সুখ লিখিতে ভুলিয়া গিয়াই থাকেন, তবে এক মুহূর্ত্তেরও জন্য না হয় শৈবলিনীকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিন, প্রেমদাস প্রতাপের ন্যায় তাহার সহিত গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ করিতে করিতে আত্মবিসর্জ্জনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত একবার জগৎকে দেখাইয়া লয়। প্রেমদাসের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাহার পক্ষে বিধাতার কাছে ইহা কিছু অন্যায় আবদার নহে। আর যখন স্বয়ং প্রেমদাস এখন নদীবক্ষে একগলা জলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তখন ইহা অপেক্ষা উত্তম সুযোগ বিধাতাই বা আর কখন পাইবেন? তত্রাচ প্রেমদাস বিধাতার প্রতি সদয় হইয়া এক ঘণ্টা সময় দিল এবং সেই এক ঘণ্টা অতি কষ্টে সেই নদীবক্ষে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু কি জানি কেন—এত সুবিধা সত্ত্বেও বিধাতা প্রেমদাসের আশা পূর্ণ করিলেন না, একঘণ্টার মধ্যে শৈবলিনী সে ঘাটে আসিল না। তখন বিধাতার উপর প্রেমদাসের বড়ই রাগ জন্মিল। ক্রোধে অন্ধ হইয়া প্রেমদাস বলিল—"আমি বিনা শৈবলিনীতেই প্রতাপের কার্য্য করিব। দেখি বিধাতা আমায় কিরূপে রক্ষা করেন!"

এই বলিয়া প্রেমদাস নদীরস্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া অনেক দূর চলিয়া গেল, তার পর একবার চারিদিক চাহিয়া বলিল—"শৈবলিনি! যদি রাগ করিয়া কোথাও লুক্কায়িত থাক, আমি ক্ষমা চাহিতেছি, এখনও আইস।"

কিন্তু সে কথাতেও তাহার শৈবলিনী আসিল না। তখন ধর্ম্মকে সাক্ষ্য রাখিয়া প্রেমদাস বলিল—"তবে আমার আর কোন দোষ নাই, তুমি যখন এখনও আসিলে না, তবে আমি ডুবিলাম।" এই বলিয়া প্রেমদাস বাস্তবিক সেই নদীর জলে ডুবিয়া গেল।

নদীর অপর পারে কিছু দূরে একজন ধীবর মৎস্য ধরিতেছিল, সে এক ব্যক্তিকে সন্তরণ দিতে দিতে হঠাৎ ডুবিতে দেখিল এবং তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া আসিয়া চুলের ঝুঁটি ধরিয়া তাহাকে তীরে তুলিল। প্রেমদাস ইহারই মধ্যে অনেক জল খাইয়া ফেলিয়াছিল, সুতরাং প্রথমে চৈতন্য ছিল না, পরে যখন ধীবরের যত্নে চৈতন্য হইল, তখন ধীবরকে দেখিয়া সভয়ে বলিয়া উঠিল—"কে তুমি ?"

ধীবর। আমার নাম চন্দর।

প্রেম। তুমি কি তবে চন্দ্রশেখর? ভাই চন্দ্রশেখর, তোমার পায়ে ধরি—মিনতি করি, তুমি আমার শৈবলিনীকে বিবাহ করিও না। একটি বর্দ্ধিত লতাকে আজন্মসংলগ্নসহকারতরু হইতে সজোরে বিচ্ছিন্ন করিও না। প্রতাপ তোমাকে সময়ে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে নাই বলিয়া এত বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। কিন্তু আমি যখন মনের কথা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়া বলিলাম, তখন আর আমায় সে কষ্ট দিও না।

ধীবরের মুখে আর কোন কথাই নাই! সে প্রেমদাসের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছে। এই সময় ধীবরপত্নী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন ধীবর তাহাকে চুপিচুপি সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিল। তাহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে,

এমন সময় সেই শুভ্রবস্ত্রপরিধানা রমণীকে দেখিয়া প্রেমদাস সবিস্ময়ে বলিল—"একি! এই নবদূর্ব্বাদলশোভিত সবুজ শয্যায় উপর হঠাৎ কে নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি স্তূপাকার করিয়া দিল? নিলাম্বুসাগরের অগাধ জলরাশির উপর কে যেন কোথা হইতে এক শ্বেত পদ্মের পাঁজা ভাসাইয়া দিয়াছে!"

এখনও প্রেমদাসের উঠিবার ক্ষমতা হয় নাই, সে এখনও ভূমিশয্যায় শায়িত। তাহার এইরূপ কথা শুনিয়া ধীবরপত্নীর মনে ভয়ের উদয় হইল, সে তৎক্ষণাৎ তাহার স্বামীকে ভৎ‍র্সনা করিয়া বলিল—"ঐ শুন্‌ছো, কি বলতে লেগেছে। এ মিন্সেকে জলথেকে কেন এখানে আন্‌লে?"

প্রেমদাস এইবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"কেন জেল থেকে এখানে আনিলে! তবে তুমি নিশ্চয়ই শৈবলিনী! শৈবলিনী, তোমার মত পাপিনীর মুখদর্শন করিতে নাই। তোমাকে ম্লেচ্ছের হাত হইতে উদ্ধার করিলাম—আবার তুমি জিজ্ঞাসা কর—কেন জেলথেকে এখানে আনিলে?"

পত্নীর নিকট ভৎ‍র্সিত হইয়াও ধীবর এই সময় আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—"এ যেন ভদ্দরঘরের ছাওয়াল বলে বোধ হচ্ছে, হয় পাগল—না হয় মরে দানো পেয়েছে।"

ধীবরপত্নী স্বামীর কথা শুনিয়া ভয়ে বলিয়া উঠিল—"ওমা! তবে আমাদের মেরে ফেল্‌বে না তো!"

প্রেমদাস এইবার উত্তেজিত হইয়া বলিল—"মারিয়া ফেলিতাম। কেবল স্ত্রীহত্যার ভয়ে করি নাই। কিন্তু শৈবলিনী, তোমার মরণই ভাল।"

এই কথা শুনিবামাত্র ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ধীবরপত্নী

বলিল—"ওগো, এ সত্যি দানো যে! তুমি কি কর্‌লে, এ তোমারই সব দোষ।"

প্রেমদাস তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া বলিল—"কি আমার দোষ? ঈশ্বর জানেন, আমি কোন দোষে দোষী নহি। ইদানীং আমি তোমাকে সর্পিণী মনে করিয়া ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম। তোমার নিজের হৃদয়ের দোষ—তোমার প্রবৃত্তির দোষ। তুমি পাপিষ্ঠা, তাই আমায় দোষ দাও। আমি তোমার কি করিয়াছি?"

ধীবর ও ধীবর পত্নীর এইবার একটু সাহস হইল। তখন সে অবস্থায় সেই সাহসের কার্য্য হইল—প্রাণ লইয়া দৌড়, তাহারা স্ত্রীপুরুষে তখন উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। আর পশ্চাতে দৌড়িতে দৌড়িতে আমাদের প্রেমদাস বলিতে লাগিল—"শৈবলিনি, পালাইও না। এখনও আমার 'সেই অনন্তদেশব্যাপিনী, বিশালহৃদয়া, ক্ষুদ্রবীচিমালিনী, নীলিমাময়ী তটিনীবক্ষে চন্দ্রকর-সাগরমধ্যে ভাসিতে ভাসিতে সুখের সন্তরণ হয় নাই।' আমি কেবল সেই চন্দ্রকরের অপেক্ষা করিতেছি। তুমিও একটু অপেক্ষা কর।"

কিন্তু প্রেমদাসের আহারের চেষ্টায় দৌড়ানার চোট অপেক্ষা ধীবর দম্পতিযুগলের প্রাণ ভয়ে দৌড়ানর চোট অনেকগুণে বেশী, সুতরাং দেখিতে দেখিতে তাহারা প্রেমদাসের চক্ষুর অদর্শন হইয়া গেল। প্রেমদাস ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া রহিল!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গত কল্যের সেই কাঁকুড় জলযোগ ভিন্ন প্রেমদাসের এ পর্য্যন্ত অন্য আহার আর কিছুই হয় নাই। এখন বেলা প্রায় দশটা বাজিয়া গিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত স্নানাহারাদির কথা প্রেমদাসের মনে উদয়ও হয় নাই। প্রেমদাস স্নানাহারের উপর বড়ই বিরক্ত ছিল, কারণ তাঁহার ন্যায় ঔপন্যাসিক নায়ক যে কখন স্নানাহারের বাধ্য, তাহা এখন প্রেমদাস বিনানজীরে স্বীকারে সম্মত নহে। অদ্য প্রাতঃকালেই দৈবঘটনায় প্রেমদাসের স্নান রীতিমত হইয়া গিয়াছে, এবং অন্য আহারাদি হউক বা না হউক, ঐ স্নানের সঙ্গে সঙ্গেই উদরের ভিতর বিলক্ষণ জলযোগও হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে জলও এখন আর উদরের মধ্যে নাই, তাহা স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক নিয়মে বাহির হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন প্রেমদাস পুনরায় ক্ষুধায় অস্থির।

সঙ্গে এক কপর্দ্দকও নাই, সম্মুখের মাঠেও কিছু নাই, সুতরাং প্রেমদাস গ্রামান্বেষণে চলিল। গ্রাম সেখান হইতে অধিক দূর নহে, কিছুদূর গিয়া কোন গ্রামের প্রান্তভাগে প্রেমদাস একটি উদ্যান দেখিতে পাইল। প্রেমদাস রাস্তা হইতেই দেখিল যে সেই উদ্যানে নিচু, গোলাপ-জাম প্রভৃতি এ সময়োপযোগী নানা ফল সকল যেন উদ্যান আলো করিয়া রহিয়াছে। প্রেমদাস তখন আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া সেই ফল ভক্ষণে নিযুক্ত হইল। ঘটনাক্রমে উদ্যানরক্ষক তখন সেখানে ছিল না। প্রেমদাসের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইলে প্রেমদাস ঐ উদ্যানের পুষ্করিণীতে জলপান করিয়া পথের সন্নিকট এক বৃক্ষের ছায়ায় শয়ন

করিল, কারণ গতকল্যের পরিশ্রমে ও অনিদ্রায় প্রেমদাস এখন বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শয়ন করিয়াই প্রেমদাস গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল।

প্রেমদাস অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে, কিন্তু এখন ছায়ার পরিবর্ত্তে সেই চৈত্র মাসের দুই প্রহরের রৌদ্র ঘুরিয়া আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল। একজন বৃদ্ধা ভিখারিণী রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, প্রেমদাসকে এ রকম অবস্থায় নিদ্রা যাইতে দেখিয়া বৃদ্ধার মনে বড়ই কষ্ট হইল। বৃদ্ধা কি করিবে—প্রথমে কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। পরে সম্মুখে একটা তালপাতা পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া, অনেক চেষ্টার পর, সেই তালপাতা প্রেমদাসের মাথার নিকট মাটিতে পুতিয়া দিল, এবং তাহাতে প্রেমদাসের মুখের উপর সেই তালপাতার ছায়া পড়িল। বৃদ্ধা দেখিল—যুবার সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া রহিয়াছে। বৃদ্ধা তখন আপন বস্ত্রাঞ্চলে প্রেমদাসকে ব্যজন করিতে আরম্ভ করিল। এই সময় হঠাৎ প্রেমদাসের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। প্রেমদাস চক্ষু উন্মিলন করিয়াই বৃদ্ধাকে দেখিয়া বলিল—"কে তুমি ?"

ভিখারিণী বলিল—"আমি ভিখারিণী, তুমি রদে পড়ে রয়েছ দেখে তোমার সেবা করছি। তুমি এমন করে শুয়ে রয়েছ কেন বাবা ?"

প্রেমদাস বিস্মিতনেত্রে ভিখারিণীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল —"তুমি ভিখারিণী! তুমি আমার জন্য এত কষ্ট সহ্য করিয়াছ! দাসীবেশ ধারণ করে শত্রু শিবিরে আগমন করিয়াছ ?"

ভিখারিণী প্রেমদাসের এরূপ কথার অর্থ ভালরূপ বুঝিতে পারিল না বটে; কিন্তু তাহার সৌজন্যতায় বড়ই আহ্লাদিত

হইয়া বলিল—"বালাই! কে তোমার শত্রু বাবা? এখানে এমন করে শুয়ে থেকো না—তুমি ঘরের ছেলে ঘরে যাও।"

প্রেমদাস তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—"না ভিখারিণী—আমি শত্রুর হস্ত হইতে, মৃত্যুর হস্ত হইতে গোপনে ছদ্মবেশে পলায়ন করিতে পারিব না—ইহা বীরের কার্য্য নহে।"

ভিখারিণী একবারেই অবাক্! প্রেমদাসের কথার এক বিন্দুও বুঝিতে পারিল না, কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। প্রেমদাস পুনরায় আরম্ভ করিল—"ভিখারিণী, তুমি আমার উদ্ধারে যত্নবতী হইয়াছ, তাহার জন্য আমি আজন্মকাল তোমার নিকট বাধিত রহিলাম। কিন্তু আমি এরূপ উদ্ধারের প্রার্থী নই, আমি এ উদ্ধার ইচ্ছা করি না।"

ভিখারিণী এইবার বলিল—"উদ্ধার—উদ্ধার কি বল্‌ছিস রে বাবা? এ সব কি শাস্ত্রের কথা? সে দিন বামনদের সরলা সীতার উদ্ধারের গল্প করেছিল, সরলার সে উদ্ধারের কথা ত আমি জানি।"

প্রেমদাস বসিয়াছিল, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে সে মূর্ত্তিতে ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। প্রেমদাস সক্রোধে বলিল—"কি! সরলার উদ্ধার! সেই পাষণ্ড শকুনির হস্ত হইতে প্রাণের সরলাকে যে উদ্ধার করিতে হইবে, একথা পর্য্যন্ত আমার স্মরণ নাই! ধিক্ আমার স্মরণশক্তিকে! ধিক্ আমার কারাগৃহবাসে!! ভিখারিণী, তোমার কথাই ঠিক্ হইল, আমি সরলার উদ্ধারে এখনই চলিলাম।"

এই বলিয়া প্রেমদাস ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। বুড়ী অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল!

অলৌকিক চিত্র।

এখন প্রেমদাস সরলার উদ্ধারের উদ্দেশে বহির্গত হইয়াছে, কিন্তু কোথায় গিয়া কিরূপে সরলার উদ্ধার সাধন করিতে হইবে, প্রেমদাসের তাহা কিছুই স্মরণ নাই। প্রেমদাস ব্যাকুলহৃদয়ে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় হঠাৎ আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। চারিদিক মেঘগর্জ্জনে কম্পিত হইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতালোকও চমকিতে আরম্ভ করিল। এরূপ শুভ-ঘটনায় প্রেমদাসের আনন্দের আর সীমা ছিল না, যখন তাহার বড়সাধের দুর্য্যোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই যে তাহার আশা সফলের সুযোগ হইবে, এ বিশ্বাস প্রেমদাসের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া গেল। যেমন বৃক্ষাদি সমস্ত দিন তপনদেবের প্রখর করে সন্তাপিত হইয়া এখন বারিবর্ষণে সতেজ হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমদাসের বিরহ সন্তাপিত হৃদয়ও আজ এই প্রলয়লক্ষণাক্রান্ত দুর্যোগে সতেজ হইয়া উঠিল। হৃদয়ের বলের সহিত তুলনায় শারিরীক বল কিছুই নহে, সুতরাং হৃদয়ের বলে বলীয়ান্ প্রেমদাস এই ভয়ানক দুর্য্যোগেও আশ্রয় অন্বেষণে বিমুখ! বরং নিরাশ্রয়ে সেই দুর্যোগে বেড়াইতে বেড়াইতে প্রেমদাস বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়—এই দুর্যোগ ভিন্ন আর অন্য কোন সুযোগ আজ আর প্রেমদাসের অদৃষ্টে ঘটিল না। প্রেম-দাস এমন সাধের দুর্যোগের মধ্যে অশ্বচালনা করিয়া কোন মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিল না, পদব্রজে হাঁটিতে হাঁটিতে এই দুর্যোগে কোন কুঠিরেও আশ্রয় পাইল না, এমন কি এই দুর্যোগের মধ্যে দূরে একটা আলোও দেখিতে পাইল না! তবে এ দুর্যোগ লইয়া প্রেমদাস আর কি করিবে? ক্রমে তাহার

হৃদয়ের বল হ্রাস হইতে লাগিল, প্রেমদাস তখন আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, এখন আর আশ্রয় না পাইলে নিশ্চয়ই প্রেমদাসের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইবে। শেষে অনেক কষ্টে প্রেমদাস এক গ্রামপ্রান্তস্থিত জনমানবশূন্য ভগ্ন অট্টালিকায় আশ্রয় লইল।

গৃহটি লোকজনশূন্য দেখিয়া প্রেমদাসের প্রেমিক হৃদয় একবার চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তখন জল ঝড় খাইয়া প্রেমদাস নিতান্তই ক্লান্ত, তাহার পর সমস্ত বস্ত্র জলে ভিজিয়া এবং কর্দ্দমে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে, সেই কারণ কোনরূপ প্রেম লীলায় প্রবৃত্ত হইতে প্রেমদাসের তখন আর উৎসাহ হইল না। এই সময় সন্ধ্যা হইয়াছিল, প্রেমদাস বস্ত্রাদির এক প্রকার ব্যবস্থা করিয়া সে রাত্রি সেই জনশূন্য গৃহে অগাধনিদ্রায় অতিবাহিত করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এদিকে প্রেমদাসের পলায়নের সংবাদ তাঁহার পিতা সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় জানিতে পারিলেন। পুত্রের প্রতি তাঁহার বরাবর বিরক্তভাব ছিল, সুতরাং তিনি এ সংবাদকে তাদৃশ অশুভ সংবাদ মনে করিলেন না, এবং পুত্রের জন্য সেরূপ অস্থিরও হইয়া পড়িলেন না। কিন্তু এ সংবাদ যখন প্রেমদাসের জননী শুনিলেন, তখন তিনি নিতান্ত অস্থির হইলেন, সুতরাং গৃহিণীর তাড়নায় প্রেমদাসের পিতা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন

না। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দুইপ্রহর পর্য্যন্ত স্বগ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলে পুত্রের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইলেন। সে রাত্রে সে অনুসন্ধানের কিন্তু কোন ফলই হইল না। পরদিন প্রভাতে রাখালদাসের নিকট তিনি পুত্রের মানসিক অবস্থার সমস্ত পরিচয় পাইলেন, এবং সেই দিন আহারান্তে রাখালদাসকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় পুত্রের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। এইবার তিনি প্রেমদাসের সংবাদ পাইলেন। যে গ্রামে প্রেমদাস কাঁকুড় আহার ও যষ্টির প্রহার খাইয়াছিল, সেই গ্রামের সেই কৃষকের নিকট সমস্ত কথা শুনিলেন। তার পর অন্য গ্রামের ভূতনাথের সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তাহার মুখেও পুত্রের অনেক পরিচয় পাইলেন, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহই প্রেমদাস এখন কোথায় আছে, তাহা বলিতে পারিল না।

অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহারাও জলঝড়ে বড়ই বিপন্ন হইলেন, তখন তাঁহারা দুইজনে সে রাত্রি কোথাও যাপন করিয়া পরদিন গৃহে ফিরিয়া যাইবেন, এইরূপ স্থির করিলেন। নিকটেই প্রেমদাসের পিতার গুরুর গৃহ ছিল, অন্য কোন স্থানে আশ্রয় না লইয়া তখন গুরুর গৃহেই সে রাত্রি যাপন করা স্থির হইল। ঘটনাক্রমে প্রেমদাস যে জনশূন্য ভগ্ন অট্টালিকায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার সন্নিকটেই সেই গুরুর গৃহ।

প্রেমদাসের পিতা গুরুর চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে পুত্রের বিষয় সমস্তই নিবেদন করিলেন। গুরু শুনিয়া বলিলেন—

"প্রেমদাস নিশ্চয় কোন বায়ুরোগগ্রস্ত হইয়াছে।"

কিন্তু রাখলদাস তৎক্ষণাৎ গুরুদেবকে নিবেদন করিল—"আজ্ঞে, ইহা বায়ুরোগ নহে, আর যদি বায়ুরোগ হয়, তবে ইহা

দেশীয় বায়ুরোগ নহে, ইহা এক প্রকার বিলাতি বায়ুরোগ। এ দেশে নূতন আমদানি হইয়াছে। বাঙ্গালার বর্ত্তমান উপন্যাস লেখকগণ বিলাত হইতে এই রোগের আমদানি করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদে ইহার কোন ব্যবস্থা নাই। এদেশে যতই বিলাতি ধরণের উপন্যাসের ছড়াছড়ি হইবে, এ রোগেরও ততই বৃদ্ধি দেখিতে পাইবেন। এ রোগ আবার বড়ই সংক্রামক, শেষে দেখিবেন ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সকলেই এই ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইয়াছে।"

গুরুদেব রাখালদাসের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"বটে! কি ভয়ানক কথা! বাঙ্গালার উপন্যাস গুলো কি বিলাতি ভূত নাকি? তবে এখন হইতে সকলেরই সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য। আচ্ছা, আয়ুর্ব্বেদে ব্যবস্থা না থাকুক, ডাক্তারী চিকিৎসায়ও কি ইহার কোন ব্যবস্থা নাই?"

এই সময় প্রেমদাসের পিতা বলিয়া উঠিলেন—"ব্যাটাকে একবার দেখা পেলে, আমি ভালরূপ মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করতে পারি।"

গুরুদেব তখন শিষ্যকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—"কোন ভয় নাই। আমি গ্রহদেবতার পূজা করিব, স্বস্ত্যয়ন করিব, আর নারায়ণকে তুলসি দিব—তাহাতেই তোমার পুত্র রোগমুক্ত হইবে। এমন কোন রোগ নাই, যাহা দৈবকার্য্যের দ্বারা আরোগ্য হয় না।"

রোগের ব্যবস্থা করিতে গিয়া গুরুদেব নিজের ব্যবস্থার চেষ্টায় ছিলেন! প্রেমদাসের পিতা এবং রাখালদাস গুরুদেবের মঙ্গলকামনার প্রশংসা করিয়া সে রাত্রি সেখানেই অবস্থিতি

করিলেন। পর দিন প্রভাতে দেশে ফিরিয়া যাইবার উদ্দেশে তাঁহারা দুইজনে বহির্গত হইয়াছেন, গুরুদেবও নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন, এমন সময়ে গুরুদেবের গৃহ হইতে কিছুদূর গিয়াই তাঁহারা সেই ভগ্ন অট্টালিকার সম্মুখে প্রেমদাসকে করতলে কপোলবিন্যাসে উপবিষ্ট দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন! তাঁহাদের এত পরিশ্রম এইবার সফল হইল। তখন প্রেমদাসের পিতা ও রাখালদাস হঠাৎ তাহার নিকট না গিয়া প্রেমদাসের অবস্থা বুঝিবার জন্য প্রথমে গুরুদেবকে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহারা একটু অন্তরালে রহিলেন।

গুরুদেব প্রেমদাসের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন প্রেমদাস চিন্তা ত্যাগ করিয়া আগন্তুকের মুখের প্রতি চাহিল। এই সময় গুরুদেব প্রেমদাসকে বলিলেন—"আমায় চিনিতে পারিতেছ না? আমি যে তোমার গুরু।"

প্রেমদাস তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি ভক্তির সহিত সাষ্টাঙ্গে গুরুদেবের চরণে প্রণাম করিল। গুরুদেব প্রেমদাসের ঈদৃশ ব্যবহারে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"প্রেমদাস,—"

গুরুদেবের মুখের কথা মুখেই রহিল। কারণ, প্রেমদাস তৎক্ষণাৎ গুরুদেবের কথায় বাধা দিয়া বলিল—"আজ্ঞে, আপনার ভুল হইতেছে, আমি এখন আর প্রেমদাস নই—এখন আমি হেমচন্দ্র।"

গুরুদেবের তখন হরিষে বিষাদ হইল। এই কথাতেই প্রেমদাস যে বায়ুরোগগ্রস্ত তাহাতে তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না। তখন

তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—"তা যাহাই হউক—তুমি বাপু এত দিন কোথায় লুকাইয়া ছিলে ?"

প্রেমদাস। আজ্ঞে, অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, দিল্লীতে কার্য্যসিদ্ধ হয় নাই। পরন্তু যবন আমার পশ্চাদ্গামী হইয়াছিল, এই জন্যই একটু সতর্ক হইয়াছিলাম মাত্র, আমি লুক্কায়িত হই নাই।

প্রেমদাসের কথা শুনিয়া গুরুদেব একবারেই অবাক্! এরূপ প্রলাপ বাক্যের কোন অর্থই তিনি বুঝিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ তিনি নীরবে রহিলেন। তখন প্রেমদাস করযোড়ে ও গললগ্নীকৃতবাসে আরম্ভ করিল—"গুরুদেব! আমার মৃণালিনীকে আপনি কোথায় রাখিয়াছেন ?"

গুরুদেব তখন আর নীরবে না থাকিয়া প্রেমদাসকে বুঝাইবার জন্য বলিলেন—"বাপু হে! আমি কেবল তোমারই সন্ধানে ফিরিতেছি, তোমার মৃণালিনী কে তাহা জানি না, তুমি কিরূপে আমায় সে সন্দেহ করিলে ?"

প্রেমদাস তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—"আমি মৃণালিনীর ধাত্রীর মুখে শুনিয়াছি যে আপনিই তাঁহাকে আমার অঙ্গুরী দেখাইয়া ভুলাইয়া আনিয়াছেন। গুরুদেব ভিন্ন এ কার্য্য কাহার ?"

গুরু। হাঁ, এ গুরুদেবেরই উপযুক্ত কার্য্যই বটে। তা বাপু, এখন আমার গৃহে আইস।

প্রেম। আপনি মৃণালিনীর অনুসন্ধান না দিলে আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিব না।

ব্রাহ্মণ এইবার মৃদুভৎর্সনা আরম্ভ করিলেন—"ছি বাপু,

গুরুর কথা অমান্য করা কি ভাল? তুমি যে বংশে জন্মিয়াছ, যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছ, তাহাতে গুরুকে অমান্য করা কি তোমার কর্ত্তব্য?"

প্রেমদাস তখন উত্তেজিত হইয়া বলিল -"বংশ—শিক্ষা—কর্ত্তব্য অতল জলে ডুবিয়া যাউক।"

প্রেমদাসকে উত্তেজিত দেখিয়া গুরুদেব সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন—"বাপু হে, একটু স্থির হও। স্থির হইয়া স্মরণ করিয়া দেখ দেখি যে মৃণালিনী বলিয়া তোমার কেহ আত্মীয়া আছে কি না। আমিত জানি—কেহই নাই। আর তাহার জন্য তোমার এত উদ্বিগ্ন হইবার কোন আবশ্যকও নাই। তুমি মনে কর, তোমার সে মৃণালিনী নাই—মৃণালিনী মরিয়া গিয়াছে।"

প্রেমদাস এতক্ষণ বসিয়াছিল, এইবার উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিল—"তবে সে আপনারই কার্য্য। মৃণালিনীর বধকর্ত্তা, আমারও বধ্য। আমি এই মুষ্টাঘাতে গুরুহত্যা ব্রহ্মহত্যা উভয় দুষ্ক্রিয়া সাধন করিব।"

এবার কেবল মুখে বলা নহে, কার্য্যেও তাহাই ঘটিল। প্রেমদাসের কথা শেষ হইতে না হইতেই প্রেমদাস গুরুদেবের উপর লাফাইয়া পড়িল। তাঁহার সেই প্রভাতসমীরণে আন্দোলিত সুদীর্ঘ শিখা ধরিয়া মুষ্টাঘাত আরম্ভ করিল। গুরুদেবের ও ইহাতেই চৈতন্য হইল। আর চৈতন্য হইল যে দুই জন লোক দূর হইতে তাহাদের এই ব্যাপার দেখিতেছিল। তাহাদের মধ্যে রাখালদাস দৌড়িয়া আসিয়া প্রেমদাসকে ধরিয়া ফেলিল। প্রেমদাস তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া যেন একটু অপ্রস্তুত হইল। কারণ, মাধবাচার্য্য যে হেমচন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ প্রহারিত হন নাই, এই

সময় তাহার সেই কথা স্মরণ হইল। গুরুদেব প্রেমদাসের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলে পর, রাখালদাস গুরুদেবের কানে কানে বলিল—"আপনি কর্ত্তাকে সঙ্গে নিয়ে, ঘাটে গিয়ে নৌকা ঠিক্ করে রাখুন, আমি পেমাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি।"

গুরুদেব আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রেমদাস এইবার বিস্মিতনেত্রে রাখালের প্রতি চাহিয়া বলিল—"তুমি কি আমার দ্বিগ্বিজয় ?"

রাখালদাস উত্তর করিল—"আজ্ঞে হাঁ প্রভু, আমিই আপনার দিগ্বিজয়।"

তখন প্রেমদাস মহাহ্লাদে বলিল—"দিগ্বিজয়, ভিখারিণী গিরিজায়া এখনও আসিল না। তুমি একবার তাহার সন্ধানে যাও।"

রাখালদাস অমনি যোড়হস্তে বলিল—"প্রভু, আমি এইমাত্র সংবাদ পাইলাম যে গিরিজায়া মৃণালিনীকে লইয়া নবদ্বীপে চলিয়া গিয়াছে।"

প্রেমদাসের আর আহ্লাদের সীমা নাই। প্রেমদাস তখন আহ্লাদে অধীর হইয়া বলিল—"ধন্য মৃণালিনী! তুমিই ধন্য! তুমি যখন আমার বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আমার পূর্ব্বেই নবদ্বীপ যাত্রা করিয়াছ, তখন কে না তোমায় ধন্যবাদ দিবে ?"

রাখালদাস এইবার বলিল—"প্রভু, তবে এখানে বৃথা আর কাল বিলম্বে প্রয়োজন কি ? চলুন, আমরাও নবদ্বীপ যাত্রা করি।"

প্রেমদাস বলিল—"না, আর আমি এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে পারি না। দ্বিগ্বিজয়, আমাদের নৌকা কোথায় ?"

রাখালদাস তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—"নৌকা ঘাটেতেই প্রস্তুত আছে। আমার সঙ্গে আসুন।"

তখন আর বাক্যব্যয় না করিয়া প্রেমদাস রাখালদাসের সঙ্গে সঙ্গেই চলিল। রাখালদাসের কৌশলে আজ প্রেমদাসের ন্যায় একজন বীরপুরুষ বিনাযুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাভূত হইল! আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এরূপ কৌশল না করিলে প্রেমদাস বিনাযুদ্ধে কখনই এরূপ পরাভূত হইত না, সুতরাং প্রেমদাসকে গৃহে লইয়া যাওয়া অসাধ্য হইত।

ঘাটে যথার্থই নৌকা প্রস্তুত ছিল। সেই নৌকায় প্রেমদাসের পিতা লুক্কায়িত অবস্থায় ছিলেন। নৌকা দেখিয়া প্রেমদাসের আর আনন্দের সীমা ছিল না, তিনি এক লম্ফে নৌকায় উঠিয়া মাঝিগণকে শীঘ্র নবদ্বীপ যাত্রা করিতে অনুমতি করিলেন। এইবার কিন্তু মূর্খ মাঝিগণ বড়ই গোলযোগ আরম্ভ করিল, এক স্থানের ভাড়া করিয়া অন্য স্থানে তাহারা কেন যাইবে? তখন এই কথা লইয়া একটা ভয়ানক গোলযোগ আরম্ভ করিল। সে গোলযোগ প্রেমদাসের প্রেমিক হৃদয়ে ভয়ানক আঘাত করিল, কিন্তু বন্ধুবর রাখালদাস পুনরায় কৌশল করিয়া সমস্ত গোলযোগ মিটাইয়া দিল। তখন নৌকা নবদ্বীপ যাইতেছে বলিয়া প্রেমদাসের গ্রামাভিমুখেই চলিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

বৈকালে নৌকা গ্রামে আসিয়া পৌছিল। প্রেমদাস নবদ্বীপের শোভা দর্শন করিতে করিতে রাখালদাসের সঙ্গে সঙ্গে

চলিল। রাখালদাস এখন প্রেমদাসের অনুগত ভৃত্য দিগ্বিজয় মাত্র, সুতরাং প্রেমদাসের বিশ্বাসের উপর কোনরূপ আঘাত করিল না। প্রেমদাসের পিতা অন্য পথে পূর্ব্বেই গৃহে চলিয়া গিয়াছিলেন। প্রেমদাস তাহার নিজ বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র রাখালদাস তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিল, তখন প্রেমদাস বলিল—"এই অট্টালিকাই কি বঙ্গরাজ আমার বাসস্থানের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন ?"

রাখালদাস বিনীতভাবে বলিল—"আজ্ঞে হাঁ প্রভু।"

তখন প্রেমদাস আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। রাখালদাস এই সময় নিজ গৃহে চলিয়া গেল। গৃহে প্রবেশ করিয়াই প্রেমদাস "মনোরমে!—মনোরমে!" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। ঘটনাক্রমে এই গৃহে যে ঝি ছিল, তাহার দ্বাদশবৎসরের এক কন্যার নাম—ঝি সাধ করিয়া মনোরমা রাখিয়াছিল। সেই মনোরমা মাতার সহিত এই গৃহেই বাস করিত। প্রেমদাস যখন মনোরমাকে ডাকিতে আরম্ভ করিল, তখন সকলেই মনে করিল যে প্রেমদাস ঝির মনোরমা নাম্নী কন্যাকেই ডাকিতেছে। সুতরাং অচিরাৎ সেই মনোরমা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। বিনা কারণে প্রেমদাস গৃহে আসিয়াই মনোরমাকে ডাকে নাই। প্রেমদাস গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার বিনা অনুমতিতে তাহারই অনুগত ভৃত্য দিগ্বিজয় কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। তার পর প্রেমদাস দেখিল যেন বাড়ী সুদ্ধ সকলে তাহাকে একবারে বন্দী করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি যেন কেবল গৃহে নহে, কোন কারা+গৃহে হঠাৎ আবদ্ধ হইয়াছেন। এই কারাগৃহে আবদ্ধরূপ ভয় বরাবর প্রেমদাসের মনের ভিতর

ছুটোছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। প্রেমদাস তৎক্ষণাৎ মনে করিল—এতক্ষণ দিগ্বিজয় ভ্রমে যাহার সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলোম, সে কথনই দিগ্বিজয় নয়, নিশ্চয়ই সেই চৌরোদ্ধরণিক শান্তশীল। যথন শান্তশীল তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছে, তখন সেই মনোরমা ভিন্ন কে তাহাকে কারামুক্ত করিবে? সেইজন্য প্রেমদাস "মনোরমে!—মনোরমে!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল।

মনোরমা সম্মুখে আসিলে প্রেমদাস বলিল—"আমায় শীঘ্র মুক্ত কর।"

ঝির কন্যা ঝাটার চোটে অনেক মলমূত্র ও আস্তাকুঁড় পর্য্যন্ত মুক্ত করিয়াছে, সুতরাং সে মুক্ত করিবার প্রক্রিয়া বিলক্ষণ জানিত। সেইরূপ কি মুক্ত করিতে হইবে—মনে করিয়া, তাড়াতাড়ি একগাছি সুদীর্ঘ ঝাটা হস্তে লইয়া দৌড়িয়া আসিল। প্রেমদাস মনোরমার হস্তে সেই সুপরিচিত অস্ত্র দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল। কারণ মনোরমার সহিত তাঁহার যে কোন বীররসের সংস্রব আছে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

প্রতিদিন প্রেমদাসের গৃহে এইরূপ বিভ্রাট হইতে লাগিল। প্রেমদাসের পিতা ডাক্তারী, কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি অনেক প্রকার চিকিৎসাও করাইতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফলই হইল না। শেষে সে সকল চিকিৎসায় বিরক্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে মুষ্টিযোগের ব্যবস্থাও হইত। ক্রমে প্রেমদাসের পিতা একবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। এই সময় একদিন রাখালদাস আসিয়া তাঁহাকে বলিল—"মহাশয়, আপনি ত চিকিৎসার

কিছু বাকি রাখেন নাই। এখন রোগীকে কিছুদিন আমার চিকিৎসায় রাখুন। কিন্তু আমি যা বল্‌বো, তাই কর্‌তে হবে।”

প্রেমদাসের পিতা উত্তর করিলেন—“আজ থেকে রোগীকে তোমার হাতেই দিলাম, আর তুমি যখন যা বল্‌বে, আমি তৎক্ষণাৎ তাই কর্ত্তে প্রস্তুতও আছি।”

রাখালদাস বলিল—“তবে বিলম্ব না করে যত শীঘ্র পারেন, একটি বড় পাত্রী দেখে, প্রেমদাসের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করুন।”

কথা শুনিয়া প্রেমদাসের পিতা বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন—“এরূপ বায়ুরোগগ্রস্ত পাত্রকে বিবাহ দেবে কে?”

রাখালদাস এবার বলিল—“আপনার যদি সে বিশ্বাস না থাকে, তবে আমিই সম্বন্ধ স্থির কর্‌বো, আপনি বিবাহের অন্যান্য উদ্যোগ আর দিন স্থির করুন।”

এই বলিয়া রাখালদাস পাত্রীর অন্বেষণে বহির্গত হইয়া তাহারই কোন আত্মীয়ের চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্ক এক পরমাসুন্দরী অবিবাহিত কন্যার সহিত প্রেমদাসের বিবাহ স্থির করিলেন। পাত্র যে বায়ুরোগগ্রস্ত নয়—রাখালদাসের কথাতেই পাত্রীর পিতার বিশ্বাস জন্মিল। আর আজকাল কন্যার বিবাহের যেরূপ সুব্যবস্থা প্রচলিত, তাহাতে চতুর্দ্দশ বৎসরের অবিবাহিতা কন্যার এখন আর অভাব নাই, সুতরাং রাখালদাসকে ইহার জন্য বিশেষ কোন কষ্ট পাইতে হইল না।

১৫ই বৈশাখ প্রেমদাসের বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছিল গ্রামের লোকে যে এ কথা শুনিল, সেই আশ্চর্য্য হইল। এই কথা লইয়া গ্রামে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এরূপ বায়ুরোগগ্রস্ত ছেলের যে বিবাহ হইতে পারে, অনেকেই সে কথা

বিশ্বাস করিল না। এ দিকে দেখিতে দেখিতে বিনা নিমন্ত্রণে ১৫ই বৈশাখ আসিয়া উপস্থিত হইল, সুতরাং আজ প্রেমদাসের বিবাহ। বরযাত্রী হইবার জন্য গ্রামস্থ সকলকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। রাখালদাস আজ বড়ই ব্যস্ত, কারণ এ বিবাহের ভার সমস্ত তিনি স্ব-ইচ্ছায় নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন। এমন কি এরূপ পাগলের বিবাহকার্য্য যে কিরূপে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে, সে বিষয়ে প্রেমদাসের পিতার পর্য্যন্তও সন্দেহ ছিল। এমন সময় অন্তঃপুর হইতে সংবাদ আসিল যে, বর কোন ক্রমেই সময়োপযোগী বেশভূষা করিবে না, এবং স্ত্রীলোকদিগকে মাঙ্গলিক কার্য্যও করিতে দিবে না। রাখালদাস তখন অন্য কার্য্য রাখিয়া অন্তঃপুরের দিকে দৌড়িলেন, এবং বন্ধুবর প্রেমদাসকে বলিলেন—"সখে, আজি বড় আনন্দের দিন।"

প্রেমদাস রাখালদাসের কথা শুনিয়াই আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিল—"কিসের আনন্দ সখে? কেন আজি এ কোলাহল?"

রাখাল। কিসের আনন্দ!—যাহার আনন্দে আজ
আনন্দিত সব পুরবাসী, সে জিজ্ঞাসে
মোরে—কিসের আনন্দ! কোলাহল নহে
সখে—নহে বিকট চীৎকার,—উৎসবের
সুমধুর ধ্বনি ইহা। ধর সখে, পর
রাজবেশ, ঘুচাও দারুণ বিরহানলে।
যে আশা হৃদয়ে তুমি পুষিয়া রেখেছ
অতি সাবধানে—অতি যতন করিয়ে,
সে মিলন-আশা পূর্ণ হবে আজি তব।

প্রেমদাস আর কোথায় যাইবে? তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—

"দাও সখে, রাজবেশ—বিলম্ব সহে না
আর, যে আশায় রেখেছি এ প্রাণ, এত
দিন ধরে, বিধাতা সদয় যদি আজ,
সাজাও মনের সাধে যেবা ইচ্ছা হয়।"

তখন বরের বেশভূষা হইয়া গেল। আজ বাস্তবিকই রাজবেশে প্রেমদাস সজ্জিত, সুতরাং প্রেমদাসের আশা যে পূর্ণ হইবে, তাহার শুভ লক্ষণ সকল তিনি যেন মূর্ত্তিমান দেখিতে পাইলেন। যথাসময়ে মহা সমারোহের সহিত বর ও বরযাত্রী সকল বাহির হইল। চারিদিক বাদ্যরবে কম্পিত হইতে লাগিল, প্রেমদাস কিন্তু মনে করিতে লাগিল—যেন আজ অসংখ্য সেনার অধিনায়ক হইয়া রণবাদ্যে উল্লাসিত হৃদয়ে, তিনি বিপক্ষ দুর্গ আক্রমণ করিতে চলিয়াছেন। তখন তিনি নানা নদ, নদী, উপবন—এমন কি উচ্চশৃঙ্গ পর্ব্বত সকল পর্য্যন্ত অনায়াসে অতিক্রম করিয়া যাইতে প্রস্তুত ছিলেন। একটি জনশূন্য প্রান্তর, আর একটি জনপূর্ণ লোকালয় ব্যতীত প্রেমদাসকে কিন্তু অন্য কিছুই অতিক্রম করিতে হয় নাই। ইহাতে প্রেমদাসের মন কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বন্ধুবর রাখালদাস তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল—"আজ দুর্গাক্রমণের পালা নহে, আজ শুভ মিলনের পালা!"

প্রেমদাস তখন পুনরায় প্রফুল্লমনে মিলনের পালা আরম্ভ করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে সকলে মহাহ্লাদে কন্যাকর্ত্তার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল। তখন একটা অভ্যর্থনার মহা ধুম

পড়িয়া গেল। প্রেমদাসের অভ্যর্থনা ও সমাদর আজ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সুতরাং প্রেমদাসের আজ আর আনন্দের সীমা নাই। যখন প্রেমদাস সভায় আসিয়া উপবিষ্ট হইল, তখন আপনাকে অমাত্যগণ পরিবেষ্টিত এবং সিংহাসনোপবিষ্ট মনে করিয়া প্রেমদাস গম্ভীর হইয়া বসিলেন এবং কি রাজকার্য্যের আলোচনা করিবেন—মনে মনে তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় রাখালদাস আসিয়া প্রেমদাসের কানে কানে কি কথা বলিল। প্রেমদাস তৎক্ষণাৎ সভাভঙ্গ করিয়া রাখালদাসের সহিত কন্যাকর্ত্তার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রথমেই তাহাকে সম্প্রদান কার্য্যের আনুসঙ্গিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে অনুরোধ করা হইল, তখন প্রেমদাস বিস্মিতনেত্রে একবার রাখালদাসের মুখের প্রতি চাহিল। রাখালদাস তৎক্ষণাৎ প্রেমদাসের কানে কানে বলিল—"সখে, আজ তোমার পরীক্ষার দিন, তুমি সেই অপূর্ব্ব মিলনের যোগ্য কি না—তাহার জন্য নানা পরীক্ষা হইবে, আমার বিশেষ ভরসা আছে, তুমি সকল পরীক্ষায় জয়ী হইবে। এখন যে যাহা বলিবে, কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা করিলেই তুমি আজিকার জীবনের এই মহাপরীক্ষায় জয়ী হইতে পারিবে।"

এই জয়ের কথাতেই প্রেমদাস একবারে জল হইয়া গেল। তখন যে যাহা বলিল—বিনা আপত্তিতে তৎক্ষণাৎ তাহা করিতে আরম্ভ করিল। তবে পুরাঙ্গনাগণের স্ত্রী-আচারের সময় প্রেমদাস কর্ণে যে জ্বালা অনুভব করিয়াছিল, তাহাকে বেষ্টন করিয়া যখন তাহারাই আবার সাতপাক্ ঘূরণ আরম্ভ করিল, তখন প্রেমদাসের সকল জ্বালা নিবারণ হইয়া গেল। প্রেমদাস মনে করিল, আজ মিলনের দিনে সখিগণ আনন্দে তাহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য

করিয়া বেড়াইতেছে। এই খানেই শুভদৃষ্টি হইয়া গেল, প্রেমদাস আবার গোলে পড়িল। এবার সেই অবগুণ্ঠনের প্রতি আপত্তি করিয়া ফেলিল। রাখালদাস পুনরায় পরীক্ষার কথাটা স্মরণ করিয়া দেওয়ায়, প্রেমদাস আবার নীরব হইল।

তার পর সম্প্রদান ক্রিয়া হইয়া গেল। একখানি স্বর্ণ বলয়বেষ্টিত অতি কোমল গোলাপ হস্ত প্রেমদাসের হস্তের উপর রক্ষিত হইল। সে সুখস্পর্শে প্রেমদাসের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তার পর বাসার ঘর। এখন প্রেমদাস স্বর্গে না তাহা হইতেও কোন উচ্চ স্থানে? সেই প্রফুল্লমুখকমল-শোভিত রমণীদল পরিবেষ্টিত হইয়া প্রেমদাস এখন কেবল এই মহাতর্কের মীমাংসায় ব্যস্ত ছিল। তার পর যখন চারিদিকের সেই মুখকমলে বৈদ্যুতিক হাসি খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল, তখন প্রেমদাসের আজিকার এই সকল ঘটনা স্বপ্ন বলিয়া ভ্রম হইল। শেষে যখন কোন সুন্দরী সুমধুরকণ্ঠে সঙ্গীত সুধা ছড়াইতে আরম্ভ করিল, তখন প্রেমদাস আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রেমদাসের বিবাহের পর দুই মাস গত হইয়া গিয়াছে। আজ ১৫ই আষাঢ়, সুতরাং বর্ষাকাল! কৃষকগণ "জল—জল" করিয়া সারা হইতেছে। খানাডোবা চুলোয় যাউক, নদনদী পুষ্করিণী সমস্তই শুকাইয়া রহিয়াছে—তত্রাচ আজ বর্ষাকাল, কারণ আজ ১৫ই আষাঢ়! একথা যিনি অস্বীকার করিবেন,

তিনি অকালে কালের কোলে চিরকালের জন্য কবলিত হইবেন। কালের কি বিচিত্র গতি! বিশেষতঃ এই বর্ষাকালের! কবিদিগের মতে বসন্তকাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঋতু, তাহার নিম্নেই এই বর্ষাকাল। অর্থাৎ বর্ষাকাল ঋতুশ্রেণীর দ্বিতীয় স্থলাভিষিক্ত, কিন্তু এদিকে দেখ—বসন্তকালের পরেই বর্ষাকাল না হইয়া কোথা হইতে উচ্চাভিলাষী গ্রীষ্মকাল আসিয়া অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে। সেই জন্যই আমরা বলিতেছিলাম, হায়! কালের কি বিচিত্র গতি—বিশেষতঃ এই বর্ষাকালের!

বর্ষাকালের অন্য পরিচয় আর কি দিব? এই কালেই কালিদাসের "মেঘদূত" জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এ কালেও মদনের 'পঞ্চশর ও ফুলধনু' আছে, বিরহিণীর 'সুদীর্ঘ নিশ্বাস ও গাত্র দাহ' আছে, (কোন্ কালেই বা নাই?) সুতরাং হে পাঠকপাঠিকাগণ! তোমরা পুনরায় সাবধান হও, আমি বর্ষা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বর্ষাকাল বসন্তের কনিষ্ঠ সহোদর, কিন্তু জ্যেষ্ঠ অপেক্ষা কনিষ্ঠের প্রতি সূর্য্যদেবের স্নেহ কিছু অধিক, তাহারই উজ্জ্বল প্রমাণ চারিদিকে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই কালে সকলেরই রসের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেই রসাধিক্য নীরস করিবার জন্যই বোধ হয়, সূর্য্যদেবের এই প্রখর কর। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে এ বৎসর চারিদিকই রস, সুতরাং আমাদের এই বর্ষা বর্ণনা যে সরস হইবে, পাঠকপাঠিকাগণ এরূপ আশা কখনই করিতে পারেন না। মুখবন্ধ শেষ করিয়া এইবার আসল কথার অবতারণা করিব না।

শূন্যে—উর্দ্ধে একটী পক্ষী "ফটিক জল—ফটিক জল" রবে

বামাকণ্ঠে আকাশে সুরলহরী ছড়াইতেছিল, আর নিম্নে—পৃথিবীতে—কৃষকগণ অপেক্ষাকৃত কর্কশ পুরুষকণ্ঠে "জল—জল" রবে তাহারই দোয়ারকীতে নিযুক্ত। ঠিক যেন শ্রাদ্ধ বাড়ীতে সম্প্রদায়ের সহিত সুপ্রসিদ্ধা সহচরী কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছে। কেবল কৃষকগণ কেন এখন সকলেই সুরে—বেসুরে, তালে—বেতালে 'জল—জল' রবে চারিদিক কম্পিত করিতেছে। তবে কি জল কোথাও নাই?—মিথ্যা কথা। বর্ষাকালে জল নাই! ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে? সকলে স্থির হও—জল আছে। কোথায় সে জল?—অন্য কোথায় নহে, কেবল দরিদ্র ও বিরহিণীর চক্ষে!

হায়! আমরা বর্ণনাস্রোতে গাত্র ভাসাইয়া দিয়া কোথায় যাইতে কোথায় গিয়া পড়িয়াছি। কোথায় উপসংহারে Comedy করিয়া সকলকে হাসাইব—না সে কথা ভুলিয়া গিয়া Tragedy করিতে বসিয়াছি। আমাদের মতন গণ্ডমূর্খ আর কে আছে?

এখন আজিকার সেই আনন্দ সংবাদ কেবল আমাদের বলিতে বাকি আছে, সে কথা বলা হইলেই আমরা নিশ্চিন্ত হই, আর পাঠকপাঠিকাগণও নরক যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন। আমাদের হৃদয় পাষাণ নির্ম্মিত নহে, সুতরাং আমরাও তাঁহাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে, এইবার সেই আনন্দের সংবাদ প্রকাশ করিয়া এই উপন্যাসকে Comedy করিয়া উপসংহার করিব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এই বর্ষাকালে সকলেই নীরস, সুতরাং আমাদের প্রেমদাস এই উপন্যাসের নায়ক হইলেও

তিনি প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হন নাই। তবে আমাদের সরস প্রেমদাস বর্ষাকালের প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে নীরস হইল, না সূর্য্য অপেক্ষাও অধিকতর প্রখর কিরণ ও দীপ্তিশালিনী নবপরিণীতা পত্নীর সহবাসে নীরস হইল—তাহা মীমাংসা করিবার ভার নিজহস্তে গ্রহণ না করিয়া—নিজের মহত্ব দেখাইবার জন্যই আমরা পাঠকপাঠিকাগণের হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

আজ দুই মাসের মধ্যেই আমাদের প্রেমিকশ্রেষ্ঠ প্রেমদাসের প্রেমপূর্ণ সরস হৃদয় নীরস হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং সে সুগভীর হৃদয়ে আর উত্তাল তরঙ্গমালা নাই! সে হৃদয় এখন প্রেমোন্মাদ-শূন্য—নীরব, নিথর ও নিস্তব্ধ। দুই মাসের মধ্যেই কিরূপে এরূপ হইল—তাহা বলি শুন। রাখালদাস প্রেমদাসের বায়ুরোগের যে ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহাই প্রেমদাসের পক্ষে অব্যর্থ হইল। বিবাহের পর রাখাল দুই তিন দিন ধরিয়া সেই সুরবালাকে কি শিখাইল। রাখালদাস সুরবালার নিকটসম্পর্কীয় ভ্রাতা, সুতরাং তাহার সে শিক্ষায় কোন দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। এখন সুরবালা যে প্রেমদাসের নবপরিণীতা স্ত্রী, সে কথায় কি আবার আমাদের কষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না কি?

সুরবালাও একজন শিক্ষিতা বালিকা অর্থাৎ তাহারও উপন্যাসাদি বিলক্ষণ পাঠ করা ছিল। এখন প্রেমদাস যেমন কুকুর, তাহারই উপযুক্ত একটি মুদ্গরের বিশেষ আবশ্যক। রাখালদাস অল্প সময়ের মধ্যেই সুরবালাকে চাঁচিয়া ছুলিয়া একটি মুদ্গর প্রস্তুত করিলেন। প্রথমে লজ্জা বোধ করিলেও কিছুদিন পরে সুরবালা প্রেমদাসের উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী প্রস্তুত হইল। প্রেমদাস তখন সুরবালাকে লইয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে

লাগিল। যখন প্রেমদাস জগৎসিংহ, সুরবালা অমনি তিলোত্তমা। যখন তিনি ওসমান, সুরবালা তখনি আয়েসা;—এইরূপ প্রেমদাস যখন যে নায়কমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইত, সুরবালা তৎক্ষণাৎ তাহারই নায়িকা হইয়া চিত্তবিনোদ করিত। এইপ্রকারে দুই সপ্তাহ গত হইলেপর, প্রেমদাসের অতৃপ্ত প্রেমিকহৃদয় পরিতৃপ্ত হইয়া গেল—তাহার প্রেমপিপাসারও শান্তি হইল। তখন ক্রমে প্রেমদাস আপনার অবস্থা বুঝিল, এবং বুঝিয়া লজ্জিত হইল। বিবাহের পর দুই মাসের মধ্যেই প্রেমদাসের প্রেমলীলা শেষ!

আজ প্রেমদাস বিষণ্ন মনে বসিয়া আপনার গত মানসিক অবস্থার বিষয় ভাবিতেছে, এমন সময় সুরবালা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল—"প্রাণনাথ! আজ তোমার মুখকমল এত বিষণ্ণ কেন? তোমার যুদ্ধচিন্তা কি এতই প্রবল যে অন্তঃপুরে আসিয়াও সে চিন্তার বিরাম নাই?"

প্রেমদাস তৎক্ষণাৎ চিন্তা ত্যাগ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"সুরবালা, আর নয়—অনেক হয়েছে। আর আমার পাগ্‌লামী দেখ্‌তে পারে না, তুমি আমায় আর খেপিও না।"

সুরবালা বলিল—"প্রাণনাথ, ইহারই মধ্যে কি তোমার ঔপন্যাসিক জীবন প্রেমলীলা সংবরণ করিল?"

প্রেমদাস উত্তর করিল—"সুর, রক্ষা কর। এখন তোমার মুখে 'প্রাণনাথ' শুন্‌লে যেন আমার শেল বেঁধে। দুটো শাদা কথা কও, সে কথা শোন্‌বার জন্য আমি বড়ই অস্থির।"

কিছুদিন ধরিয়া ক্রমাগত পোলাও-কালিয়া খাইলে দুটী শাদা ভাতের জন্য যেমন প্রাণ আকুল হয়, সেইরূপ পত্নীর মুখে শাদা কথা শুনিবার জন্য প্রেমদাস এখন অস্থির। রোগ যদিও আরোগ্য

হইয়াছে, তত্রাচ পাছে পুনরাক্রমণ করে, সেই কারণ মধ্যে মধ্যে সুরবালা এইরূপ ঔষধ সেবন করাইতে ভুলিত না। কারণ, কবিরাজ রাখালদাসের এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। এই সময় রাখাল-দাস তথায় আসিয়াই সুর করিয়া কহিল—"কি সংবাদ সখে ?"

প্রেমদাস যোড়হস্তে বলিল—"ভাই, আর কেন যথেষ্ট হয়েছে। তুমি আমায় যে শিক্ষা দিয়েছ, প্রাণ থাক্‌তে সে শিক্ষা আমি ভুল্‌তে পার্‌বো না। এখন আমায় রক্ষা কর। সুরবালাকে বল, সে যেন আমার সঙ্গে গৃহস্থের স্ত্রীর মতন ব্যবহার করে। আমি আর নায়ক নই, এই নাকে কানে খৎ—আর আমি নায়িকা চাই না।"

তখন রাখালদাস ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—"ভাই, আজ তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হয়েছে, এত শীঘ্র যে তুমি প্রকৃ-তিস্থ হবে, আমার সে আশা ছিল না। যা হ'ক আজ থেকে তোমায় পেমা বলেই ডাক্‌বো, আর সুরবালাও আজ থেকে গৃহস্থের বউ হলো।"

প্রেমদাস আহ্লাদে রাখালদাসকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল—"ভাই, তোমার ঋণ আমি কখন পরিশোধ কর্‌তে পার্‌বো না। তুমি আমায় নবজীবন দিয়েছ। তোমায় আর আমি কি দিবো ?"

রাখালদাস হাসিয়া বলিল—"আমায় কিছু দিতে হবে না, তুমি যে ভাল হয়েছ—এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার !"

প্রেমদাস অবাক্ হইয়া রাখালদাসের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল! এই খানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম। কেমন—এখন Comedy হইল ত ?

———

জীবনে বোকা।

(১)

জীবনচন্দ্র কাঠুরিয়া ওরফে জীবনে বোকা কাঠ বেচিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। অবন্তীধামের এক প্রান্তে তাহার নিবাস। নগরের প্রান্তে থাকিয়া সে নিরীহ ভাল মানুষের মতন জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিত। কাহারও সহিত কখন তাহার কোন বিবাদ বিসম্বাদ হয় নাই—বিবাদ বিসম্বাদ কাহাকে বলে—জীবনে বোকা তাহা জানিত না। তবে তাহার মনে মনে একটা বিশ্বাস ছিল যে সে খুব বুদ্ধিমান্! কোন্ বোকারই বা সে বিশ্বাস নাই? জীবনচন্দ্র বর্ণজ্ঞান শূন্য—নিরেট বোকা হইলেও কাহার কখন কোন অনিষ্ট করে নাই—বরং তাহার যতটুকু সাধ্য সে লোকের ইষ্ট করিবার জন্য সর্ব্বদাই লালায়িত থাকিত। সে যথাসাধ্য পরের উপকার করিত বটে, কিন্তু সে যে পরের উপকার করিতেছে—একথা সে সময় তাহার মনে আদৌ উদয় হইত না। পরের উপকার করাটা তাহার যেন একটা প্রকৃতিগত অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল।

সে প্রতিদিন জঙ্গল হইতে যে কাঠ কাটিয়া আনিত, প্রথমে সেই কাঠের বোঝা লইয়া বাজারে আসিত। বাজারে সে কাঠের বোঝা বিক্রয় করিয়া যে পয়সা পাইত, সেই পয়সায় 'ডাহিন-হস্তের ব্যাপারের' যোগাড় করিয়া আপনার কুঁড়ে ঘরে সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরিত। আহারাদির পর কুঁড়ের আগড়টি ঠেলিয়া দিয়া, তাহার মধ্যে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত বা নাসিকা-ধ্বনি' করিত। বিষয় কর্ম্মের মধ্যে জীবন কেবল দুইটি কাজ জানিত; এক কাঠ কাটা, আর এক কাঠ বেচা। কাঠ— যেদিন যাহা পাইত, সেদিন তাহাই কাটিত। তবে বেচার মধ্যে জীবনের কিছু বাহাদুরী ও বুদ্ধিখরচ ছিল। কাঠের দর বলিবার সময় সে প্রথমে হিসাব করিত যে, আজ কত পয়সা হইলে তাহার দিন চলিয়া যাইতে পারে। যেদিন যত পয়সার আবশ্যক, জীবনের সেদিনকার কাঠের দরও তাই। জীবন প্রায়ই বেশী কাঠ কম পয়সায় বেচিত; আর যে দিন কম কাঠে বেশী পয়সা চাহিত, সেদিন তাহার উপবাস! তবে নিরম্বু নহে—গালি খাইয়া পেট ভরাইত! সেই কারণেই জীবনচন্দ্রের আর একটি নাম—জীবনে বোকা।

(২)

একদিন জীবন জঙ্গলের মধ্যে দেখিল,—এক ব্রাহ্মণ দুই প্রহরের রৌদ্রে ঘাসের উপর শুইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। বুদ্ধিমান জীবন তাহা দেখিয়া মনে মনে ভাবিল,—"এ বামুন কি বোকা!"

কিন্তু বোকাই হউক, আর যাহাই হউক—ব্রাহ্মণ ত বটে। এরূপ দুই প্রহরের রৌদ্রে ব্রাহ্মণকে ফেলিয়া রাখিয়া, জীবন

কিরূপে কাঠের যোগাড়ে যাইবে? আবার ব্রাহ্মণের ঘুম ভাঙ্গানও পাপ! অনেক চিন্তার পর, অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়া, জীবন গাছের পাতা আনিয়া, ব্রাহ্মণের মুখের উপর রৌদ্র নিবারণেরআচ্ছাদন করিয়া দিল। তাহাতেই ব্রাহ্মণের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

এখন একটা মজার কথা বলি—শোন। জীবন যাহাকে ব্রাহ্মণ মনে করিয়া এই কাণ্ড করিল, তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহেন—ব্রাহ্মণবেশী স্বয়ং বিধাতা পুরুষ! কেন যে এই জঙ্গলের মধ্যে রৌদ্রে শুইয়া ছিলেন, সে অনেক কথা—তা কথা বলিবার এখন আমার সময় নাই। বিধাতা পুরুষ কিন্তু জীবনের প্রতি বড় খুসি হইলেন, এবং তাহাকে বর লইতে বলিলেন। বোকা বামুনের মুখে একপ পাগলামীর কথা শুনিয়া, জীবন প্রায় হাসিয়া ফেলিয়াছিল। ব্রাহ্মণের বর দিতে জেদ দেখিয়া জীবন কহিল,—"ঠাকুর, এই দুপুর রোদে এমন করে আর কখনও জঙ্গলে শুয়ে থেকো না। আমি তোমার বর চাই না—তুমি ঘরে যাও।"

বিধাতা পুরুষ তখন কহিলেন,—"জীবন, তুমি কি চাও, বল।"

জীবন উত্তর করিল—"ঠাকুর, তোমার কাছ থেকে একবার একটা জিনিস চেয়ে নিয়ে কি হবে? যখন যা ইচ্ছে করবো, কেউ কি তা দিতে পারে? আমি কিছু চাই না; তুমি ঘরে না যাও, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, একবার কবিরাজের বাড়ী যেও।"

বিধাতা পুরুষ তখন জীবনের অজ্ঞাতে তাহাকে বর দিয়া

চলিয়া গেলেন,—"জীবন, তুমি যখন যাহা ইচ্ছা করিবে, তৎক্ষণাৎ সে ইচ্ছা সিদ্ধ হইবে।"

(৩)

বিধাতা পুরুষ চলিয়া গেলেন, জীবন কাঠ কাটিতে নিযুক্ত হইল। যে গাছ কাটিতে আরম্ভ করিল, সে গাছ বড় শক্ত —কাটিতে কাটিতে জীবন ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এই সময় তাহার মনে হঠাৎ এইরূপ ইচ্ছা হইল—"এই কুড়ুলে যদি জলের মতন গাছ কাটা যায়, তা হলে বেঁচে যাই।"

জীবন পুনরায় যখন কুঠারাঘাত করিল, তখন এক আঘাতে সে গাছ জলের মতন কাটা গেল! কেন এরূপ হইল —জীবন তাহা বুঝিতে পারিল না। সে কেবল নিজেরই বাহাদুরী মনে করিল। তার পর সেই গাছটা ছোট ছোট টুক্‌রা করিয়া জীবন একটা বোঝা বাঁধিল। কাটিতেত আর কষ্ট নাই, সুতরাং আজিকার বোঝাটা একটা প্রকাণ্ড হইল। জীবন সে বোঝা উঠাইতে পারিল না।

এদিকেও অপরাহ্ন হইয়া আসিল। কখন্ নগরে গিয়া সে কাষ্ঠ বেচিবে? জীবন তখন ক্লান্ত হইয়া সেই বোঝার উপর বসিল। বসিয়াই জীবনের ইচ্ছা হইল—"যদি বোঝাটা ঘোড়ার মতন টকাবক্ করে আমায় এখনই সহরে নিয়ে যেতে পারে, তা হইলেই আজ কাঠ বেচে পেট ভরে খাই।"

তৎক্ষণাৎ সেই কাষ্ঠের বোঝা ঘোড়ার মতন দৌড়িতে আরম্ভ করিল। জীবন তাহাতে সওয়ার হইয়া নগরে চলিল। এরূপ বিস্ময়জনক ব্যাপারেও জীবন কিছুই বিস্মিত হইল না।

(৪)

নগরের নাম অবন্তীধাম। রাজার নাম অবন্তীনাথ। সন্তান-সন্ততির মধ্যে একমাত্র কন্যা, নাম—ঐলবিলা। কন্যা বয়ঃস্থা, রাজা ও রাণী বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত; কিন্তু কন্যা বিবাহ করিতে কিছুতেই সম্মত নহে, সর্ব্বদাই বিষণ্ণ মনে থাকে। আজ বৈকালে রাজকন্যা দুইজন সহচরী সঙ্গে ছাদের উপর বেড়াইতেছিল; এমন সময় আমাদের জীবনচন্দ্র, কুঠার-হস্তে অদ্ভুত ঘোটকে চড়িয়া, রণজয়ী বীরের ন্যায় সেইখান দিয়া চলিয়াছিল। সহচরী দুইজন এই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া হাসিয়া আকুল হইল, এবং জীবনকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। জীবন সে বিদ্রূপে বিরক্ত হইল না; বরং তাহাদের সে হাসিতে মোহিত হইয়া কহিল,—"আহা কি সুন্দর হাসি! আমার বড় সাধ, তোমাদের এ হাসি যেন না ফুরিয়ে যায়।"

সেই হইতে সহচরীদ্বয়ের সেই হাসি আর ফুরাইল না। তাহারা অবিশ্রান্ত হাসিতে আরম্ভ করিল। বিষণ্ণবদনা রাজনন্দিনী ইহাতে বড়ই বিরক্ত হইলেন; কিন্তু তথাচ তাহাদের সে হাসি আর থামিল না।

এই সময় জীবন, রাজকন্যার উদ্দেশে মনে মনে কহিল, —"সুন্দরি! তুমি হাসির উপর বড়ই বিরক্ত দেখ ছি। আমার এই ইচ্ছা, যাকে দেখে তোমার ঐ বিষণ্ণ মুখে প্রথম হাসি ফুটবে তুমি তাকেই প্রাণের সহিত ভালবাসবে, আর তারই সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।"

এই কথা কয়েকটি বলিয়া, জীবন যেমন রাজকন্যাকে

প্রণাম করিতে গেল, অমনি কাঠের বোঝা এক দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, আর জীবন চীৎপাৎ হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। এখন, একজনকে হঠাৎ পড়িতে দেখিলে, অন্য জনে কেন হাসে জান? সে দার্শনিক মীমাংসার আবশ্যক নাই। আসল ঘটনার কথা বলি—শোন। জীবনের পতনে রাজকন্যা হাসিয়া ফেলিল। জীবন অপ্রস্তুত হইয়া একদিকে দৌড় দিল, আর রাজকন্যা অনিমেষ নয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিল!

(৫)

তার পর একটা বিভ্রাট পড়িয়া গেল। এদিকে জীবন কাঠুরিয়ার জন্য রাজকন্যার ছট্‌ফটানি, অন্য দিকে সেই সহচরীদ্বয়ের হাসির কল্‌কলানি! রাজকন্যার এখন বিরহের পালা; সে বিরহের উপর সখীদ্বয়ের সে হাসি—কি সহ্য হয় গা? হাঁ গা, তোমাদের মধ্যে যদি কেহ বিরহিণী থাক, তবে বল দেখি গা।

রাজকন্যা তখন সখীদ্বয়কে দূর করিয়া দিয়া রাণীকে সংবাদ দিল। রাণী আসিলে রাজকন্যা সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। কন্যা বিবাহ করিতে সম্মত শুনিয়াই, রাণী আহ্লাদে আটখানা! তৎক্ষণাৎ রাজার নিকট সংবাদ গেল। রাজা আসিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"হাঁ ঐলবিলা, কোন্ সৌভাগ্যবান্ রাজপুত্রকে দেখে, তুমি তার রূপে মুগ্ধ হয়েছ মা? সে কি কাশ্মীরের রাজপুত্র?"

রাজকন্যা উত্তর করিল—"না বাবা।"

রাজা পুনরায় হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"তবে বুঝি

জয়পুরের রাজপুত্র ? তা মা. তা মন্দ হবে না। তুমি জয়পুরের রাজমহিষী হবে।”

রাজকন্যা উত্তর করিল,—“না বাবা তা নয়।”

তখন রাজা একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন,—“তবে নিশ্চয়ই যোধপুরের সেই রাজকুমার। তা আমার কাছে লজ্জা কি মা,—যোধপুরের রাজপুত্র কি ?”

রাজকন্যা এবারও ঘাড় নাড়িয়া কহিল,—“না বাবা, তাও নয়।”

রাজা এবার একটু বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—“তবে কে ? তোমার উপযুক্ত রাজকুমার আমি ত আর দেখ্‌তে পাই না। কোথায় সে রাজপুত্রকে দেখেছ মা ?”

রাজকন্যা।—এই রাস্তা দিয়ে যেতে দেখেছি।

রাজা।—রাস্তা দিয়ে যেতে দেখেছ ? তবে কি সে রাজপুত্র নয় ?

রাজকন্যা এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—“তা জানি না বাবা, কিন্তু তেমন সুন্দর রূপ রাজপুত্রেরও অসম্ভব। বোধ হয়—কোন ছদ্মবেশী দেবতা, না হয়—কোন ছদ্মবেশী রাজপুত্র। আমি তাঁকে কাঠুরিয়ার বেশে দেখেছি।”

রাজা।—কি ছদ্মবেশ! তায় আবার কাঠুরিয়ার বেশ! আচ্ছা, পদব্রজে না অশ্বারোহণে ছিল ?

রাজকন্যা।—পদব্রজে নয়, অশ্বারোহণেই বটে; কিন্তু সে অশ্ব সাধারণ অশ্ব নয়—একটা কাঠের বোঝার ঘোড়া।

কন্যার কথা শুনিয়াই ত রাজা গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন! রাজকন্যা পিতার চরণে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে

কাঁদিতে কহিল,—"বাবা তিনি যিনিই হ'ন, আমায় তাঁকে এনে দাও; তিনি ভিন্ন আমি আর কাকেও বিয়ে করবো না।"

কন্যার কান্না দেখিয়া, রাণীও রাজাকে জেদ করিয়া ধরিলেন। রাজা তখন বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"রাণী, তোমার কি কোন বুদ্ধি নাই? যখন কাঠের বোঝার ঘোড়া করে এখান দিয়ে চলে গেছে, তখন কি বুঝ্‌তে পারছো না—সে একজন পাকা যাদুকর! সে যে নিশ্চয় রাজকন্যাকে যাদু করে গেছে!"

এতক্ষণের পর রাণীর চৈতন্য হইল। তখন কহিলেন,—"তবে এখন উপায়?"

রাজা।—সে যেখানে থাকুক, তাকে আন্‌তে হবে। আর কেউ দেখেছে?

রাণী।—ঐলবিলার সহচরী দু'জনে দেখেছে।

রাজা।—ডাক তাদের।

রাণী দৌড়িয়া গিয়া তাহাদের ডাকিয়া আনিল। কিন্তু আনিলে কি হইবে? সেই যে তাহাদের হাসির ফোয়ারা ছুটিয়াছে, সে ফোয়ারা তো এখনও বন্ধ হয় নাই! সুতরাং তাহারা রাজার প্রশ্নের উত্তর দিবে কি—একেবারে হাসিয়াই লুটোপুটি! রাজা যত বলেন "থাম—থাম", তাহারা ততই থমকে থমকে হাসে! রাজা যখন ক্রোধে—থর্ থর্ থর্; তখনও তাহাদের হাসির ফোয়ারা—ফর্ ফর্ ফর্! কাজেই রাজা ক্রোধে অধীর হইয়া, তখন রাজদরবারের দিকে দৌড় দিলেন। আর রাণী ত এদিকে নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ ও অবাক্!

(৬)

রাজা দরবারে আসিয়াই মন্ত্রীকে ডাকিতে হুকুম দিলেন। মন্ত্রী আসিয়া পৌঁছিলে, রাজকন্যা-সম্বন্ধে সংক্ষেপে সমস্ত কথা বলিয়া শেষে কহিলেন,—'যদি এক ঘণ্টার মধ্যে সেই যাদুকরকে ধরে এনে দিতে না পার, তবে তোমার গর্দ্দান যাবে।'' মন্ত্রী—"যে আজ্ঞা" বলিয়া দ্রুতপদে দরবার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন; বাহিরে আসিয়াই, সহর-কোতোয়ালকে সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনার বিষয় বলিয়া হুকুম জারি করিলেন,—"যদি আধ ঘণ্টার মধ্যে সেই যাদুকরকে হাজির করতে না পার, তবে তোমার গর্দ্দান ত যাবেই—তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্ত্রী-পুত্র কন্যা সকলেরই গর্দ্দান যাবে।"

সহর কোতোয়াল দলবল সহ তৎক্ষণাৎ সেই কাষ্ঠের বোঝা ঘোটকরূপে আরোহী যাদুকরের অনুসন্ধানে বহির্গত হইল। প্রাণের ভয়, বড় ভয়; কারণ 'প্রাণ একটি বই দুটি নয়।' মন্ত্রী মহাশয় কোতোয়ালের উপর ভার দিয়া নিজে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। সুতরাং তিনিও সেই দলের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অল্প অনুসন্ধানেই তাহারা জানিতে পারিলেন যে, সেই যাদুকর অন্য কেহ নহে—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই পরিচিত—সেই জীবনে বোকা! সুতরাং সেই জীবনে বোকার আড্ডা বাহির করিতে তাঁহাদিগকে আর অধিক কষ্ট করিতে হইল না। যখন মন্ত্রী মহাশয় সদল বলে সহর-কোতোয়ালকে সঙ্গে করিয়া জীবনচন্দ্রের কুঠিরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন জীবন আহারান্তে কেবলমাত্র কুঠিরের আগোড়

বন্ধ করিতে যাইতেছিল। মন্ত্রী মহাশয়ের ইঙ্গিতে কোতোয়ালের লোকেরা গিয়া জীব্‌নেকে ধরিল, এবং দ্রুতগতিতে তাহাকে রাজবাড়ীর দিকে লইয়া চলিল। জীবন এই সময় কোন রকম অস্থিরভাব প্রকাশ না করিয়া ধীরভাবে প্রশ্ন করিল,—"আমায় তোম্‌রা কোথায় নিয়ে চলেছ, ভাই ?"

মন্ত্রী মহাশয় উত্তর করিলেন,—"রাজার নিকট।"

জীবন পুনর্বায় প্রশ্ন করিল, "কেন নিয়ে যাও ?"

এবার মন্ত্রী বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন,—"রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন বলে।"

জীবন সে বিদ্রূপ বুঝিতে পারিল না। না বুঝিয়া কহিল,—"তবে আমায় এমন করে ধরে নিয়ে চলেছ কেন? খুব বাজনা বাদ্যি হ'ক, আর তোমরা সকলে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চল।"

জীবনের ইচ্ছা প্রকাশ হইবা মাত্র, কোথা হইতে দলে দলে বাজন্দার আসিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল; আর মন্ত্রী ও কোতোয়াল প্রভৃতি জীবনকে ছাড়িয়া দিয়া সেই বাজনার তালে তালে নাচিতে নাচিতে চলিলেন। যখন এইরূপ বাজ্‌না ও নৃত্যের সঙ্গে জীবন রাজবাড়ীতে আসিয়া পৌছিল, তখন রাজা ক্রোধে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন! কিন্তু রাজকন্যার আনন্দের সীমা রহিল না। ছদ্মবেশী রাজকুমার যে তাহাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন, এই বিশ্বাসই তাহার মনে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া গেল। এইরূপে যখন তাহারা রাজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন রাজাকে দেখিয়াও মন্ত্রী ও কতোয়াল প্রভৃতির কোন লজ্জাসরম পর্য্যন্ত ছিল না,

তাহারা সকলে বাজ্‌নার তালে তালে নৃত্য করিতেই উন্মত্ত! রাজা প্রথমে কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন! তার পর যত বলেন,—"ওরে থাম্—থাম্—থাম্", তাহারা ততই নাচে —ধেই—ধেই—ধেই!

রাজা-রাজ্‌ড়ারা নৃত্য ভালবাসেন বটে, কিন্তু সে কি ঐ পুরুষমানুষের ধেই ধেই নাচ? সে নাচের সঙ্গে রূপযৌবন ভাবভঙ্গী, ঠাঠ ঠমক, আর নয়ন-বাণ দস্তুরমত থাকিবে, তবে ত সে নাচ রাজা-রাজড়ার ভাল লাগিবে। সুতরাং রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন,—"এই যাদুকরকে, আর তার সঙ্গে পাগল মন্ত্রী ব্যাটাকে, আমার রাজ্যের বহির্ভূত করে এখনি বনবাসে দিয়ে আয়।"

এই রাজাজ্ঞা প্রচার হইবা মাত্র, রাজকন্যা ঐলবিলা দৌড়িয়া আসিয়া জীবনচন্দ্রের গলায় মালা ফেলিয়া দিল, এবং রাজার চরণে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"বাবা, আমি মনোমত পাত্রে স্বয়ম্বর হয়েছি, আমাকেও ঐ সঙ্গে তবে বনবাসের আজ্ঞা হ'ক।"

রাজা তখন ক্রোধান্ধ হইয়া কহিলেন,—"তবে তুইও ঐ সঙ্গে বনবাসে যা।"

রাজা এই হুকুম দিয়া অন্দরে চলিয়া গেলেন। তখন জীবনের ইচ্ছাক্রমে মন্ত্রীর নাচ বন্ধ হইল বটে, কিন্তু রাজার হুকুম আর রদ হইল না। সুতরাং তৎক্ষণাৎ রাজকন্যা ও মন্ত্রী সহ, জীবনচন্দ্রকে অবন্তীধামের বহির্ভাগে এক জনমানবশূন্য বনে রাখিয়া আসা হইল।

জীবন এখনও বুঝিতে পারে নাই যে, সে যাহা ইচ্ছা

করে, তাহাই করিতে পারে। সে কথা বুঝিতে পারিলে কি আর বনবাসে যায়? কিন্তু বুদ্ধিমান্ মন্ত্রীর মনে এই সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। এরূপ কোন ক্ষমতা না থাকিলে, জীবনকে যখন তাঁহারা ধরিয়া লইয়া আসেন, তখন কোথা হইতে তাঁহাদের সঙ্গে সেই সকল বাদ্যকর আসিয়া জুটিবে কিরূপে? আর প্রকাশ্য রাস্তায় তাঁহারাই বা নাচিতে নাচিতে আসিবেন কেন?

(৭)

পরদিন প্রাতঃকালে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইয়া যখন তাঁহারা সকলেই ক্ষুৎপিপাসায় বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন, তখন মন্ত্রী জীবনের ক্ষমতা পরীক্ষা করিবার উপযুক্ত অবসর স্থির করিলেন। বেলা দুই প্রহরের সময় মন্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—"জীবন, তোমার ক্ষুধা পায় নাই?"

জীবন উত্তর করিল,—"ক্ষুধা বিলক্ষণ পেয়েছে। কিন্তু কি খাবো—কিছুই ত দেখ্তে পাই না।"

মন্ত্রী।—জীবন, তোমার এখন কি খেতে ইচ্ছা করে বল দেখি?

জীবন।—আমি এ সময় দুটি গরম গরম ভাত ও ডাল পেলে বেঁচে যাই।

জীবনের মুখ হইতে এই কথা বাহির হইবামাত্র, কোথা হইতে তাঁহাদের সম্মুখে প্রচুর পরিমাণে গরম গরম ভাত ও ডাউল আসিয়া উপস্থিত হইল! তখন জীবনের আশ্চর্য্য ক্ষমতা-সম্বন্ধে মন্ত্রীর আর কোন সন্দেহ রহিল না মন্ত্রী, জীবনকে পিশাচ-সিদ্ধ মনে করিলেন। কিন্তু ক্ষুধায় অস্থির

হইলেও, কেবল এই ডাউল ও ভাত রাজকন্যাকে কিরূপে আহার করিতে দিবেন, এবং আপনি বা কিরূপে খাইবেন। সেই কারণ মন্ত্রী তখন জীবনকে বলিলেন,—"জীবন, তুমি ডা'ল ভাত অনায়াসে খেতে পার্‌বে, কিন্তু রাজকন্যা কিরূপে খাবেন? রাজকন্যাকে রাজভোজ্য নানাবিধ ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন, ফল আর দধি, দুগ্ধ ইত্যাদি খাওয়াতে ইচ্ছা করে না কি?"

জীবন ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"করে বৈ কি।"

তৎক্ষণাৎ নানাবিধ রাজভোজ্য ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি কোথা হইতে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল! মন্ত্রী তখন রাজকন্যা ও জীবনের অংশ ভাগ করিয়া দিয়া, নিজে পরিতোষের সহিত আহার করিলেন; এবং মনে মনে নিজের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরিতোষের সহিত আহারের পর মন্ত্রীর বুলি খুলিল, মন্ত্রী জীবনকে কহিলেন,—"জীবন, আহার ত হ'ল; কিন্তু এরূপ বনের মধ্যে থাক্‌লে আমরাই আবার বাঘের আহার হয়ে যাবো। বিশেষতঃ রাজকন্যা থাক্‌বেন কোথায়? রাজকন্যাকে উপযুক্ত রাজ-অট্টালিকায় রাখ্‌তে তোমার ইচ্ছা হয় না কি?"

জীবন হাসিয়া বলিল,—"ইচ্ছা হয় বৈ কি।"

তৎক্ষণাৎ সেই বনের মধ্যে এক রাজ-অট্টালিকা বিরাজ করিতে লাগিল। মন্ত্রী, জীবনচন্দ্র ও রাজকন্যাকে লইয়া সেই রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর মন্ত্রী, এই রূপ কৌশলে জীবনচন্দ্রের দ্বারা রাজার উপযুক্ত এলবাস-পোষাক, লোকজন, চাকর নফর সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া

লইলেন। জীবনচন্দ্রের সে কাঠুরিয়া চেহারাও আর রহিল না। মন্ত্রীর কৌশলে, জীবনচন্দ্র, নবীন নধর সুঠাম সুপুরুষ হইয়া পড়িল! তখন জীবনচন্দ্র হইল—সেই রাজ্যের রাজা, মন্ত্রী লইল—মন্ত্রী; আর রাজকন্যা হইল—রাণী। কিন্তু মন্ত্রীরই —পোহাবারো!

(৮)

অদৃষ্টে সুখ না থাকিলে, জীবন কিরূপে তাহা উপভোগ করিবে? জীবনের এখন হাতীশালায় হাতী, ঘোড়াশালায় ঘোড়া, রাজ-অট্টালিকা, সৈন্য-সামন্ত, লোকজন সকলই হইয়াছে, কিন্তু তাহার অদৃষ্টে সুখভোগ নাই, সুতরাং সে সুখভোগে সম্পূর্ণ বঞ্চিত রহিল। মন্ত্রী দেখিলেন—রাজার যাহা কিছু আবশ্যক, সকলই হইয়াছে বটে, কিন্তু রাজ্য কৈ? এই বিশাল জঙ্গলকে একটি বিস্তীর্ণ রাজ্যে পরিণত করিতে পারিলেই, মন্ত্রীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। কিন্তু এইবার তাহার সকল কৌশল বৃথা হইল। মন্ত্রীর ইচ্ছামত মুহূর্ত্তের মধ্যে জঙ্গল রাজ্যে পরিণত হইল না। মন্ত্রী, এই জঙ্গল পরিস্কার করিবার ইচ্ছা যখন জীবনচন্দ্রের মনে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, তখন জীবনচন্দ্র স্বয়ংই কুঠারহস্তে বহির্গত হইয়া স্বহস্তে গাছ কাটিতে নিযুক্ত হইল। জীবন কাঠুরিয়া এখন রাজা হইলেও, গাছ-কাটার লোভ সংবরণ করিতে পারিবে কেন? একবার ইচ্ছা করিলে যে কার্য্য মুহূর্ত্তের মধ্যে সম্পন্ন হইয়া যায়, জীবনের সে ইচ্ছা আর কোন ক্রমেই হইল না! জীবন প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া গাছ কাটিতে যায়, আর সন্ধ্যার সময় আপনার অট্টালিকায় ফিরিয়া আইসে।

রাণীর প্রাণে তাহা সহ্য হইবে কেন? রাণী ত ইহার জন্য কাঁদিয়া কাটিয়া খুন! কিন্তু গাছ কাটিতে যাওয়ার দরুণ রাণীর এই কান্না দেখিয়া, জীবনচন্দ্রের মনে বড়ই আহ্লাদ! জীবনের তখন মনে মনে ইচ্ছা হইল—রাণীর এ কান্না যেন না ফুরায়! সুতরাং মন্ত্রীর নানা প্রবোধবাক্যেও রাণীর সে কান্না আর ফুরাইল না। জীবনের রাজাগিরির প্রথম কেচ্ছা হইল—সমস্ত দিন জঙ্গলের কাঠ-কাটা, আর তাহা দেখিয়া রাণীর দিবারাত্রি কান্না!

তা কেবল জীবনে বোকা বলে নয়, অনেক রাজার রাণীকেই এইরূপ দিবারাত্রি কাঁদিয়া জীবন কাটাইতে হয়; আর অনেক রাজা মহাশয়ও—কাজের মধ্যে সমস্ত দিন হয় জঙ্গলের কাঠ কাটেন, না হয়—বনের মহিষ তাড়াইয়া থাকেন। তবে জীবনচন্দ্রের পক্ষে শুভগ্রহ এই যে, তাহার কুঠারে জলের মত গাছ কাটা যায়। সুতরাং ১০।১৫ দিনের মধ্যেই জঙ্গল পরিষ্কার হইয়া গেল।

(৯)

তখন মন্ত্রী, পূর্ব্বোক্ত কৌশলে জীবনচন্দ্রের দ্বারা এক বিশাল রাজ্য স্থাপন করিয়া লইলেন। রাজধানীর নাম হইল—জীবননগর। তখন মন্ত্রীরই পোহা-বার-তের! জীবনচন্দ্র আর রাজ্যশাসন কি করিবে? দুই বেলা দুই মুঠা খাইতে পাইলেই, তাহার রাজাসুখের চূড়ান্ত হয়। সুতরাং মন্ত্রীই সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইলেন। জীবনচন্দ্রের রাজ্যমধ্যে মন্ত্রীর আজ্ঞা অবহেলা করিবার কাহারও সাধ্য ছিল না। স্বয়ং সর্ব্বশক্তিমান রাজা জীবনচন্দ্র পর্য্যন্ত মন্ত্রীর ভয়ে কম্পমান।

ফলতঃ জীবনচন্দ্রের রাজাগিরির দ্বিতীয় কেচ্ছা হইল—মন্ত্রীর সম্পূর্ণ অধীন হইয়া থাকা !

তা কেবল জীবনে বোকা বলে নয়, আজ-কাল পৃথিবীর অনেক রাজাকেই জীবনচন্দ্রের ন্যায় মন্ত্রীর সম্পূর্ণ অধীন হইয়া রাজ্যশাসন করিতে হয়। জীবনচন্দ্র মন্ত্রীর হস্তে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায়—নাম মাত্র 'রাজা', আর মন্ত্রীই সর্ব্বে-সর্ব্বা !

(১০)

একদিন জীবনচন্দ্র সভাসদ্গণ পরিবৃত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় অদূরে একটা বাঁদরকে লাফালাফি করিতে দেখিতে পাইল। বাঁদরের লম্ফঝম্ফ দেখিয়া, জীবন চন্দ্রেরও বাঁদররূপ ধারণ করিয়া সেইরূপ লম্ফঝম্ফ করিতে সাধ গেল। সে সাধ হইবামাত্র, জীবনচন্দ্র তৎক্ষণাৎ বাঁদর হইয়া সেই সিংহাসন হইতে এক লম্ফ প্রদান করিল ! এই আকস্মিক ঘটনায় সে দিনকার রাজকার্য্য তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া গেল। আর রাজা বাঁদররূপে গাছে গাছে লাফালাফি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে লাফাইতে লাফাইতে জীবনচন্দ্র রাণীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। রাণীর এখন চক্ষের জলই সম্বল হইয়াছে। কাজের মধ্যে দিবারাত্রি তাঁহাকে কেবল কাঁদিতে হয়। বাঁদররূপী রাজাকে দেখিয়া, তাঁহার সে কান্নার মাত্রা বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু এবার রাণীর সে কান্না জীবনচন্দ্রের ভাল লাগিল না ; জীবনচন্দ্রের বরং ইচ্ছা হইল—রাণী কেবল হাসিতে থাকুক। সুতরাং রাণীর সে কান্নার প্রস্রবণ তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া গেল, এবং তাহার পরিবর্ত্তে হাসির ফোয়ারা ছুটিল।

মন্ত্রী অনেক চেষ্টা করিয়াও সে হাসি আর থামাইতে পারিলেন না। জীবনচন্দ্রের রাজাগিরির তৃতীয় কেচ্ছা হইল—বাঁদরামী করা, আর সেই বাঁদরামী দেখিয়া রাণীর অবিরাম হাসি!

তা কেবল জীবনে বোকা বলে নয়, পৃথিবীর অধিকাংশ রাজারাই জীবনচন্দ্রের ন্যায় বাঁদরামী করিয়া বেড়ান, আর তাহাদের রাণীরা সেই বাঁদরামী দেখিয়া হাসেন! এদিকে এইরূপ বাঁদরামীতেই জীবনচন্দ্রের আনন্দের সীমা ছিল না। অন্যের গাছে উঠিতে কত কষ্ট হয়, কিন্তু জীবনচন্দ্রের কেমন অদ্ভুত ক্ষমতা দেখ! অবলীলাক্রমে এ-গাছ ও-গাছ লাফালাফি করিয়া বেড়াইতেছে!

(১১)

এইরূপে কিছুদিন যায়। শেষে মন্ত্রী একদিন অনেক কৌশল করিয়া বাঁদররূপী রাজাকে পুনরায় মানুষরূপে পরিবর্ত্তিত করিলেন। তখন জীবনচন্দ্রের ইচ্ছায়, রাণীর সে অবিরাম হাসিও থামিয়া গেল। আবার রাজসভা বসিতে আরম্ভ হইল, আবার জীবনচন্দ্র সিংহাসনে বসিয়া সেই রাজসভা উজ্জ্বল করিতে লাগিলেন। জীবনচন্দ্রের রাজকার্য্যের মধ্যে মাত্র একবার বাহার দিয়া সিংহাসনে আসিয়া বসা! জীবনচন্দ্র এত কাণ্ড করিতেছে, তথাপি এখনও বুঝিতে পারে নাই যে, সে যাহা মনে করে, তাহাই করিতে পারে!

জীবনচন্দ্র সে কথা না বুঝিতে পারুক, কিন্তু মন্ত্রী তাহা ভালরূপেই বুঝিয়াছিলেন। সেই কারণ, অল্পদিনের মধ্যেই সেই বিশাল রাজ্য মহাপ্রতাপান্বিত করিয়া তুলিলেন। এমন

কি অবন্তীধামের সিংহাসন পর্য্যন্ত টলিল। অচিরে অবন্তী-ধামে সংবাদ পৌছিল যে, তাঁহার রাজ্যপ্রান্তস্থিত জঙ্গলে অল্পদিনের মধ্যেই এক বিশাল রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। এই সংবাদে অবন্তীনাথ মনে মনে বড়ই ভীত হইলেন, এবং নিগূঢ় সংবাদ লইবার জন্য গোপনে একজন গুপ্তচর পাঠাইলেন। কিন্তু গুপ্তচরের মুখে যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার ভয়ের কারণ হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইল। আবার রাজ্যের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া, এই নূতন রাজার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্যও তিনি ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। প্রথমেই অযাচিতভাবে রাজোচিত উপঢৌকন পাঠাইয়া, এই বন্ধুত্বের সূত্রপাত করিলেন। মন্ত্রী মনে মনে সমস্তই বুঝিতে পারিলেন, এবং অবন্তীধামের রাজাকে বিশেষ সম্মানের সহিত নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তখন অবন্তীনাথের আর বিলম্ব সহ্য হইল না। পরদিনেই জীবন-নগরে আসিবার দিন স্থির করিয়া পাঠাইলেন। সুতরাং নগর-ময় একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

মন্ত্রী, মহাসমারোহের সহিত অবন্তীনাথের বিশেষরূপ অভ্যর্থনা করিবার মনস্থ করিলেন। তাঁহার রাজাও যাহা মনে করেন, তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতে পারেন। তবে আর ইহার জন্যে মন্ত্রী এতদূর চিন্তিত কেন? মন্ত্রীর চিন্তার কারণ—রাজা বড় বোকা—অথচ রাজার ইচ্ছা না হইলে ত আর এত শীঘ্র কিছুই হইতে পারে না। মন্ত্রী তখন প্রাণপণে কেবল এই ইচ্ছা রাজার মনে উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টার পর, পরদিন বৈকালে কৃতকার্য্যও হইলেন। তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে নগর

নানা শোভায় সুশোভিত হইল। চারিদিকে ধ্বজা-পতাকা উড্ডীয়মান—নগর নানাবর্ণের পুষ্পমালায় সুসজ্জিত। সন্ধ্যার সময় সর্ব্বত্র এরূপ সুন্দর আলোক শ্রেণীতে সুশোভিত হইল যে, জীবননগর যেন মর্ত্তে অমরাবতী!

(১২)

রাণী ঐলবিলার আজ আর আনন্দের সীমা নাই। রাজা ও মন্ত্রীর সহিত, পিতাকে নিজগৃহে 'অভ্যর্থনা' করিবার জন্য, নানারূপ বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হইলেন। পিতা, অযোগ্যপাত্রে আত্মসমর্পণ করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে বনবাস দিয়াছেন—সেই বনবাসিনী কন্যা এখন পিতাকে আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্যে উন্মত্ত। সুতরাং ঐলবিলার যাহা কিছু উৎকৃষ্ট অলঙ্কারাদি ছিল, এই উপলক্ষে সমস্তই পরিধান করিয়াছিলেন। রাজা জীবনচন্দ্র কিন্তু সেরূপ কোন বেশভূষা করিল না। মন্ত্রী অনেক অনুনয়ও করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। বৃদ্ধ মন্ত্রী এই উপলক্ষে নিজের বেশভূষার কোন ত্রুটি করিলেন না। নির্দ্ধারিত সময়ে তাঁহারা তিন জনে রাজবাড়ীর গেটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাস্তায় আজ অসংখ্য লোক—নানারূপ যানে নগরের শোভা দেখিতে বহির্গত হইয়াছে। এই উপলক্ষে নগরের এক রজক বড় এক কৌতুক করিয়াছিল। সে অন্য কোন যানাদির বন্দোবস্ত করিতে না পারিয়া, গৃহপালিত গর্দ্দভের উপর আপনার পত্নীকে উঠাইয়া নগরশোভা দেখিতে বহির্গত হয়। রজকপত্নী বড়ই স্থূলকায়, সুতরাং ক্ষুদ্র গর্দ্দভ সে ভার বহনে অক্ষম হইয়া মধ্যে মধ্যে বিকট চীৎকার

আরম্ভ করিতেছিল, আর দর্শকগণ তাহাতেই বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। এই গর্দ্দভারূঢ়া রজকপত্নী যখন রাজবাটীর গেটের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সে দৃশ্য দেখিয়া জীবনের মনেও হঠাৎ কোথা হইতে একটা প্রবল ইচ্ছা আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা-রাজ্‌ড়া'র মেজাজ ত বুঝিবার যো নাই! কখন্ কোন্ ইচ্ছা হয়, কে বলিতে পারে? রাজার মনে এই সময় কি' ইচ্ছা হইল জান? রাজার ইচ্ছা হইল—তিনি নিজেই গাধা হইয়া রাণীকে এইরূপ পিঠের উপর তুলিয়া লইবেন! ইচ্ছা হইলে ত আর রক্ষা নাই! মুহূর্ত্তের মধ্যে যেই ইচ্ছা—সেই কার্য্য! সুতরাং দেখিতে দেখিতে জীবন গর্দ্দভ-মূর্ত্তি ধরিল, আর রাণী সেই গর্দ্দভের উপর চড়িয়া বসিলেন। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য!

তা তোমরা অত হাসিও না। জীবনে বোকা বলে নয়—রাজা বলেও নয়—আজকাল অনেক স্বামী, নিজে গাধা হইয়া স্ত্রীকে আপনার পিঠের উপর এইরূপেই বসাইয়া থাকে।

(১৩)

এদিকে অবন্তীনাথ বহুসংখ্যক সৈন্য সামন্ত ও সভাসদবর্গ-সমভিব্যাহারে যথা সময়ে জীবন-নগরে আসিয়া পৌঁছিলেন। নগরের শোভা দেখিয়া মনে মনে তাঁহার বড়ই হিংসা হইতে লাগিল। আর এ নূতন রাজা যে তাঁহার অপেক্ষা অনেক বড়, নগরের এই শোভা দেখিয়াই সে কথাও তাঁহার মনে ধারণা হইয়া গেল। তখন এই নূতন রাজাকে কিরূপে উপযুক্ত সম্মান করিবেন, মনে মনে সেই চিন্তাই করিতে লাগি-

লেন। দেখিতে দেখিতে অবন্তীনাথ সদলে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই রাজা নিজে গর্দ্দভ হইয়া রাণীকে পৃষ্ঠে করিয়া গেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। অবন্তীনাথকে সমাগত দেখিয়া মন্ত্রী তাড়াতাড়ি তাঁহাকে মহা সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। মন্ত্রীকে দেখিয়াই ত অবন্তীনাথ অবাক্! তাহার পর যখন গর্দ্দভারূঢ়া নিজ কন্যাকে দেখিলেন, তখন আর তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ঐলবিলা পিতাকে দেখিয়া বিশেষ সমাদর ও আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু এরূপ সময়েও রাণী গাধা হইতে নামিতে পারিলেন না। অবন্তীনাথের সে সকলই স্বপ্ন বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। তখন মন্ত্রী নিবেদন করিলেন,—"মহারাজ, আপনি আপনার কন্যা-জামাতা আর মন্ত্রীকে বনবাস দিয়াছিলেন। এখন এই যে বিশাল রাজ্য দেখিতেছেন, এই রাজ্যের রাণী আপনার সেই বনবাসিনী কন্যা, রাজা—আপনার সেই জামাতা জীবনে বোকা, আর এই অধম দাস—এই রাজ্যের মন্ত্রী। সুতরাং এরাজ্য ও আপনার নিজের রাজ্য মনে করুন।"

অবন্তীনাথের বিস্ময় কতক পরিমাণে অপসৃত হইলে, তিনি কহিলেন,—"এই রাজ্যের রাজা আমার সে জামাতা কৈ ?"

তখন আমাদের জীবনচন্দ্র গর্দ্দভ-মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া, নিজ মূর্ত্তিতে অবন্তীনাথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া রাজা অত্যন্ত ভীত হইলেন। সম্মুখে স্বয়ং যম উপস্থিত হইলে, তিনি এতদূর ভীত হইতেন কি না

সন্দেহ। রাজা অবন্তীনাথ, ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ সদলে উর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিলেন। মন্ত্রী অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন; কন্যাও কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়িয়া গিয়া পিতার চরণে আছাড় খাইয়া পড়িলেন; আর রাজা জীবনচন্দ্র তখন ভ্যাবাগঙ্গারামের মতন কেবল স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজা মন্ত্রীর অনুনয় শুনিলেন না—কন্যার কান্নায় দৃক্‌পাত করিলেন না। যাইবার সময় কেবল বলিয়া গেলেন,—"হয় আমি এ সমস্ত স্বপ্ন দেখ্‌ছি, নয় এ সমস্ত সেই জীবনে যাদুকরের ভোজবাজী? কখনই সত্য নয়—কখনই সত্য নয়।"

তা কেবল জীবনে বোকা বলে নয়, এ পৃথিবীর রাজা, ঐশ্বর্য্য, ধন, সম্পত্তি প্রভৃতি সমস্তই যাদুকরের ভোজবাজীই বটে! এই আছে, এই নাই!

(১৪)

তখন বড়ই একটা হরিষে বিষাদ ঘটিল। মন্ত্রী, ইহার জন্যে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া রাজা জীবনচন্দ্রকে অনেক তীব্র ভর্ৎসনা করিলেন। আর রাণীও সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের জলের সহিত মৃদু ভর্ৎসনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন এই তীব্র ও মৃদু ভর্ৎসনার একত্র মিলনে বিশেষ ফলও ফলিল। এত দিন পরে জীবনচন্দ্র আপনাকে বোকা বলিয়া বুঝিতে পারিল, এবং আপন কার্য্যের জন্যে তাহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। জীবনচন্দ্র তখন বিষণ্নমনে এক নির্জ্জন গৃহে গিয়া বসিল।

জীবন কিছুক্ষণ অবনতমস্তকে চিন্তা করিয়া যেমন মস্তক

উত্তোলন করিল, অমনি সম্মুখে সেই পূর্ব্বদৃষ্ট ব্রাহ্মণবেশধারী বিধাতা-পুরুষকে দেখিতে পাইল। জীবন কি বলিতে যাইতে ছিল, কিন্তু জীবনের কথা কহিবার পূর্ব্বেই সেই ব্রাহ্মণবেশী বিধাতাপুরুষ বলিলেন,—"দেখ জীবন, আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ নই; কিছু ভিক্ষার্থী হইয়াও এখন তোমার নিকটে আসি নাই। আমি স্বয়ং বিধাতা-পুরুষ। আমার বরেই তোমার এই রাজ-পদ ও ঐশ্বর্য্য হইয়াছে। তুমি যখন যাহা ইচ্ছা করিবে, তৎ-ক্ষণাৎ তোমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবে—এই বর আমি তোমায় দিয়াছিলাম। তুমি নিজে তোমার ক্ষমতা বুঝিতে না পারিয়া সেই অতুল ক্ষমতার অনেক অপব্যবহার করিতেছ

জীবনচন্দ্র তখন করযোড়ে ও বাষ্পগদগদকণ্ঠে কহিল,—"প্রভু, আমি বড় বোকা—তাই এরূপ ঘটেছে।"

বিধাতাপুরুষ তখন ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"জীবন, তুমি ইহার জন্য ক্ষুণ্ণ হইও না। পৃথিবীর পোনের আনা উনিশগণ্ডা রাজাই তোমার মতন বোকা। তাহারা যখন যাহা মনে করে, তখন তাহাই করিতে পারে—এ ক্ষমতাও আমি তাহা-দের অনেককে দিয়াছি। তাহারা কিন্তু এ ক্ষমতার যেরূপ অপ-ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা দেখিয়া সময়ে সময়ে আমারও হৃদ-কম্প উপস্থিত হয়। তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাতে কেবল তোমার নিজের বোকামিরই পরিচয় দিয়াছ—এরূপ ক্ষমতা পাইয়াও অন্যের বিশেষ কোন অনিষ্ট কর নাই। এইজন্যে, আমি তোমার পুনরায় বর দিতেছি—সেই বরে তুমি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান্ হইবে।"

এই কথা বলিয়াই বিধাতাপুরুষ অন্তর্দ্ধান হইলেন। সেই দিন হইতে জীবনে বোকার যশ ও খ্যাতি পৃথিবীময় রাষ্ট্র হইল।

রাক্ষস গণ।

(১)

ছেলে বেলা থেকে মুখুর্য্যেদের চারুবালার সঙ্গে আমার খুব ভাব। চারুবালা আমাদের গ্রামের রমেশ কাকার মেয়ে। রমেশ কাকা আমার নিকট সুবাদে কাকা নহেন—গ্রাম সুবাদে কাকা। বাবার সঙ্গে তাঁর খুব মাথামাখি ভাব,—এক আফিসে কাজ করেন। আমি চারুর চেয়ে পাঁচ বৎসরের বড়। চারুর সঙ্গে আমার ছেলে বেলাতেই সম্বন্ধ হয়, চারুও ছেলে বেলা থেকে জানে—আমি তার বর। চারু মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিত, আর আমায় 'বর্—বর্' করিয়া খেপাইত। আমার দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি চারুকে খেলা-ঘর বাঁধিয়া দিতাম, এবং দুইজনে খেলা করিতাম। সেই খেলা-ঘরে, চারু আমার ক'নে আর আমি তাহার বর হইতাম। ঘর সংসারের সকল কাজই সেই খেলা-ঘরে হইত। চারু খেলা-ঘরের রান্নাবান্না করিত, এবং আমার আহার হইয়া গেলে সেই পাতে

সে প্রসাদ পাইত। আমি যেন আফিস হইতে টাকা আনিয়া তাহার হাতে দিতাম, সে আমায় সত্য সত্যই বাতাস করিত, খেলা-ঘরের জল-খাবার খাওয়াইত ও পান দিত! এইরূপে খেলা-ঘর পাতিয়া আমি দুই বৎসর কাল চারুকে লইয়া সংসারী হইয়াছিলাম। শেষে আমার যখন দশ বৎসর বয়স হইয়া গেল—যখন স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিলাম, তখন চারুকে লইয়া খেলা-ঘরে খেলিতে আমার কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। আমি সে খেলা বন্ধ করিয়া দিলাম। ইহাতে চারুর দুঃখের সীমা ছিল না, সে আমাদের বাড়ী আসিয়া আর সেরূপ খেলা খেলিতে না পাইয়া কাঁদিত, আর আমায় 'বর বর' করিয়া খেপাইত। চারুকে কাঁদিতে দেখিলে আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইত, মনে হইত—এখনই গিয়া দুটা ভাল কথা বলিয়া তার কান্না থামাই—চখের জল মুছাই; কিন্তু কেমন লজ্জা—লজ্জা করিত, গা-টাও কেমন ছম্ ছম্ করিত। আমার সঙ্গে খেলিতে না পাইয়া চারু কাঁদিত, আর তার কান্না দেখিয়া আমিও লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদিতাম। শেষে এই কান্নাই আমার জীবনের সম্বল হইবে বলিয়াই কি—এইরূপ হইত নাকি?

(২)

পরে চারুরও যখন বয়স হইল, তখন সেও আর আমাদের বাড়ী খেলিতে আসিত না, তখন কেবল কোন কাজকর্ম্ম উপলক্ষে সে আমাদের বাড়ী আসিত, আমিও তাদের বাড়ী যাইতাম। তখন আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইলে, হয় সে লজ্জায় চোখ দুটি বুজিত, না হয়, একটু ফিক্ করিয়া হাসিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া

যাইত! আমি তার সেই সলজ্জ ভাব আর ফিক্ করিয়া হাসিটুকু, এ জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। ষষ্ঠি বাঁটার সময়, পূজার সময়, আর পৌষমাসে রমেশ কাকা আমার তত্ত্ব করিতেন, আর আমার বাঁপও চারুকে তত্ত্ব পাঠাইতেন। রমেশ কাকা বাবাকে 'বেহাই' বলিয়া ডাকিতেন, বাবাও রমেশ কাকাকে 'বেহাই' বলিতেন। চারুর-মা আমার মাকে 'বেয়ান' বলিতেন; মাও চারুর মাকে 'বিয়ান' বলিয়া ডাকিতেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে আমি এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া জলপানি পাইলাম, তখন রমেশ কাকা চারুর সঙ্গে আমার বিবাহের দিনস্থির করিতে আসিলেন, কিন্তু বাবা তখন আমার বিবাহ দিতে রাজী হইলেন না, তিনি বলিলেন,—"বেহাই, এত তাড়াতাড়ি কেন? নরেন আর একটা পাশ করুক, তার পর বিয়ে দেবো—আর তোমার চারুর বয়স ত এখন সবে ন বৎসর বই ত নয়।"

কাজেই রমেশ কাকা থামিয়া গেলেন। এই ঘটনায় মার মনে বড় কষ্ট হইল, আর আমিও মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলাম।

(৩)

তার পর ষোল বৎসর বয়সে আমি এফ্ এ পাস করিলাম, এবারও জলপানি পাইলাম। তখন রমেশ কাকা একেবারে না-ছোড়বান্দা হইয়া বাবাকে ধরিয়া বসিলেন, বাবাও বিবাহ দিতে রাজী হইলেন। আমার আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। জ্যোতিষ শাস্ত্রে বাবার অগাধ বিশ্বাস; ভূতনাথ আচার্য্য নামক একজন গণক ও জ্যোতিষী—বাবার কাছে সর্ব্বদাই আসিতেন,

বাবা তাঁর কাছে নিজে জ্যোতিষ শিক্ষাও করিতেন। একদিন বাবা আমার আর চারুর কোষ্ঠী দুইখানি লইয়া তাঁহাকে দেখাইলেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া দুইখানি কোষ্ঠী দেখিয়া বলিলেন,—"কন্যাটির রাক্ষসগণ, আর তোমার পুত্রের নরগণ, সুতরাং এ কন্যার সঙ্গে তুমি তোমার ছেলের বিয়ে দিতে পার না, আর শুধু রাক্ষসগণ নয়, এ মেয়ের বৈধব্যযোগ আছে দেখ্‌ছি—এ মেয়ে নিশ্চয়ই বিধবা হবে।"

নিকটে বসিয়া আমি পড়িতেছিলাম, আমার মাথায় তখন যেন একটা বজ্রাঘাত হইল! বাবারও মুখে আর কথা নাই তিনিও সেই কথা শুনিয়া যেন অবাক্ হইয়া রহিলেন। গণনায় ভুল হইয়াছে কিনা—দেখিবার জন্য বাবা জ্যোতিষীকে পুনরায় গণিয়া দেখিতে বলিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। জ্যোতিষী চলিয়া গেলেন, বাবা কিন্তু বিষন্ন মনে বাড়ীর ভিতর গেলেন। মাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন, বলিতে বলিতে বাবা কাঁদিয়া ফেলিলেন, মাও কাঁদিলেন। আর আমি? আমার আর সেদিন কলেজ যাওয়া হইল না—অসুখ করিয়াছে বলিয়া আমি বিছানায় গিয়া শুইলাম।

(৪)

ক্রমে সে কথা প্রচার হইয়া পড়িল। রমেশ কাকাও শুনিলেন। তিনি রুদ্ধশ্বাসে আমাদের বাড়ী দৌড়িয়া আসিলেন। বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া কি কথা হইল, তাহা আমি জানি না, তবে আমাদের দুইখানি কোষ্ঠী লইয়া অন্যান্য জ্যোতিষীকে দেখাইতে দুই জনে বাহির হইলেন—এ কথা মার মুখে

শুনিলাম। বাবা যখন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, বাবার মুখ দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিলাম যে আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। বাস্তবিকই আমার কপাল ভাঙ্গিল, চারুর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। এদিকে চারু বড় হইয়াছে দেখিয়া রমেশ কাকা অন্যত্র তার সম্বন্ধ স্থির করিলেন! আমি সে বৎসর বি-এ ফেল হইলাম। ফেল হইয়া পড়া-শুনা বন্ধ করিলাম, কারণ আমার একটা মাথার অসুখ জন্মিল। ডাক্তারেরা পশ্চিমে হাওয়া পরিবর্ত্তনে যাইতে বলিলেন। বাবার তাতে মত হইল না, কিন্তু আমি তাঁহাকে জেদ করিয়া ধরিলাম, কারণ গ্রামে বাস করা আমার বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠিল। আমার এক মাতুল এলাহাবাদে কর্ম্ম করিতেন, চারুর বিবাহের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁর কাছে এলাহাবাদে গেলাম। সেই যে গেলাম—আর দেশে ফিরিলাম না।

(৫)

এলাহাবাদে আমার একটি ভাল চাকুরী হইল। বাবা আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া ছুটী লইয়া দেশে আসিতে ক্রমাগত পত্র লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি দেশে আর ফিরিলাম না—শেষে বাবাকে স্পষ্ট পত্র লিখিলাম যে, আমি আজীবন আইবুড়ো থাকিব—বিবাহ কখন করিব না। বাবা পত্রের দ্বারা আমায় অনেক বুঝাইলেন, মামা এলাহাবাদেই এক সম্বন্ধ স্থির করিয়া একেবারে না-ছোড়বান্দা হইলেন, কিন্তু আমি অটল ও অচল রহিলাম। আমি আমার বাবার এক মাত্র ছেলে।

চারুর সংবাদ আমি মধ্যে মধ্যে পাইতাম। তার বিবাহ

হইয়া গিয়াছে, বৎসরান্তে সে শ্বশুর বাড়ী গিয়াছে। সুখী হইয়াছে কিনা—সে সংবাদ জানিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে কথা জানিবার আমার কোন সুযোগ হয় নাই। চারুর বিবাহের দুই বৎসর পরে একদিন সংবাদ পাইলাম—চারু বিধবা হইয়াছে। সে সংবাদ শুনিয়া আমি কাঁদিলাম—সেদিন আর আমার আফিস যাওয়া হইল না।

আরও দুই বৎসর পরে একদিন বারুণীর যোগে আমি প্রয়াগের বেণীঘাটে স্নান করিতে গিয়াছি, সে দিন বেণীঘাট একবারে লোকে লোকারণ্য। স্নান করিয়া বালির চড় ভাঙ্গিয়া আসিতে আসিতে দেখি—একটি পূর্ণ যৌবনা মস্তকমুণ্ডিতা সুন্দরী বিধবা স্ত্রীলোক সঙ্গী হারাইয়া আকুল প্রাণে ছুটিয়া বেড়াইতেছে; আমার প্রাণটা যেন ছ্যাঁক্ করিয়া উঠিল। আমি তাড়াতাড়ি সেই স্ত্রীলোকের সাহায্যের জন্যে তার কাছে গেলাম। কিন্তু তার কাছে গিয়া দেখি—সে আমাদের গ্রামের সেই চারু—আমার রমেশ কাকার মেয়ে! আমি চারুকে চিনিতে পারিলাম, চারুও আমাকে চিনিল। এখন তার সেই থান-কাপড় আর নেড়া-মাথা দেখিয়া আমার প্রাণ কাঁদিল। আর ছেলেবেলার খেলাঘরের কথাটাও আমার মনে জাগিয়া উঠিল। চারু কিন্তু একটিও কথা কহিল না, তার মনের ভাব আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি তাদের বাসার ঠিকানা জানিয়া লইলাম। আর একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া চারুকে সেই বাসায় লইয়া যাইতে চাহিলাম। চারু আমার সঙ্গে গাড়ীতে যাইতে প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, কিন্তু তখন আর অন্য উপায় নাই—কাজেই রাজী হইল। অনেকক্ষণ গাড়ীর মধ্যে আমরা

নীরবে চলিলাম, আমাদের মধ্যে কেহ কোন কথা কহিল না। শেষে আমি আর থাকিতে পারিলাম না, একটা কথা কহিয়া ফেলিলাম—"চারু, তুমি আমায় ভুলে গেছ না মনে আছে?"

চারু উত্তর করিল—"ভুলে গেছি।"

চারি বৎসর পর আমার চারুর সঙ্গে এই প্রথম দেখা—আর তার মুখে এই কথা! আমি কহিলাম—"তুমি বড় নিষ্ঠুর—আমায় কি করে ভুলে গেলে?"

চারু অনেক ক্ষণ সে কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না, শেষে যেন অনেক কষ্টের সহিত ধীরে ধীরে কহিল—"আমি বিধবা, আর তুমি আমার পর-পুরুষ; তোমার কথা ভুলে যাওয়াই আমার পক্ষে ভাল।"

অনেকক্ষণের পর আমি পুনরায় কহিলাম—"আচ্ছা, তুমি ত আমার রমেশ কাকার মেয়ে, সে সুবাদেও কি তুমি আমায় মনে রাখ্‌তে পার না—আমায় একটুও ভালবাস্‌তে পার না?"

চারু এবারও ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"না।"

সেই ক্ষুদ্র 'না' কথাটি আমার প্রাণে একটা ভয়ঙ্কর আঘাত করিল—আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম! এই সময় হঠাৎ আমার মুখ হইতে বাহির হইল—"কেন?"

চারু উত্তর করিল—"আমায় ভালবাস্‌তে নাই, আমার যে রাক্ষসগণ!"

তখন গাড়ী তাদের বাসার নিকট পৌঁছিয়াছিল, আমি তাড়াতাড়ি তাহাকে সেই বাসা দেখাইয়া দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিলাম!

—○—

দুই সই।

(১)

বিমলা ও কমলা দুই সই। উভয়েই সমবয়স্কা বালিকা। বিমলা, মথুরানাথ ঘোষের কন্যা। মথুরানাথ—বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ উপাধিধারী সুশিক্ষিত যুবক—এখন রামনগরের ইংরাজী-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত। কমলার পিতার নাম—শিবনারায়ণ ভট্টাচার্য্য। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শিক্ষা—নিজ-গ্রামে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতেই পরিসমাপ্তি হয়, কোনরূপ উপাধিলাভ পর্য্যন্ত তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। এখন তিনি স্বগ্রামেই পৌরহিত্যের কার্য্য করিয়া থাকেন।

মথুরানাথ কন্যাকে স্বয়ং শিক্ষা দিয়া থাকেন; সুতরাং বিমলা শৈশবকাল হইতে শিক্ষাপ্রাপ্তা। কিন্তু কমলা আশৈশব অশিক্ষিতা; এমন কি—বর্ণজ্ঞান-রহিতা। বিমলার প্রকৃতি বড়ই উগ্র, কিন্তু কমলার প্রকৃতি বড়ই কোমল। কমলার পিতার

রামনগরে আজ সাত-পুরুষের বাস ; আর কর্ম্মোপলক্ষে মথুরানাথ রামনগর-প্রবাসী, এবং এই সূত্রেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রতিবাসী। সেই কারণ অতি শৈশবকাল হইতে বিমলা কমলার সই।

অষ্টম বৎসরের কমলা একদিন বিমলাকে ডাকিয়া কহিল,—"সই আমার কাল বিয়ে।"

বিমলা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল,—"সে কি লো!"

পর দিন সন্ধ্যার পর কমলার শুভ-পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। কায়স্থ-কন্যা বিমলা সইয়ের বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। সুতরাং স্বচক্ষে সেই বিবাহ কার্য্য দেখিয়া আসিল।

(২)

পূর্ব্ব বর্ণিত ঘটনার পর চারি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। কমলা, এক দিন শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়া, বিমলার সহিত সাক্ষাৎ করিল। বিমলা দেখিল—কমলা নানা অলঙ্কারভূষিতা এবং অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্না। বিমলা বিস্মিতা হইয়া কমলাকে তাহার স্বামী ও শ্বশুর বাড়ী সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিল। লজ্জাবনতমুখী কমলা, তাহার সইয়ের নিকট ধীরে ধীরে সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল। কমলার জীবনের এই সকল ঘটনার বিবরণ—বিমলার মনে কোন বলবতী ইচ্ছার উদ্রেক করিয়া দিল। কমলার সহিত নিজের জীবনের তুলনায়, বিমলা মনে মনে বড়ই দুঃখিতা হইল। সকলে স্মরণ রাখিবেন—বিমলা আজও অবিবাহিতা!

বিমলার পিতা মথুরানাথ, কন্যাকে সুশিক্ষিতা করিবার জন্যই ব্যস্ত ; কন্যা যে বিবাহোপযোগ্যা হইয়াছে, এ কথা তাঁহার

মনে একবার উদয়ও হয় নাই। কন্যা এদিকে যে বিবাহের জন্য উৎসুক, তিনি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই। মথুরানাথের এক প্রিয় ছাত্রের নাম—শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু। খগেন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর; জাতিতে কায়স্থ, নিবাস ঐ রামনগর গ্রামেই। মথুরানাথ খগেন্দ্রকে বড় ভাল-বাসিতেন। সেই কারণ, খগেন্দ্র সর্ব্বদাই মথুরানাথে গৃহে আসিত। অনেক সময় মথুরানাথ, আপনার কন্যা বিমলা আর এই খগেন্দ্রনাথকে একত্রে বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। কখ-নও কখনও বা খগেন্দ্রনাথের উপর বিমলার শিক্ষার ভার অর্পিত হইত।

(৩)

কিসে কি হইল, আমরা তাহা জানিনা; কিন্তু হঠাৎ এক দিন যৌবনোন্মুখী বিমলাকে দেখিয়া যৌবনোন্মুখ খগে-ন্দ্রের প্রাণে একটা ভয়ানক আঘাত লাগিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে, সে আঘাতের প্রতিঘাতও হইল। ধীরে ধীরে দুইটি ক্ষুদ্র তটিনী একত্রে মিশিল। তখন একটা প্রবল স্রোত ভীষণবেগে ছুটিল। মথুরানাথ এই ঘটনার কিছু জানিলেন না, কিছুই বুঝিলেন না। কিন্তু তাঁহার গৃহিণী জ্ঞানদাসুন্দরী—সকলই জানিতে পারিলেন, সকলই বুঝিতে পারিলেন। মথুরানাথের ন্যায় জ্ঞানদাসুন্দরীও একজন শিক্ষিতা মহিলা, খগেন্দ্রনাকেও তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। সুতরাং তিনি বিমলা ও খগেন্দ্রনাথের আচরণ স্বচক্ষে দেখিয়াও, তাহা উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইল। বিমলার বয়ঃক্রম যখন চতুর্দ্দশ বৎসর, তখন হঠাৎ একদিন বিসূচিকারোগে

মথুরানাথের মৃত্যু হইল। অনাথা বিধবা জ্ঞানদাসুন্দরী তখন চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন!

(৪)

বিমলা ব্যতীত মথুরানাথ আরও দুইটি অপোগণ্ডশিশু রাখিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের ভরণপোষণের কোন উপায় করিয়া যাইতে পারেন নাই। সুতরাং মথুরানাথের বিধবা স্ত্রী বড়ই চিন্তিতা হইলেন। অন্য উপায় না দেখিয়া, স্কুলের স্বত্বাধিকারী ও গ্রামের জমীদার শ্রীযুক্ত রাজা প্রতুল-চন্দ্র মিত্রের নিকট বিধবা আপনার অবস্থা জানাইলেন। মথুরানাথ, দ্বাদশ বৎসর কাল রাজা প্রতুলচন্দ্রের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছেন, এবং এই সূত্রে রাজার সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্বও হইয়াছিল। রাজা প্রতুলচন্দ্র, একজন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক। সুতরাং মৃত মথুরানাথের পত্নীর অবস্থার বিষয় জানিতে পারিয়া, একদিন স্বয়ং তাঁহাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জ্ঞানদাসুন্দরী রাজাকে আপনার প্রকৃত অবস্থা সমস্তই জানাইলেন, এবং বয়ঃস্থা কন্যাকে দেখাইয়া তাহার বিবাহের কোন উপায় করিতে রাজাকে অনু-নয় করিতে লাগিলেন।

আজ দুই বৎসর হইল, রাজা প্রতুলচন্দ্রের স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছিল। তার পর তিনি আর অন্য দারপরিগ্রহ করেন নাই। পত্নীবিয়োগ শোক বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া, তিনি গত দুই বৎসর কাটাইয়াছেন। আজ হঠাৎ এই অনাথা বিধবার বয়ঃস্থা কন্যাকে দেখিয়া, প্রথমেই সহানুভূতিতে তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে বহুদিনের সেই হৃদয়াবদ্ধ শোকও

ভাসিয়া চলিল। প্রতুলচন্দ্র বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু সেই অনাথা বিধবার গৃহ হইতে তাঁহার মনকে ফিরিয়া আনিতে পারিলেন না। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া, প্রতুলচন্দ্র জ্ঞানদাসুন্দরীর নিকট একজন ঘটকীকে পাঠাইলেন। ঘটকীর মুখে সমস্ত শুনিয়া জ্ঞানদাসুন্দরী আহ্লাদে আটখানা হইলেন, আহ্লাদে স্বামীর শোক পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। এই শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইলে, তাঁহার কন্যা রাজরাণী হইবে—অপোগণ্ড শিশুদ্বয় মানুষ হইবে—তাঁহাকেও আর উদরান্নের জন্য চিন্তিত হইতে হইবে না—জ্ঞানদাসুন্দরী কল্পনা-চক্ষে সকলই শুভ দেখিতে লাগিলেন।

(৫)

বিমলা যখন সেই শুভ সংবাদ শুনিল, তখন কিন্তু চারিদিক অশুভ দেখিল। তাহার প্রাণের ভিতর গুর্‌গুর্ করিয়া উঠিল—প্রাণের ব্যথায় অস্থির হইয়া সে দৌড়িয়া তাহার সইয়ের নিকট গেল। কমলা, পূর্ব্বেই বিবাহের সংবাদ শুনিয়াছিল; সুতরাং বিমলাকে দেখিয়া, আহ্লাদে দৌড়িয়া আসিয়া কহিল,—"সই, আমি তোমার কাছে যাব—মনে কর্‌ছিলেম্। কথাটা শুনে অবধি আমার যে কি আহ্লাদ হয়েছে, তা তোমায় আর মুখে বল্‌তে পারি না। তুমি রাজরাণী হলে—আমায় মনে থাক্‌বে তো?"

বিমলা বিষন্ন মনে উত্তর করিল,—"যদি বেঁচে থাকি সই, তবে মনে রাখ্‌বো।"

কমলা, বিমলার কথা শুনিয়া সাশ্চর্য্যে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল,—"কেন এমন কথা বল সই? তুমি রাজা

প্রতুলচন্দ্রের রাণী হবে; এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি আছে?"

বিমলা।—আমার বিয়ে নয়—এ আমার মৃত্যু! এ আমার সৌভাগ্য নয়—আমার নিতান্তই দুর্ভাগ্য।

কমলা।—কেন সই!

বিমলা।—তাই বল্‌তেই তোমার কাছে এসেছি। যাঁকে ভালবাস্‌তে পার্‌বো না—তাঁকে বিয়ে কর্‌বো কি করে সই?

কমলা।—আগে বিয়ে কর্‌, তার পর তো ভালবাসা হবে। বিয়ের আগে কি ভালবাসা হয়? আমার, যখন বিয়ে হয়, তখন ভালবাসা কাকে বলে জান্‌তেম না; এতদিন পরে এখন তা জান্‌তে পেরেছি।

বিমলা।—আমি যে অন্যকে ভালবেসে ফেলেছি।

কমলা বিস্মিত হইয়া কহিল,—"সে কি! কাকে ভালবেসে ফেলেছ সই?"

বিমলা।—খগেন্দ্রনাথকে। খগেন্দ্রনাথ ভিন্ন আমি আর কাকেও বিয়ে কর্‌বো না। তুমি মাকে গিয়ে এই সকল কথা বল। সেইজন্যেই তোমার কাছে এসেছি।

কমলা অবাক্ হইয়া বিমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এই কি যৌবন-বিবাহের পরিণাম!

(৬)

বিমলার জননী জ্ঞানদাসুন্দরীর হরিষে বিষাদ হইয়াছে। তিনি কমলার নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তিনি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মনে মনে যে অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, এখন সে আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে

কন্যাকে কোনরূপ শাসন করেন নাই, এইজন্য এখন তাঁহার মনে অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, এ সকল কথা শুনিয়াও, তিনি এ বিবাহে নিরস্ত হইলেন না। এরূপ অবস্থায় তিনি কি এ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারেন? সুতরাং কন্যাকে অনেক বুঝাইলেন, এবং অনেক প্রবোধ দিলেন। বিমলা কিন্তু কিছুতেই বুঝিল না।—কেবল কাঁদিয়া কাটিয়া দিনরাত্রি কাটাইতে লাগিল। এদিকে তাহার জননী তাড়াতাড়ি বিবাহের দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন।

আর দুই দিন পরে বিমলার বিবাহ। আজ গাত্রহরিদ্রা। উৎসব ও আনন্দে তাহাদের গৃহ পরিপূর্ণ। অন্যান্য প্রতিবাসীর ন্যায়, খগেন্দ্রনাথও আজ সে আনন্দে যোগদান করিয়াছেন। কিন্তু সেই আনন্দ ও উৎসবের মধ্যে থাকিয়াও, বিমলা কেবল নিরানন্দময়ী। নানা বহুমূল্য অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি গাত্রহরিদ্রার তত্ত্বের সহিত রাজা প্রতুলচন্দ্র প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু বিমলা তাহার কিছুই নিজ অঙ্গে ধারণ করিতে সম্মত নহে। এই ঘটনায় তাহার জননীর ক্ষোভের সীমা নাই দেখিয়া, খগেন্দ্রনাথ বিমলাকে গোপনে ডাকিয়া কহিলেন, "বিমলা, কেন তুমি তোমার মায়ের মনে কষ্ট দাও?"

বিমলা।—আমার মনের কষ্টের কথা একবার ভেবে দেখ দেখি

খগেন্দ্র।—সে সকল কথা ভুলে যাও।

বিমলা।—তোমার মুখে এই কথা!

খগেন্দ্র।—বিমলা, তুমি নিতান্ত বালিকা নও। সকল দিক ভেবে দেখ দেখি—তুমি কি সৌভাগ্যবতী! তোমার

পিতা কোন সম্পত্তি রেখে যেতে পারেন নাই—তোমার ছোট ভাই দুটি কি করে মানুষ হবে—সে কথা একবার ভেবে দেখ দেখি। এ বিবাহ হয়ে গেলে, তোমরা সকলে সুখী হবে।

বিমলা।—তুমিও কি এতে সুখী হবে খগেন্দ্র ?

খগেন্দ্র।—তোমার সুখেই আমার সুখ। তোমায় সুখী দেখলেই আমিও সুখী হবো। কিন্তু আমার কথা তুমি আর তোমার মনে স্থান দিও না—এখন তুমি আমায় একবারেই ভুলে যাও।

বিমলা অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল! তার পর এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—"আমি সে চেষ্টা করবো। কিন্তু তুমি আমার একটি কথার যথার্থ উত্তর দাও। তুমি আমায় এখন ভালবাস কি না ?"

খগেন্দ্র কিন্তু সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া, সে স্থান হইতে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন !

(৭)

বিমলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। একটি মাধবী—আজন্ম আশ্রিত সহকার-তরু পরিত্যাগ করিয়া অন্য তরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে যেরূপ হয়, বিমলার অবস্থা এখন সেইরূপ। রাজা প্রতুলচন্দ্রও এ বিবাহে সুখী হইতে পারেন নাই। কারণ, বিমলা সমস্ত কথা রাজাকে প্রকাশ করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছে। রাজা বিমলার মুখে সেই সকল কথা শুনিয়া বড়ই মনোকষ্ট পাইয়াছেন। কিন্তু খগেন্দ্রনাথের এইরূপ উচ্চ মনের পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। এমন কি, খগেন্দ্রনাথকে একদিন তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া পত্র লিখিলেন। খগেন্দ্রনাথ উত্তরে লিখিলেন—রাজা ও রাণী যদি এক সিংহাসনে

উভয়ে একত্রে উপবিষ্ট থাকেন, আর তাহাকে যদি সে স্থানে যাইতে দেওয়া হয়, তবেই তিনি সে স্থানে গিয়া তাঁহাদিগকে রাজসম্মান দিয়া আসিতে পারেন, নচেৎ আর তিনি রাজবাড়ী যাইবেন না। রাজা প্রতুলচন্দ্র ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; তথাপি ইহাতেই সম্মত হইলেন। পরদিন নির্দ্ধারিত সময়ে খগেন্দ্রনাথ রাজবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যেরূপ কথা ছিল, রাজা ও রাণী সেইরূপ নানা রাজোচিত বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া, এক রজত-সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া, খগেন্দ্রনাথের অপেক্ষা করিতে ছিলেন। একজন ভৃত্য, খগেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া সেই গৃহে উপস্থিত হইল। খগেন্দ্রনাথ যথোচিত সম্মান প্রকাশের সহিত তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা প্রতুলচন্দ্র তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্যে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু খগেন্দ্রনাথ মিনতি করিয়া রাজাকে উঠিতে নিবারণ করিলেন। রাজা কহিলেন,—"খগেন্দ্র, আমি তোমার কথা বিমলার মুখে সমস্তই শুনেছি। কিন্তু পূর্ব্বে এ সকল কথা শুন্‌লে, আমি এ বিবাহ কখনই কর্‌তাম না—আমার এ অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর। আমি তোমার ভাল কর্‌বো বলে, তোমায় ডেকেছি। তুমি কি চাও, বল।"

খগেন্দ্রনাথ বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "আমি যা চাই, আপনার অনুগ্রহে তাই পেয়েছি। আর আমি কিছুই চাই না।"

রাজা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ? আমি তোমার তো কিছুই দিই নাই।"

খগেন্দ্র।—রাজা বাহাদুর, আমি আপনার সঙ্গে বিমলাকে সিংহাসনে বস্‌তে দেখ্‌তে চেয়েছিলাম। আপনি অনুগ্রহ করে আমায় তা দেখিয়েছেন। এ ছাড়া আমার জীবনে আর কোন সাধ ছিল না; আজ আপনার অনুগ্রহে আমার সে সাধ পূর্ণ হয়েছে। এখন আমায় বিদায় দিন। আমি আর এ দেশে থাক্‌বো না।

রাজা।—তুমি আমার ধন, ঐশ্বর্য্য যা চাও, আমি এখনই দিতে প্রস্তুত আছি। না হয়, তুমি যাতে সুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করতে পার, এমন সম্পত্তি দিতেছি। তুমি কেন দেশত্যাগ ক'রে যাবে?

খগেন্দ্র।—আমি কিছুই চাই না। যেখানে থাকি, আপনাদিগের কুশল-সংবাদ ভিন্ন আর কিছুরই প্রত্যাশা করি না।

এই কথা বলিয়া, খগেন্দ্রনাথ, রাজা প্রতুলচন্দ্র ও রাণী বিমলার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাজা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে সিংহাসন হইতে তাড়াতাড়ি নামিলেন। সেই সময় রাণী বিমলা সিংহাসন হইতে মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। রাজা তাড়াতাড়ি বিমলার সে মূর্চ্ছা অপনোদন করিতে গিয়া দেখিলেন—বিমলা আর এ পৃথিবীতে নাই—তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ!

এ যৌবনবিবাহে সুখী হইল কে? উত্তর—কেহই নহে।

—০:+:০—

টাকার গাছ।

(২)

হুগলী জেলার শ্রীরামপুর সবডিভিসনের মধ্যে প্রসাদপুর গ্রাম। এই গ্রামে রূপচাঁদ দাস নামক একজন তাঁতির বাস। সপ্তম বৎসরের এক বালিকা কন্যা ও এক প্রৌঢ়া স্ত্রী ব্যতীত রূপচাঁদের এ সংসারে আর কেহ নাই। গ্রামের প্রান্তভাগে রূপচাঁদের একখানি মাত্র খড়ের ঘর। পূর্ব্বে রূপচাদ আপনার জাতি-ব্যবসা করিত; কিন্তু এখন আর সে ব্যবসায়ে তাহার পেটের অন্ন হয় না। সুতরাং রূপচাঁদ এখন কৃষিকর্ম্মের দ্বারা অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। রূপচাঁদের বাড়ীর সম্মুখে ছোট ছোট ঝাপ্ড়ি ঝাপ্ড়ি কতকগুলি বুনো-গাছ ছিল। একদিন বৈকালে তাহার বালিকা কন্যা সেইখানে খেলিতে খেলিতে আটটি টাকা কুড়াইয়া পায়, এবং দৌড়িয়া আসিয়া তাহার জননীকে সেই টাকা দেয়। দরিদ্র রূপচাঁদ-পত্নী একত্রে আটটি টাকা হয় ত কখন দেখেও নাই। সুতরাং কন্যার হস্তে এই টাকা

দেখিয়া, প্রথমে কিছুক্ষণ বিস্মিত হইয়া রহিল। তার পর, কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুই এ টাকা কোথায় পেলি ?"

কন্যা উত্তর করিল,—"আমাদের ঘরের সুমুখের মাঠে টাকার গাছ হয়েছে মা! আমি সেই গাছ থেকে এই টাকা পেয়েছি।"

কন্যার কথায় জননী ঈষৎ হাসিয়া, তাড়াতাড়ি হাঁড়ির মধ্যে সেই টাকা কয়েকটী তুলিয়া রাখিয়া দিল। কাহার নিকট কোন কথা প্রকাশ করিল না।

(২)

পর দিবস রূপচাঁদের কন্যা জননীকে আরও পাঁচটি টাকা আনিয়া দিল। কন্যার মুখে টাকার গাছের কথা শুনিয়া, রূপচাঁদ-পত্নী গত কল্য সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল; কিন্তু কন্যাকে পুনরায় আজ টাকা আনিতে দেখিয়া, এখন আর সে কথা উপেক্ষা করিতে পারিল না—আহ্লাদে আটখানা হইয়া কন্যার সহিত সেই দিকে দৌড়িল। কন্যা জননীকে টাকার গাছ দেখাইয়া দিল। জননী প্রতি গাছে গাছে আগ্রহের সহিত টাকার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। যখন সেই ছোট ছোট গাছগুলি দুই হস্তে সরাইতে সরাইতে ঝোপ হইতে দুই একটি করিয়া টাকা পড়িতে দেখিল, তখন রূপচাঁদ-পত্নীর বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। এই সকল গাছ যে নিশ্চয়ই টাকার গাছ—এই কথা তাহারও মনে দৃঢ় রূপে বিশ্বাস জন্মিল। রূপচাঁদ-পত্নী এইরূপে সেই দিন আরও

সাতটী টাকা পাইল এবং সন্ধ্যার সময় রূপচাঁদ গৃহে আসিলে গোপনে তাহাকে সকল কথা বলিল।

সেইদিন হইতে এই দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সেই টাকার গাছের আদর বাড়িল। রূপচাঁদ-পত্নী এখন হইতে প্রতিদিন কন্যাকে সঙ্গে লইয়া ঐ বুনো গাছ গুলিতে স্বহস্তে জলসেচন করিত। আর না করিবেই বা কেন? সেই দিন হইতে তাহাদের দারিদ্র্য-দুঃখ আর নাই। কারণ, মধ্যে মধ্যে প্রায়ই সেই টাকার গাছ হইতে রূপচাঁদের স্ত্রী ও কন্যা আট দশ টাকা পাইয়া থাকে। সেই কারণ এখন রূপচাঁদ আর মাঠে কৃষিকার্য্য করিতে যায় না। একে ত তাঁতির ছেলে—ভালরূপ কৃষিকার্য্য জানে না। তাহার উপর, এখন আর সে পরিশ্রম করিবার আবশ্যকতাই বা কি? রূপচাঁদ প্রতিদিন প্রাতে একবার মাত্র প্রসাদপুরের বাজারে যায়, সকলের চেয়ে বেশী দরে বড় বড় মাছ ও ভাল ভাল তরী তরকারী খরিদ করিয়া আনে; আর পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া খায়। গ্রামের লোক ত অবাক্!

(৩)

রূপচাঁদের কন্যার এখন ভাল ভাল বস্ত্রালঙ্কার হইয়াছে। সে একদিন সেই সকল বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া, পাড়ার ছেলে-মেয়েদের সহিত খেলিতে যায়, এবং কথায় কথায় তাহাদের কাছে এই টাকার গাছের গল্প করে। তখন সে কথা আর গোপন রহিল না; দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই গ্রামময় একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। বালক বৃদ্ধ যুবা—আর বালিকা

বৃদ্ধা যুবতী—যে এই কথা শুনিল, সেই টাকার গাছ দেখিতে রূপচাঁদের বাড়ীর দিকে দৌড়িল। তখন দলে দলে গ্রামের লোক আসায়, রূপচাঁদের গৃহ প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। রূপচাঁদ কিন্তু কোন মতে সে কথা স্বীকার করিল না। তাহার স্ত্রীও, সে কথা শুনিয়া, উগ্রচণ্ডামূর্তিতে কটূ ভাষায় সকলকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। ইত্যবসরে গ্রামের লোক বিশেষ কৌশলে তাহার কন্যাকে ভুলাইয়া টাকার গাছ চিনিয়া লইল। তখন সকলে মহা আগ্রহের সহিত টাকার গাছ খুঁজিয়া টাকা বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইল। খুঁজিতে খুঁজিতে, দুই একটা টাকাও গাছের উপর ঝোপের মধ্যে পাওয়া গেল। পাঁচ-সাতটা টাকা গাছের তলাতেও পড়িয়া ছিল! তখন অনেকেই এই টাকার গাছের অদ্ভুত কাহিনীর কথা বিশ্বাস করিল। সে দিন গ্রামে কাহারও আহার নিদ্রা নাই, সকলেই এই টাকার গাছের আন্দোলনে ব্যস্ত!

(৪)

প্রসাদপুর গ্রামের মধ্যে ব্রজনাথ ঘোষাল একজন সম্ভ্রান্ত এবং বুদ্ধিমান লোক। তিনি এই অদ্ভুত সংবাদ শুনিতে পাইয়া রূপচাঁদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ঘটনাস্থল ভাল রূপ নিরীক্ষণ করিয়া রূপচাঁদকে কহিলেন,—"রূপচাঁদ, মা লক্ষ্মী তোমার প্রতি বড় প্রসন্না দেখ্‌ছি। কিন্তু তুমি মনে করেছ—তোমার টাকার গাছ হয়েছে, বাস্তবিক তা নয়। কারণ, টাকার গাছ কখনও হতে পারে না। তোমার ঐ ঐ জমির কোন স্থানে নিশ্চয়ই অনেক টাকা পোতা আছে। দুই একটা ইঁদুরের গর্ত্তও যখন দেখ্‌ছি, তখন নিশ্চ-

মই ইঁদুরে সেই পোতা টাকা বার করে নিয়ে, ঐ ছোট ছোট ঝুপী গাছের তলায় ও উপরে ছড়াইয়া রাখে। তোমার জায়গায় যখন ঐ টাকা পোতা আছে, তখন টাকা তোমারই হবে। সে বিষয়ে তোমার কোন ভয় নাই। এখন, এক কর্ম্ম কর—গোল-যোগে আবশ্যক নাই, আজ রাত্রে চুপি চুপি ঐ জায়গার মাটি খুঁড়ে সেই পোতা টাকা বার কর। টাকা সব তোমারই হবে।"

ঘোষাল মহাশয়ের কথায় রূপচাঁদ আহ্লাদে আটখানা হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল, এবং বিনীত-ভাবে কহিল,—"দাদাঠাকুর, আপনাকে সে সময় উপস্থিত থাক্‌তে হবে। আপনি সদয় থাক্‌লে, আমি গ্রামের আর কাকেও ভয় করি না। আপনাকে বরং কিছু পূজা দিতে রাজী আছি।"

ঘোষাল মহাশয় সম্মত হইলেন। সেই দিন গভীর রাত্রে রূপচাঁদ সমস্ত টাকার গাছ তুলিয়া ফেলিল, এবং পোতা টাকার আশায় নিকটবর্ত্তী সমস্ত জমিও খুঁড়িয়া ফেলিল। কিন্তু সমস্ত রাত্রি খুঁড়িয়াও, মাটির নীচে হইতে একটিও টাকা বাহির করিতে পারিল না। রূপচাঁদের তখন হরিষে বিষাদ হইল!

রূপচাঁদ-পত্নী ও তাহার কন্যা, সেই স্থান খুঁজিয়া বেড়াইয়া আর একটিও টাকা পায় না! যখন সে গাছই নাই, তখন আর টাকা পাইবে কিরূপে? সে ইঁদুরগর্ত্তের মুখই যখন বন্ধ হইয়া গেল, তখন ইঁদুরেরা আর টাকা বাহির করিয়া

আনিবে কিরূপে? এখন, রূপচাঁদের কন্যা প্রতিদিন ইহার জন্য কাঁদে; আর তাহার স্ত্রী সেই পরামর্শদাতা বুদ্ধিমান শৃগাল মহাশয়কে প্রতিদিন সহস্র গালি না দিয়া আর জলগ্রহণ করে না।
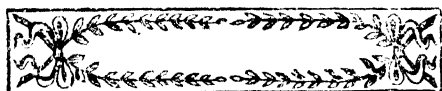
কাম না প্রেম ?

(১)

কেন দেখিলাম—দেখিয়া কেন মজিলাম ? কি অপরূপ রূপ ! এমন রূপত কখনও দেখি নাই। কি যোগিনী বেশে, আর কি রাজরাণী বেশে—সে রূপের ত কিছুই হ্রাসবৃদ্ধি দেখিলাম না! আকুঞ্চিত কেশদাম পরিবেষ্টিত সেই মুখচন্দ্রের কি অপূর্ব্ব শোভাই দেখিলাম! সে ভ্রূযুগল ত নয়—যেন মদনের ফুলধনুক। আর সেই খঞ্জনগঞ্জন আঁখিই যেন সেই ধনুকের বাণ! সে বাণের কি অব্যর্থ সন্ধান! সে সন্ধানে আমার প্রাণ যে যায়। কামানলে প্রাণটা যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে! অভিনেত্রী বেশে সে আমার মন চুরি করিয়াছে। থিয়েটার রোজ রোজ হয় না কেন? সেই বিম্বাধরের ঈষৎ হাসির রেখা আমার কেবলই মনে পড়িতেছে! সেই আকর্ণবিস্তৃত চক্ষুদ্বয়ের বঙ্কিম কটাক্ষ আমায় যে অস্থির করিল গা! যাই—যাই তাহার কাছে ছুটিয়া যাই—নইলে যে আমার প্রাণ যায়। একবার আলিঙ্গনের বিনিময়ে হাসিতে হাসিতে এ প্রাণও আমি বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। একটি চুম্বনের মূল্য কত? আবার সেই মুখ আমার ক্রমাগতই মনে পড়িতেছে—আর আমি স্থির হইতে পারিতেছি না। যখন তার

বাড়ীর ঠিকানা জানি, তখন আর কেন ? যখন সে স্বর্গের সন্ধান জানি, তখন সে স্বর্গসুখে বঞ্চিত থাকিব কেন ? আর না—আর না—আমি চলিলাম।

(২)

এই ত সম্মুখে সেই বাড়ী। আমার পা আর চলিতে পারে না কেন ? প্রাণের সে উৎসাহ আর নাই কেন ? বুকের ভিতর এমন ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ করে কেন ? ভয় ও লজ্জা কোথা হইতে আসিয়া আমার হৃদয়ে এরূপ অনধিকার প্রবেশ করিল কেন ? কিসের ভয়—কিসের লজ্জা ? যে বিহনে আমার যে প্রাণ যায় ! না—আর না—আমি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করি।

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছি, এমন সময় একজন স্ত্রীলোক আসিয়া আমায় তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"আপ্‌নি কাকে খুঁজ্‌ছেন বাবু ?"

আমি আর কাহাকে খুঁজিব ? যে আমার মনপ্রাণ হরণ করিয়াছে, আমি তাহাকে খুঁজিতেছি।

কিন্তু আমি ত তাহার নাম জানি না—এখন এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব ? এই সময় হঠাৎ আমার মুখ হইতে বহির্গত হইল—"এ বাড়ী থেকে থিয়েটারে যায় কে ?"

তখন সেই স্ত্রীলোক বলিল—" ও বিনোদ, তোকে কে একজন বাবু খুঁজ্‌ছে দেখ।"

তখন আমি বুঝিলাম—আমার মনমোহিনীর নাম বিনোদিনী। তা বিনোদিনীই বটে। কই—সে স্ত্রীলোকের কথায় সে বিনোদিনীত আসিল না। তখন সেই স্ত্রীলোক পুনরায়

কহিল—"আপনি সিঁড়ি দিয়ে উপরে যান্ না মহাশয়, উপরে উঠেই বাম দিকের ঘর বিনোদিনীর।"

সাহসে ভর করিয়া আমি ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া উঠিলাম। উপরে উঠিয়া কম্পিতহৃদয়ে বাম দিকের ঘরের দিকে যাইতেছি, এমন সময় দেখি—সেই ঘরের দরজা খুলিয়া কে বাহিরে আসিল। চাহিয়া দেখি—এ সেই বিনোদিনী—হাঁ আমারই বিনোদিনী। বিনোদিনী আমার দিকে ঈষৎ হাসি হাসি মুখে এক কটাক্ষ বাণ নিক্ষেপ করিয়া কহিল—"আপ্নি কে মহাশয়?"

আমার মুখ হইতে সে প্রশ্নের আর কোন উত্তর বাহির হইল না, তখন পুনরায় প্রশ্ন হইল—"আপ্নি কি চান মহাশয়?"

এইবার আমি সেই প্রশ্নের উত্তরে কহিলাম—"আমি তোমায় চাই।"

বিনো। তা আপনার সঙ্গে ত আমার কোন আলাপ-পরিচয় নাই, আপ্নি আমায় চাইবেন কি রূপে?

আমি। আলাপ-পরিচয় নাই বলেই, সেই আলাপ-পরিচয় করতেই আমি এসেছি। আর তোমার আমার সঙ্গে পরিচয় না থাকুক, আমার তোমার সঙ্গে খুব পরিচয় আছে।

বিনো। কই—আমার ত কিছুই স্মরণ হচ্ছে না।

আমি। কেন—গত শনিবার থিয়েটারে সে পরিচয় হয়।

বিনো। সে কি কথা মহাশয়?—তবে আমি নই, আপ্নার ভুল হয়েছে।

আমি। হাঁ তুমিই—আমার ভুল কিছুমাত্র হয় নাই। তুমিই সেই দিন হইতে আমার মন কেড়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছ।

বিনোদিনী তখন স্পষ্ট হাসিয়া কহিল—"আজ্ঞে, তবে

সেটা আমার জ্ঞানকৃত অপরাধ নয়—অজ্ঞানকৃত অপরাধ। থিয়েটার জায়গা—শতসহস্র লোক—পাঁচটা মনের সঙ্গে অজান্তে ভুলে নিয়ে এসে থাক্‌বো। আমি সে মন এখনই ফেরৎ দিচ্ছি মহাশয়—আপ্‌নি আপনার মন নিয়ে শীঘ্র বাড়ী চলে যান।

আমি। আমি ত মন ফেরৎ নিতে আসি নাই।

বিনো। তবে কিসের জন্যে এসেছেন মহাশয়?

আমি। আমার মনচোরকে দেখ্‌তে এসেছি।

বিনো। তা এখন দেখা ত হয়েছে—আপ্‌নি এইবার স্বচ্ছন্দে বাড়ী ফিরে যেতে পারেন।

আমি। এ দেখায় ত আমার সে তৃষ্ণা মেটে নাই, বরং সে তৃষ্ণা বেড়ে গেল যে!

বিনো। তা কি কর্‌বো মহাশয়—তা ত আমার ত আর কোন অপরাধ নাই।

আমি। তার একটা উপায় তোমায় কর্‌তেই হবে—নইলে একটা ব্রহ্মহত্যা হবে।

বিনোদিনী তখন শিহরিয়া উঠিয়া কহিল—"আপ্‌নি ব্রাহ্মণ না কি! আমি মনে করেছিলাম—এক ডিগ্রি নীচে—তা তবে আসুন—আসুন। এটা কিন্তু মনে রাখ্‌বেন—ব্রহ্মহত্যার ভয়ে আপ্‌নাকে বস্‌তে বল্‌ছি না। কারণ, ব্রহ্মহত্যার চেয়ে আমাদের বরং গো-হত্যার ভয়ই বেশী!"

সেই দিনই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়া গেল।

(৩)

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু পিপাসা ত মিটিল না।

অগ্নিতে ঘৃত সংযোগের ন্যায় সে পিপাসার হ্রাস না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধিই ত দেখিতে পাই। এখন উপায়?—উপায় আর কিছুই নাই—যেখানে উৎপত্তি, সেইখানে নিবৃত্তি ভিন্ন অন্য উপায় আর কি থাকিতে পারে? আমার এ সংসারের আর কিছুই ভাল লাগিত না—কেবল সেই বিনোদিনী ব্যতীত; বিনোদিনী ভিন্ন এ সংসারে আমার আর কিছুই আপনার ছিল না। আমি প্রতি অভিনয় রাত্রে সেই থিয়েটারে যাইতাম—অভিনয় দেখিতে নয়, সে কেবল বিনোদিনীকে দেখিবার জন্যে। অন্য দিন সন্ধ্যার পর, বিনোদিনী অভিনয় শিক্ষার জন্যে থিয়েটারে আসিত, সুতরাং সে সময় বিনোদিনীকে দেখিতে না পাইয়া আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতাম। শেষে অন্য দিনেও থিয়েটারে প্রবেশাধিকারের জন্যে, থিয়েটারের অধ্যক্ষের সঙ্গে উপযাচক হইয়া প্রণয়টা গাঢ় করিলাম—সেও কেবল বিনোদিনীর জন্যে।

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল। আমি এক দিন থিয়েটারে গিয়া বিনোদিনীকে দেখিতে পাইলাম না। তখন আমার মন বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। আমি থিয়েটার হইতে বিনোদিনীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম, বিনোদিনী আর সে বাড়ীতে নাই—সে বাড়ী হইতে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। আরো এক ভয়ঙ্কর কথা শুনিলাম—বিনোদিনী এখন একজন বড় লোকের রক্ষিতা—তাহার সহিত আর কাহার দেখা-সাক্ষাৎ হইবার উপায় নাই! কি ভয়ঙ্কর কথা! আমার মাথায় যেন অকস্মাৎ বিনা মেঘে এক ভীষণ বজ্রাঘাত হইয়া গেল! আমি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম।

অনেক অনুসন্ধানের পর, আমি বিনোদিনীর নূতন বাড়ীর সন্ধান করিলাম। সন্ধান করিলাম বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ-লাভ আমার অদৃষ্টে ঘটিল না! সে বাড়ীর সদর দরজায় দ্বারবান্ ছিল, সে দ্বারবান্ আমায় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দিল না। কি ভয়ঙ্কর কথা! বিনোদিনীর বাড়ীর মধ্যে আমার প্রবেশের অধিকার নাই? আমি স্বপ্নেও কখন যে এ কথা মনোমধ্যে স্থান দিতে পারি নাই—কল্পনাতেও যে এ কথা আমার মনে কখন উদয় হয় নাই! বিনোদিনী যে আমার প্রাণ—বিনোদিনী বিহনে যে এক মুহূর্ত্তও আমি জীবিত থাকিতে পারি না।

সে দ্বারবান্‌কে অনেক অনুনয়-বিনয় করিলাম—উৎকোচ দিতেও চাহিলাম—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। শেষে সেই দ্বারবান্ আমায় অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল। দ্বারবানের নিকট যে অপমানিত হইলাম, তাহার জন্যে কোন দুঃখ হইত না—যদি সে অপমানের পর, বিনোদিনীর একবার সাক্ষাৎ পাইতাম। চেষ্টারকোন ত্রুটি হইল না—কিন্তু বিনোদিনীরত আর সাক্ষাৎ পাইলাম না। এ সত্য না স্বপ্ন?—বিনোদিনী কি এত নিষ্ঠুর! মানুষ কখন এত নিষ্ঠুর হইতে পারে না—বিনোদিনী বিহনে আমার যে এত কষ্ট হইবে—সে নিশ্চয়ই সে কথা জানে না। সে এ কথা জানিলে কখনই আমায় এত কষ্ট দিত না। এখন তাহাকে এই কথা জানাইতে পারিলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। আমি পাগলের ন্যায় এখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম—এরূপ শূন্য হৃদয়ে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে আমার আর প্রবৃত্তি হইল না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াই, আবার ঘুরিতে ঘুরিতে সেই বিনোদিনীর দরজায় আসিয়া উপস্থিত হই। আশা—যদি কোন রকমে

তাহার সাক্ষাৎ পাই। আশা—একবার সাক্ষাৎ হইলে, সে নিশ্চয়ই আমায় বাড়ীর মধ্যে যাইতে দিবে। কিন্তু না—কিছুতেই আর বিনোদিনীর দর্শনলাভ আমার অদৃষ্টে ঘটিল না!

(৪)

আচ্ছা, এ সহরে কি বিনোদিনীর মতন আর সুন্দরী নাই? থাকিতে পারে,—কিন্তু সে আমার চক্ষে নহে। বিনোদিনীর মতন কেন—বিনোদিনী অপেক্ষাও অনেক সুন্দরী বারবিলাসিনী আছে। বিনোদিনী অপেক্ষা কুসুম সুন্দরী—হরিমতী সুন্দরী—ভবতারিণী সুন্দরী—কিন্তু আমিত তাহাদিগকে চাই না—আমি যে বিনোদিনীকেই চাই। বিনোদিনীর রূপের জন্যে নহে, কেবল বিনোদিনীর জন্যে! সে রূপের তৃষ্ণা আমার আর নাই, সে পিপাসা ত অনেক দিন মিটিয়া গিয়াছে, এখন শুধু বিনোদিনীর জন্যেই আমি বিনোদিনীকে চাই। তবে আমার এ কাম না প্রেম?

তা কামই হউক, আর প্রেমই হউক, তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই—আমার মনের কথা আমি বিনোদিনীকে চাই। তোমরা ইহাকে কাম বলিতে চাও, তাহাতে আমার আপত্তি নাই—প্রেম বলিতে চাও—তাহাতেও কোন আপত্তি নাই, আমি কিন্তু বিনোদিনীকে চাই। এই যে 'চাই' কথায় একটুকু কাম থাকিতে পারে—আমি স্বীকার করি—আমার সে কামনা আছে। তা ছাড়া আর আমার মনে কাম ত কিছুই নাই। তুমি ধনের কাঙ্গালী—মানের কাঙ্গালী—যশের কাঙ্গালী—এ সংসারে তোমার কাম্য বস্তু—

অসংখ্য। আমি কিন্তু তোমার ধন চাই না—মান চাই না—আর যশ ত নয়ই—আমি কেবল বিনোদিনীকে চাই। আমি কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া সমাজে অতি ঘৃণ্য ও অতি হেয় হইয়াও সেই বিনোদিনীকে চাই। বিনোদিনীর জন্য আমার ধন, মান, সম্ভ্রম, যশ, প্রতিপত্তি—সকলই গিয়াছে, তবু আমি বিনোদিনীকে—চাই। এ পৃথিবীতে বিনোদিনী অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ সুন্দরী থাকিলেও আমি সেই বিনোদিনীকে চাই। তুমি বলিবে —বিনোদিনী বারবিলাসিনী—বিনোদিনী বেশ্যা—বিনোদিনী নরক —বিনোদিনী পাপ, তথাপি আমি সেই বিনোদিনীকেই চাই। আমার এ কাম না প্রেম ?

(৫)

বিনোদিনী আমায় চায় না, আমি কিন্তু বিনোদিনীকেই চাই। বিনোদিনী আমায় ভাল বাসে না, আমি কিন্তু বিনোদিনীকেই ভালবাসি। কেন ভালবাসি জান ? সে ভালবাসা কিন্তু বিনোদিনীর জন্যে নয়—নিজের সুখের জন্যে। বিনোদিনীকে ভালবাসিয়াই আমার সুখ, আমিও সেই জন্যেই বিনোদিনীকে ভালবাসি। হয় ত, আমায় ভালবাসিয়া বিনোদিনী সুখী নয়, সেই জন্যে বিনোদিনী আমায় ভালবাসে না। সে দিকে আমার দেখিবার ইচ্ছা নাই—আমি যে বড়ই স্বার্থপর। আমি এ ভালবাসার প্রতিদান চাই না—বিনোদিনীকে ভাল বাসিয়াই আমি সুখী। দান-প্রতিদানে যে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়—আমি সেই কারণ সে দান-প্রতিদান চাই না—আমি তাহাকে ভালবাসিয়াই সুখী। এখন তোমরা বিচার করিয়া বল—আমার এ কাম না প্রেম ?

তুমি বলিবে—এ প্রেম বটে কিন্তু পবিত্র প্রেম নয়—এ অপবিত্র প্রেম। আমি তোমার পবিত্র বা অপবিত্রের ধার ধারি না—আমি কেবল প্রেম লইয়াই সুখী। বিনোদিনীকে ভাল না বাসিলে, আর আমার অন্য উপায় নাই—সেই জন্যেই আমি বিনোদিনীকে ভালবাসি। তুমি বলিবে—এরূপ অপবিত্র ভালবাসায় পাপ আছে—আমিও বলি তথাস্তু। আমি ত সে পাপ অস্বীকার করি না—তবে তোমায় আমায় মতের প্রভেদ কি? তুমি বলিবে—এ পাপের জন্য আমায় নরকভোগ করিতে হইবে—আমিও সেকথা অস্বীকার করি না।—হউক পাপ, হউক নরক, তথাপি আমি বিনোদিনীকে ভালবাসিব। আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বিনোদিনীকে ভালবাসার সঙ্গে আমার এমন এক সুদৃঢ় বন্ধন রহিআছে যে একের আবির্ভাবে অন্যের আবির্ভাব, একের তিরোভাবে অন্যের তিরোভাব। এখন তোমরা বিচার করিয়া বল—আমার এ কাম না প্রেম? আর যদি প্রেম হয়—এ প্রেম পবিত্র কি অপবিত্র প্রেম?

(৬)

আচ্ছা, সাধনা করিলে কি সিদ্ধিলাভ হয় না? আমি যদি সেই প্রেমের সাধনা করি, আমার অদৃষ্টে কি সিদ্ধিলাভ ঘটিবে না? আমার প্রেমের সাধনা শুনিয়া হয় ত তুমি হাসিবে। তুমি ঐশ প্রেমের সাধনা করিতে পার, আর আমি বিনোদিনী প্রেমের সাধনা করিতে পারি না? তোমার অভীষ্ট ভগবান, আর আমার অভীষ্ট বিনোদিনী। তুমি যদি আপনার সাধনার দ্বারা তোমার অভীষ্টদেবকে লাভ করিতে পার, আমি

সেইরূপ সাধনা দ্বারা আমার অভীষ্টদেবী বিনোদিনীকে লাভ করিতে না পারিব কেন ? তোমার না হয়—ভগবান, আর আমার না হয় বিনোদিনী—এই মাত্র প্রভেদ। তোমার ভগবান তোমার কাছে যেমন বড়, আমার বিনোদিনীও আমার কাছে সেইরূপ বড়। তবে আর মূলে প্রভেদ কোথায় রহিল ? তোমার সাধনা যদি অতি কঠোর ও অতি কঠিন নয়, আমিও সেইরূপ অতি কঠোর ও অতি কঠিন সাধনাই করিব। তুমি সিদ্ধিলাভ করিবে, আর আমি কি সে সিদ্ধিলাভে বঞ্চিত থাকিব না কি ? আমার মনে যদি যথার্থই একাগ্রতা জন্মিয়া থাকে, আমি যদি বাস্তবিকই অনন্যমনাঃ, অনন্যকর্ম্মা হইয়া থাকি, তবে আমার সিদ্ধিলাভ না হইবে কেন ?

তুমি কি চাও ?—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম না মুক্তি ? তোমার ধর্ম্ম, তোমার অর্থ, আর তোমার কাম বাদ দিয়া তোমার জীবনের যে সর্ব্বোচ্চ উদ্দেশ্য—সেই মুক্তির কথাই ধরিলাম। তুমি যে মুক্তি চাও—আমিও ত সেই মুক্তি চাই। তুমি নিত্যসুখ প্রাপ্তির আশার সাধনা করিতেছ—আমিও সেই নিত্যসুখের প্রার্থী। —সেই নিত্যসুখের আশায়ই সাধনা করিতে প্রয়াসী। তুমি এই সাংসারিক দুঃখের নিবৃত্তি চাও, আমিও ত তাই চাই। তুমি তোমার দেহের ইন্দ্রিয়াদি হইতে বন্ধন মোচনের প্রার্থী, আমিও ত তাই। তুমি তোমার পরমব্রহ্মে একবারে লয় প্রাপ্ত হইতে চাও, আমিও ত আমার বিনোদিনীতে সেইরূপ লয় প্রার্থনা করি! তবে তোমায় আর আমায় প্রভেদ কি ? তুমি

যে যোগমার্গ সাধনা করিতেছ, আমিও ত সেই যোগমার্গই অবলম্বন করিতে চাই, তবে তোমার মুক্তি হইলে, আমারও মুক্তি না হইবে কেন? তুমি না হয়—জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ চাও, আর আমি না হয়—আমার পাপাত্মার সহিত বিনোদিনীর আত্মার সংযোগ চাই—এই মাত্র ত প্রভেদ? তবে তুমি যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে, আমি সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব না কেন?

তোমার সাধনায় হয়ত শ্মশান চাই, কিন্তু আমার সাধনায় সর্ব্বত্রেই শ্মশান। এই গঙ্গাতীরেই আমি সাধনায় বসিলাম—দেখি—সিদ্ধিলাভ হয় কি না? হয় সিদ্ধি, না হয় মৃত্যু—দুই এর এক চাই। তোমার সাধনার উদ্দেশ্য হয়ত তোমার ইষ্টদেবের নিকট বর প্রাপ্তি হইতে পারে, কিন্তু আমি অন্য বরের কথা দূরে থাকুক, তোমার ইন্দ্রত্বও চাহি না।

(৮)

অনাহারে ও অনিদ্রায় প্রথম দিন সেই গঙ্গাতীরে কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় দিবসে শরীর বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। ক্ষুধা তৃষ্ণা ছিল না,—কেবল শরীর দুর্ব্বল। তা হউক শরীর দুর্ব্বল—হয় সিদ্ধিলাভ—না হয় মৃত্যুর জন্যে যে প্রস্তুত, তাহার আর শরীর দুর্ব্বলতে আর কি করিতে পারে? আমি এ ক্ষণভঙ্গুর শরীরের প্রতি কোন লক্ষ্য না করিয়া পুনরায় একাগ্রচিত্ত হইয়া সাধনায় মনোনিবেশ করিলাম। এইরূপে দ্বিতীয় দিবস কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিবসে শরীরের অবসাদ আরো বৃদ্ধি দেখিলাম।

ক্রমেই শরীর যেন অবসন্ন হইতে লাগিল। তথাপি আমার মনের একাগ্রতার কিছুমাত্র হ্রাস দেখিলাম না। শরীর দুর্ব্বল হইলেও আমি তখনও মনের বলে বলীয়ান ছিলাম। এইরূপে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পর যে কি হইল—আমার আর স্মরণ নাই! আমি নিশ্চয়ই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম।

অধিক রাত্রে আমার জ্ঞান হইল—তখন রাত্রি কত আমি বলিতে পারি না। আমি কিন্তু সে সময় এক মহাতেজঃপুঞ্জ জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর ক্রোড়ে শায়িত ছিলাম। সন্ন্যাসী আমার মুখে এক মহাসুগন্ধযুক্ত পানীয় অল্পে অল্পে ঢালিয়া দিতেছিলেন। বোধ হয়—সে পানীয়ের গুণেই আমি পুনরায় জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমার জ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া, সন্ন্যাসী আমায় ধীরে ধীরে কহিলেন—"বৎস, তোমার সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। তোমার একাগ্রতাই তোমার সিদ্ধিলাভের মূল কারণ। এখন তুমি কি চাও—বল ?"

কিসে কি হইল জানি না—সন্ন্যাসীর সেই প্রশ্নের উত্তরে আমি ধীরে ধীরে উত্তর করিলাম—"আমি আপনার শিষ্য হইতে চাই—দাসানুদাস হইতে চাই।"

সন্ন্যাসী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"তুমি সে বিনোদিনীকে আর চাও না ?"

আমি আগ্রহের সহিত তাড়াতাড়ি উত্তর করিলাম—"না না না—আমি আর সে বিনোদিনীকে চাই না। বিনোদিনী মায়াবিনী—বিনোদিনী রাক্ষসী।"

তখন সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"তবে এস বৎস, আমার সঙ্গে এস।"

সেই দিন হইতে আমি গৃহসংসার সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া এই মহাপুরুষের শিষ্য হইলাম।

রমাবাই।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া নরেন্দ্রনাথ গত কল্য বম্বাই নগরে পৌঁছিয়াছেন। এই নগর তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান; এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা অতি অল্প, তবে কলিকাতায় কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে একজন সম্ভ্রান্ত বম্বাইবাসীর নামে এক পত্র আনিয়াছেন—এই মাত্র ভরসা। সে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নাম—বিশ্বনাথ রাও। বিশ্বনাথ রাও বম্বাই অঞ্চলের একজন প্রসিদ্ধ ধনী; তাঁহার যশ, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি কেবল বম্বাই কেন, ভারতের সর্ব্বাংশেই বিশেষরূপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইনি একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, ইহার ন্যায় সদাশয়, উচ্চমনা মহাত্মা ব্রাহ্মণকুলেও দুর্ল্লভ। বম্বাইনগরে

তাঁহার ন্যায় ধনী অনেক থাকিতে পারেন, কিন্তু এরূপ সর্ব্বজন-প্রিয় আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

আজ প্রত্যুষেই নরেন্দ্রনাথ বিশ্বনাথ রাওর অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। সে অনুসন্ধানে তাঁহাকে অধিকক্ষণ কষ্ট করিতে হয় নাই; একজন ভাড়াটীয়া গাড়ীর গাড়োয়ানকে বলিবামাত্র সে নরেন্দ্রনাথকে বিশ্বনাথ রাওর বাড়ীর সম্মুখে পৌঁছিয়া দিল। নরেন্দ্রনাথ বিশ্বনাথ রাওর বৃহৎ অট্টালিকা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এ অট্টালিকা ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত নহে, ইহা কাষ্ঠনির্ম্মিত সুন্দর চৌতালা গৃহ। কাষ্ঠের দ্বারা যে এমন সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতে পারে, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না।

নরেন্দ্রনাথ গাড়ী হইতে নামিয়া রাও সাহেবকে তাঁহার আগমন সংবাদ পাঠাইলেন। মোহন নামক একজন ভৃত্য আসিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে উপরে লইয়া গেল। নরেন্দ্রনাথকে মোহন যে গৃহে লইয়া গিয়া বসাইল, যে গৃহটী সুন্দররূপে সুসজ্জিত। গৃহের দেয়াল, জানালা, কড়ি, বরগা ও চৌকাট পর্য্যন্ত সুবর্ণ ও অন্যান্য বর্ণে মনোহররূপে চিত্রিত। গৃহের চারিদিকে চারিখানি বৃহৎ দর্পণ, চারুকার্য্যময় সুবর্ণরঞ্জিত ফ্রেমের মধ্যে শোভা পাইতেছিল। ইহা ব্যতীত দেশী বিলাতি নানা রকমের ছবিদ্বারা গৃহটী সুশোভিত। সে ছবিগুলি সাধারণ ছবি নয়, দেখিলেই মূল্যবান্ বলিয়া বোধ হয়। নানাবিধ ছোট বড় দেশী বিদেশী গৃহশোভাকর দ্রব্যাদি যথাস্থানে সন্নিবেশের দরুণ গৃহকর্ত্তার বিশেষ সুপছন্দ প্রকাশ পাইতেছিল। গৃহতল শ্বেতমসৃণ মারবেল পাথরে

আবৃত, তাহার উপর তুরস্ক দেশীয় সুন্দর কারপেট বিস্তৃত ছিল। কারপেটের উপর নানারকমের চেয়ার, সোফা, আটোম্যান্ প্রভৃতি যথাস্থানে স্থাপিত। ফুলদার মখমলের উপর কারচোপের কাজ-করা পরদা সকল গৃহতল হইতে এক হাত উর্দ্ধে প্রত্যেক দরজা ও জানালায় ঝুলিতেছিল। একখানি পরদার পার্শ্ব দিয়া পার্শ্বের অন্য একখানি সুন্দর গৃহের কতক অংশ দেখা যাইতেছিল। গৃহটী মনোমুগ্ধকর সৌগন্ধে পরিপূর্ণ। নরেন্দ্রনাথ জীবনে কখন এরূপ সুন্দর সুসজ্জিত গৃহ অবলোকন করেন নাই; সুতরাং সে গৃহের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলেন।

তিনি বিস্মিতনেত্রে গৃহের চারিদিক অবলোকন করিতেছেন, এমন সময় সেই পার্শ্বস্থ গৃহ হইতে স্বয়ং বিশ্বনাথ রাও আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন! নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিয়াই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাও সাহেব বিশেষ সমাদরের সহিত সেই অপরিচিত যুবাকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য আসনে বসাইলেন। এই সময় নরেন্দ্রনাথ তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিলেন। রাও সাহেব আগ্রহের সহিত সেই পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্রপাঠ শেষ হইলে সহাস্যবদনে নরেন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—"আপনি আমার বিশেষ বন্ধু রাজা পরেশনাথের আত্মীয়। আপনাকে পাইয়া আমি যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। কি উদ্দেশে এখানে আসিয়াছেন—বলুন। আপনার যে কোন সাহায্য আবশ্যক হইবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।"

রাও সাহেবের কথায় বিশেষ আনন্দিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"আপনার নাম ও খ্যাতি অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, আজ আপনার সাক্ষাৎলাভে বিশেষ আনন্দিত হইলাম। এখানে আসিবার আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, আমি দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছি, বম্বাই সহর দেখিবার জন্যই আমার এখানে আসা।"

বিশ্বনাথ। আপনি কবে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন?

নরেন্দ্র। আমি গতকল্য এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এখনও কোন নির্দ্দিষ্ট থাকিবার স্থান স্থির করিতে পারি নাই। আপনাকে আমার থাকিবার স্থান স্থির করিয়া দিতে হইবে।

বিশ্বনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আপনাকে আর অন্য স্থানে যাইতে হইবে না; যতদিন এখানে থাকিবার ইচ্ছা, আমি আদরের সহিত আপনাকে এ বাড়ীতেই রাখিব। আপনি যখন রাজা পরেশনাথের আত্মীয়, তখন আমারও বিশেষ আত্মীয় হইলেন। নিজের গৃহের মতন আপনি এ বাড়ীতে থাকিতে পারেন।"

নরেন্দ্রনাথ রাও সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে একজন প্রবীণ লোক বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন দেখিলেন—রাও সাহেব তাঁহারই সমবয়স্ক; সুতরাং বিদেশে এরূপ সকল বিষয়ে বাঞ্ছনীয় আশ্রয় ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে উচিত হয় না; তত্রাচ তিনি বলিলেন—"আপনার অনুগ্রহে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হইলাম। কিন্তু বিদেশে আসিয়া এরূপ স্বর্গতুল্য গৃহে বাস করিলে বিদেশে থাকিবার যে

একটু আমোদ, তাহা পাইব কিরূপে? বিদেশে আসিয়া কষ্ট সহ্য করাই আমার ইচ্ছা।”

রাও সাহেব তখন হাসিয়া বলিলেন—“আমার গৃহে কষ্টের অভাব নাই। কষ্ট সহ্য করাই যখন আপনার ইচ্ছা, তখন আমি আপনাকে কোন ক্রমেই ছাড়িয়া দিতে পারি না।”

রাও সাহেব যেরূপভাবে এই কথা কয়েকটি বলিলেন, তাহাতে নরেন্দ্রনাথ আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। রাও সাহেব নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এ সহরের এখন কিছুই বোধ হয়—আপনার দেখা হয় নাই?”

নরেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন—“গত কল্য বৈকালে আসিয়া পৌছিয়াছি; সন্ধ্যার সময় কেবল একবার সমুদ্রতীরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম; সেখানে অসংখ্য পার্শী ও হিন্দুযুবতী রমণীকে স্বচ্ছন্দে বেড়াইতে দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছি—সেরূপ দৃশ্য আমাদের দেশে বড় বিস্ময়জনক।”

বিশ্বনাথ। আর কিছু দেখিয়াছেন কি?

নরেন্দ্র। সমুদ্রতীর হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় এক দেব মন্দিরে আরুতি দেখিতে দলে দলে অনেক স্ত্রীলোককে যাইতে দেখিলাম; কৌতূহলের বশীভূত হইয়া আমিও সেই দেবমন্দিরে প্রবেশও করিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা আর—

নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ নীরব হইলেন। যেন কোন কথা গোপন করিবার জন্য তিনি এই সময় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; রাও সাহেব নরেন্দ্রনাথের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ

হাসিয়া আগ্রহের সহিত কহিলেন—"কি দেখিলেন —বলুন।"

নরেন্দ্রনাথ একটু অপ্রস্তুত হইয়া নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাও সাহেব পুনরায় বলিলেন—"আপনার সহিত অল্পক্ষণের আলাপেই আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এখন আপনাকে আমার একজন বহুদিনের পরিচিত বন্ধু বলিয়া মনে করি, সুতরাং আমার নিকট কোন কথা বলিতে আপনি সঙ্কুচিত হইলে আমি বড় দুঃখিত হইব।"

নরেন্দ্র তখন আরম্ভ করিলেন—"সেখানে দেখিলাম—যেন এক সৌন্দর্য্যের মেলা—বহু সংখ্যক পরমা সুন্দরী রূপবতী রমণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি যখন প্রবেশ করিলাম, তখন আরুতি শেষ হইয়া গিয়াছে। সেই সৌন্দর্য্য রাজ্যের যেন এক রাণী তখন বীণানিন্দিত স্বর্গীয় সঙ্গীতে উপস্থিত সমস্ত লোককে একেবারে মন্ত্রবশীভূত করিয়া রাখিয়াছিল। স্বদেশে ও বিদেশে আমি অনেক সুন্দরী দেখিয়াছি, এই সহরে আসিয়াও অল্পক্ষণের মধ্যে আমি অনেক পরমা সুন্দরীকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছি, কিন্তু সেরূপ সুন্দরী আমার কল্পনারও অতীত, সেরূপ মন-মুগ্ধকর সঙ্গীত আমি জীবনে কখনও শুনি নাই।"

বিশ্বনাথ। আপনি কোন্ দেবমন্দিরে গিয়াছিলেন বলুন দেখি।

নরেন্দ্র। সে মন্দিরে দেবতা আছেন, কি দেবী আছেন, তাহা আমি জানি না; আমার আর অন্য কোন দিকে লক্ষ্য

ছিল না। আমি সে মন্দিরের দেবতা বা দেবীকে প্রণাম করিতে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

বিশ্বনাথ। আচ্ছা, সে সুন্দরীর সবুজ রংএর পরিচ্ছদ ছিল কি?

নরেন্দ্র। হাঁ, পরিধানে সবুজ রংএর পরিচ্ছদ ছিল। কানে দুইটি হীরার ইয়ারিং ছিল, আর তাহার উপরে দুই দিক হইতে দুইটি কুণ্ডলাকার চুলের কেয়ারি আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই কাল চুলের কেয়ারিতে সে সুন্দর মুখের যে কি শোভা হইয়াছিল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না।

রাও সাহেব নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের ভাবে উল্লসিত চক্ষুদ্বয়ের প্রতি কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"নরেন্দ্র বাবু, আপনি সে অপরিচিতা যুবতীকে প্রাণের সহিত নিশ্চয়ই ভালবাসেন।"

নরেন্দ্রনাথ অপ্রতিভ হইয়া তৎক্ষণাৎ লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই হঠাৎ সেই পূর্ব্বশ্রুত প্রাণমনমুগ্ধকর মধুর সঙ্গীতলহরী তাঁহার কর্ণে গিয়া পৌছিল! নরেন্দ্র শিহরিয়া উঠিয়া মস্তক উন্নত করিলেন! কিন্তু মস্তক উন্নত করিয়া সম্মুখে কি দেখিলেন? দেখিলেন—সেই পার্শ্বস্থগৃহের দরজায় সংলগ্ন পরদা এখন অপসৃত হইয়া গিয়াছে, আর সেই পার্শ্বের গৃহের মধ্যে পূর্ব্বদৃষ্টা—তাঁহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী উপবিষ্টা! আর তাঁহারই বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বর হইতেই সেই পূর্ব্বশ্রুত স্বর্গীয় সঙ্গীতলহরী! নরেন্দ্রনাথ জাগ্রৎ না নিদ্রিত?

—০:০—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যতক্ষণ সঙ্গীত শেষ না হইল, ততক্ষণ নরেন্দ্রনাথের মুখে কোন কথাই নাই! তিনি কথা কহিবেন কি—এ দৃশ্য তখন তাঁহার স্বপ্ন বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। সে সঙ্গীত শেষ হইলে রাও সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"কেমন, আপনি এই সুন্দরীর এই সঙ্গীতই সেই দেবমন্দিরে শুনিয়াছিলেন ত?"

তখনও যুবক নীরুত্তর; তবে কি ইহা স্বপ্ন নয়? নরেন্দ্র তখন কেবল এই কথাই ভাবিতেছিলেন। রাও সাহেব পুনরায় হাসিতে হাসিতে আরম্ভ করিলেন—"কিন্তু আমি বড় দুঃখিত হইলাম যে, আপনার ভালবাসা বড় অপাত্রে অর্পিত হইয়াছে। আপনি ভালবাসার বিনিময়ে ইহাঁর নিকট কণামাত্রও ভালবাসা প্রত্যাশা করিবেন না। ঐ ক্ষুদ্র হৃদয়ের অনন্ত ভালবাসার একমাত্র অধিকারী আমি!"

শেষের এই গর্ব্বিত কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে রাও সাহেব উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। সে উচ্চহাসি নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে গিয়া যেন একটা ভীষণ বজ্রাঘাত করিল। নরেন্দ্রনাথ জীবনে এরূপ সঙ্কটে কখন পড়েন নাই। ঘৃণায় ও লজ্জায় তিনি মৃতপ্রায় হইয়া অধোবদনে রহিলেন। প্রাণের ভিতর একটা অসহ্য যন্ত্রণাও তিনি এই সময় অনুভব করিতেছিলেন। রাও সাহেব নরেন্দ্রনাথকে এরূপ অপ্রস্তুত হইতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে

বলিলেন—"নরেন্দ্র বাবু, আপনার অপ্রস্তুত হইবার কোন কারণ নাই। এ কথা প্রকাশ করিয়া আপনি সরল মনের পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ সরল ও অকপট বন্ধু লাভ করা আমি সৌভাগ্যের বিষয় মনে করি। আপনি ঐরূপ সঙ্কুচিতভাবে থাকিলে আমি বড় দুঃখিত হইব। আপনি যাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহার সহিত আলাপ করিলে সুখী হইতে পারিবেন,—আসুন, আমার স্ত্রীর সহিত আপনার পরিচয় করিয়া দি।"

এই সময় সেই অলৌকিক দেবীপ্রতিমা ধীরে ধীরে নরেন্দ্র নাথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নরেন্দ্রনাথের সর্ব্বশরীরে হঠাৎ যেন একটা তাড়িত প্রবাহ ছুটিল, এবং এই সময় তাঁহার হৃদয় ও কি জানি কেন গুর্ গুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! রাও সাহেব এই-বার সেই সুন্দরীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"রমা, ইনি আমার কোন সম্ভ্রান্ত বন্ধুর আত্মীয়, অল্পক্ষণের আলাপেই ইনিও আমার এক জন বন্ধু হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের সহর দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন, আমার গৃহে অতিথিস্বরূপ থাকিবেন, তুমি ইহাঁকে বিশেষ যত্ন করিও।"

রমাবাই ঈষৎ হাসিয়া অপ্সরানিন্দিত কণ্ঠস্বরে বলিল—"আপনাকে বঙ্গদেশীয় বলিয়া অনুমান হইতেছে, মহাশয়ের নাম কি?"

আহা! কি মধুর কণ্ঠস্বর! ইহা কণ্ঠস্বর না বীণার ঝঙ্কার? নরেন্দ্রনাথ সে কণ্ঠস্বর শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া নীরবে রহিলেন। প্রশ্নকারিণীর প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পাঁরিলেন না। রাও সাহেব সে প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—"ইহাঁর নাম নরেন্দ্রনাথ।

ইনি বঙ্গদেশীয়ই বটে, বঙ্গদেশের কোন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকুলে ইহাঁর জন্ম।''

এই সময় আর একজন ষোড়শী চঞ্চলগতিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা এই ষোড়শীকে বালিকা বলিব না যুবতী বলিব ? ষোড়শী বালিকা হউক, আর যুবতীই হউক, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেই রমাবাই সহাস্যবদনে তাহাকে বলিল—"বিলাস, ইনি তোমার স্বদেশীয় ?"

রাও সাহেব এই সময় বলিলেন—"রাজা পরেশনাথের নাম বোধ হয়, তুমি শুনিয়াছ। ইনি তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র।"

ষোড়শীর নাম বিলাসবতী। বিলাসবতী তখন বিলোল কটাক্ষে নরেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি বিস্ময়-ব্যঞ্জক ; বিলাসবতী নরেন্দ্রনাথের রূপ দেখিয়া এমন সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিয়াছে কেন ?

এই সময় নরেন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করিয়া রাও সাহেব পুনরায় বলিলেন—"বিলাসবতী আমাদের কলিকাতার ব্রাহ্মবন্ধু হরনাথ বাবুর কন্যা। এখানকার স্ত্রীশিল্পবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার জন্যে আমার বাড়ীতে আছেন। এখানে থাকিয়া আপনি একজন স্বদেশীয়ার সহবাস সুখও অনুভব করিতে পারিবেন।"

এতক্ষণের পর নরেন্দ্রনাথও প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং রাও সাহেবকে ধীরে ধীরে বলিলেন—"আপনার অনুগ্রহ যথেষ্ট, কিন্তু আমি আপনার গৃহে থাকিতে পারিব না ; অনুগ্রহ করিয়া অন্যত্রে আমার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিন।"

রাও সাহেব ঈষৎ হাসিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"আপনি অন্যত্রে বাসা করিয়া থাকিলে, আমি বিশেষ দুঃখিত

হইব। এখানে থাকিবার আপনার কি আপত্তি থাকিতে পারে?"

নরেন্দ্র। আমি একটু স্বাধীনভাবে থাকিতে ইচ্ছা করি। আপনার গৃহে থাকিলে আমায় একটা বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকিতে হইবে।

রাও সাহেব। নিজের গৃহে আপনি যেমন স্বাধীনভাবে থাকেন, এখানেও সেইরূপ স্বাধীনভাবে থাকিবেন। আপনি যতদিন এখানে থাকিবেন, এ গৃহের গৃহস্বামী আপনি। আমার সমস্ত ভৃত্য আপনার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে।

এই সময় রমাবাই ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"আর আমিও দাসীর ন্যায় আপনার পরিচর্য্যা করিব।"

আবার সেই বীণানিন্দিতস্বরে এই কথা! সুতরাং নরেন্দ্রনাথ আর কোন দ্বিরুক্তি করিলেন না। তখন রাও সাহেবের গৃহে থাকাই নরেন্দ্রনাথের স্থিরীকৃত হইয়া গেল। তাঁহার সমস্ত দ্রব্যাদি তৎক্ষণাৎ তথায় আনীত হইল। সেই দিন হইতে রাও সাহেব অন্য কোন কার্য্যই করিতেন না; কেবল সস্ত্রীক নানারূপ কথাবার্ত্তায় নরেন্দ্রনাথকে সুখী করিতে চেষ্টা করিতেন। নরেন্দ্রনাথ প্রথমে যেরূপ অকপটচিত্তে রাও সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এখন কিন্তু আর সে ভাব নাই। দায়ে পড়িয়া দুই একটি প্রশ্নের উত্তর দিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেন।

বিলাসবতীও অনেক সময়ে তাহাদের নিকট থাকিত এবং চঞ্চলদৃষ্টিতে মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্রনাথের মুখের প্রতি চাহিত। সেই দিন হইতে বিলাসবতীও যেন কিছু বিমর্ষ, আর মধ্যে

মধ্যে অন্যমনস্কও হইত। এইরূপে তিন দিবস অতি বাহিত হইয়া গেল।

চতুর্থ দিবস প্রাতে রাও সাহেব নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন—"ঈশ্বর আপনাকে বড় উপযুক্ত সময় আমার গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছেন। বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষে হঠাৎ অদ্যই আমায় স্থানান্তরে যাইতে হইবে। সম্ভবতঃ সে কার্য্যে আমার একমাস বিলম্ব হইবে; আপনি আমার গৃহে না থাকিলে এই দীর্ঘকাল আমার স্ত্রীকে এরূপ অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া আমি তথায় যাইতে পারিতাম না। আপনি আমার ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা করিলে, আমি বিশেষ বাধিত হইব।"

নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া রাও সাহেবের মুখের প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর শুষ্ককণ্ঠে অতি কষ্টে বলিলেন—"আপনার অনুপস্থিতিতে আমি আপনার গৃহে কিরূপে থাকিব?"

রাও সাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"কেন—আমি যেরূপভাবে থাকি।"

নরেন্দ্র। আমায় ক্ষমা করুন, আমি আজিই দেশে চলিয়া যাইতেছি।

রাও সাহেব। তা হলে আমি বড়ই বিপদগ্রস্ত হইব।

নরেন্দ্র। আপনার অন্য কোন আত্মীয় কি নাই?

রাও সাহেব। আত্মীয় অনেকই আছেন, কিন্তু আমি আমার স্ত্রীর রক্ষকস্বরূপ রাখিয়া যাইতে তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারি না।

নরেন্দ্র। তাঁহাদিগের অপেক্ষা আমি আপনার নিকট কিসে অধিক বিশ্বাসী হইলাম?

রাও সাহেব এবারও ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আপনি আমার স্ত্রীকে ভালবাসেন বলিয়া। আপনি যখন তাঁহার রূপে ও গুণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়াছেন, তখন আমার অনুপস্থিতিতে আপনিই তাঁহার উপযুক্ত রক্ষক।"

নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া রাও সাহেবের মুখের প্রতি চাহিলেন! সেই চিরপ্রফুল্ল ও সহাস্য মুখে অসন্তোষ বা বিষাদের চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাইলেন না! রাও সাহেব এই সময় পুনরায় বলিলেন—"সম্প্রতি এ অঞ্চলে বড় ডাকাতের ভয় হইয়াছে; আর আমারও একটা ধনাপবাদ আছে। আমার অন্য ধন রক্ষার ভার রঘুজী আর মোহনের উপর দিয়া যাইব। কিন্তু আমার সকল ধনের সার ধন—আমার স্ত্রীরত্নের রক্ষার ভার আপনার উপরই রহিল।"

এই কথা বলিয়া তিনি ডাকিলেন—"রঘুজী!"

তৎক্ষণাৎ একজন বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় মহারাষ্ট্রীয় বীর অভিবাদন করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রাও সাহেব তাহাকে কহিলেন—"আমি তোমায় সকল কথা বলিতেছি। মোহন ও মোহিনীকে আর ডাকিবার আবশ্যক নাই। আমি বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে অদ্যই যাইব। আমার অনুপস্থিতিতে আমার এই বন্ধুকে আমার ন্যায় তোমরা সম্মান করিও এবং যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিও।"

রঘুজী অবনতমস্তকে প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। এই সময় রমাবাইও তথায় আসিয়া উপস্থিত। রাও সাহেব হাসিতে হাসিতে স্ত্রীর নিকট

বিদেশগমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। রমাবাইও হাসিতে হাসিতে সম্মতিপ্রদান করিলেন; সে সম্বন্ধে কোনরূপ আপত্তিও করিলেন না!

এই সকল দেখিয়া নরেন্দ্রনাথের বিস্ময়ের সীমা ছিল না; নরেন্দ্রনাথ তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—বিশ্বনাথ রাও মানুষ না দেবতা?

—০⊂⊃০—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ তিন দিবস হইল, বিশ্বনাথ রাও বিদেশযাত্রা করিয়াছেন। এই তিন দিবস রমাবাই স্বামীর আজ্ঞামত সর্ব্বদাই নরেন্দ্রনাথের নিকট থাকিতেন, মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার সঙ্গছাড়া হইতেন না। এখন নানারূপ বেশভূষা দ্বারা তিনি যেরূপ দৈহিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন? তাহা দেখিয়া স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বিস্মিত হইলেন!

বিলাসবতীও অনেক সময় তাঁহাদের সঙ্গে থাকিত; কিন্তু থাকিলেও তাঁহাদের রহস্যালাপে যোগদান করিতে পারিত না; সে সময় বিলাসবতী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বিষণ্ণভাবে অধোবদনে থাকিত। রমার সে দিকে কোন লক্ষ্য ছিল না, বরং এরূপস্থলে একটি ক্ষুদ্র হাসির লহরী তুলিয়া আহ্লাদে

বিহ্বোর হইয়া যাইতেন। নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি কিন্তু বিলাসবতীর ঈদৃশ ব্যবহারে সর্ব্বদাই আকৃষ্ট হইত। তত্রাচ নরেন্দ্র ইহার কারণ কিছুই অনুমান করিয়া স্থির করিতে পারিতেন না। ক্রমে ক্রমে বিলাসবতী তাঁহাদের সঙ্গ যেন ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিত; কিন্তু গোপনে থাকিয়া আবার তাহাদের কার্য্য-কলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও রাখিত। বিলাসবতীর এ ভাব কেন?

একদিন বৈকালে যখন রমাবাই নরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রতীরে বেড়াইতে যাইবেন, তখন বিলাসবতীকেও তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে বিশেষ অনুরোধ করা হইল। কিন্তু বিলাসবতী কোন ক্রমেই তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল না। তার পর রমাবাই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন সেখানে বেড়াইতেছেন, তখন হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া নরেন্দ্রনাথ দীপালোকে বিলাসবতীকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন—"ঐ যে বিলাসবতী আমাদের পশ্চা-তেই আসিতেছে!"

রমাবাই পশ্চাতে না ফিরিয়াই বলিলেন—"এতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? সমুদ্রতীরে বেড়াইতে সকলেরইত সমান অধিকার।"

নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"আমি সে ভাবে বলি-তেছি না। এত অনুরোধেও তখন আমাদের সঙ্গে কোন মতে আসিল না, কিন্তু তাহার পর হঠাৎ কেন আসিল—সেই জন্যেই বলিতেছি।"

রমা বিদ্যুৎ কটাক্ষে একবার নরেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"মানুষ মাত্রেই স্বাধীন; যাহার যা ইচ্ছা, সে তৎক্ষণাৎ

তা করিতে পারে; বিলাসবতীর তখন ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং আমরা কিরূপে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিব? তার পর যখন তাহার ইচ্ছা হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ সে এখানে আসিয়াছে, তখন তাহাকে কে বাধা দিতে পারে?”

তার পর সেইরূপ বিদ্যুৎ কটাক্ষের সহিত ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—“আপনারা বাঙ্গালী কিনা, তাই বোধ হয় স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা স্বীকার করেন না! কিন্তু আমাদের বিশ্বাস স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষাও স্বাধীন। কারণ, পুরুষেরা অন্য কাহার অধীন না হইলেও স্ত্রীলোকের অধীন।”

নরেন্দ্রনাথ একটু বিস্মিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন—“কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আপনি ও কথা বলিতে পারেন না! সকল দেশের বিবাহিতা স্ত্রীলোক মাত্রেই স্বামীর অধীন।”

রমাবাই পুনরায় বৈদ্যুতিক হাসি হাসিতে হাসিতে বলিলেন —“আপনার ইহা ভ্রম। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা স্বামীর নাই। তা থাকলে আমি কি আপনার ন্যায় একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে এই সমুদ্রতীরে বেড়াইতে পারি?”

নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া তৎক্ষণাৎ রমার মুখের প্রতি চাহিলেন। কিন্তু চাহিয়া কি দেখিলেন? আবার কি দেখিবেন? সেই কটাক্ষ আর সেই বৈদ্যুতিক হাসি! নরেন্দ্রনাথের মাথা ঘুরিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে তিনি একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—“বিলাসবতী কি গোপনে আমাদের অনুসরণ করিতেছে না কি।”

রমা বাই এবার যেন এক ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিলেন—"বিলাসবতীর মনের কথা আমি কিরূপে জানিব? তবে আপনি সে জন্য ভীত হইয়াছেন কি না—তা জানিবার আমার আবশ্যক আছে।"

তার পর পুনরায় মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন—"বাঙ্গালী বীর যে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের ভয়ে অনেক সময় অস্থির হয়—এ সংবাদ আমি রাখি।"

নরেন্দ্রনাথ ত অবাক্! তাঁহার প্রাণের ভিতর এই সময় যে কি হইতেছিল—তিনি নিজেই তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন না, তা আমরা বর্ণনা করিব কি? কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে অগ্রে অগ্রে গৃহের দিকে ফিরিলেন। রমাবাই এই সময় হাসিতে হাসিতে পশ্চাৎ হইতে বলিলেন—"অসহায়া স্ত্রীলোককে পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া যাওয়া বীরপুরুষের কার্য্য বটে! আমার স্বামী যথার্থই একজন উপযুক্ত বীর পুরুষের হস্তে আমার রক্ষার ভার দিয়া গিয়াছেন!"

কিন্তু নরেন্দ্রনাথ সে বিদ্রূপের কোনরূপ উত্তর করিতে সাহসী হইলেন না। কম্পিতহৃদয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা ধীরে ধীরে অগ্রে অগ্রেই চলিলেন। এতক্ষণ নরেন্দ্রনাথের মনে যে প্রফুল্লতা ছিল, সমুদ্রতীরের এই ঘটনায় হঠাৎ সে প্রফুল্লতা কোথায় অন্তর্হিত হইল। সে দিন রাও সাহেবের বাড়ীতে পৌঁছিয়াই শারীরিক অসুস্থতা জানাইয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট শয়নগৃহে গিয়া শয়ন করিলেন। সে সময় এরূপ অন্যমনস্ক যে, গৃহের দরজা পর্য্যন্ত বন্ধ করিতেও ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় হঠাৎ তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গের পর তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন—একজন স্ত্রীলোক তাঁহার শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণনয়নে তাঁহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে!" নরেন্দ্রনাথ বিস্মিতনয়নে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে স্ত্রীলোককে চিনিতে পারিলেন। সে স্ত্রীলোক অন্য কেহ নহে—বিলাসবতী। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"বিলাসবতী! তুমি এত রাত্রে আমার শয়নঘরে কেন?"

বিলাসবতী একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"আপনার শরীর অসুস্থ বলিয়া সংবাদ লইতে আসিয়াছি।"

নরেন্দ্রনাথ তখন আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"কর্ত্রী ঠাকুরাণী কি তোমায় সে সংবাদ লইতে পাঠাইয়াছেন?"

বিলাসবতী পুনর্ব্বার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"কর্ত্রী না পাঠাইলে কি আমায় সে সংবাদ লইতে নাই? আপনি আমার দেশের লোক—এ গৃহের কর্ত্রী অপেক্ষা আমি আপনার বেশী আত্মীয়।"

নরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ ব্যগ্রভাবে বলিলেন—"কিন্তু তথাচ এরূপ গভীর রাত্রে আমার শয়নগৃহে তোমার আসা উচিত হয় নাই। আমাদের দেশে এরূপ ব্যবহার বিশেষ নিন্দার কথা। বিলাসবতী, তুমি শীঘ্র তোমার গৃহে যাও।"

বিলাসবতী তৎক্ষণাৎ উদ্ধতভাবে বলিল—"আমরা ব্রাহ্মিকা। নিশঙ্কভাবে পুরুষের নিকট যাওয়া আমাদের দেশের আচার বিরুদ্ধ হইলেও আমাদের সমাজ বিরুদ্ধ নয়।"

নরেন্দ্রনাথ বিরক্তভাবে তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"আমি তোমার

দেশবাসী হইলেও যখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের মতের মিল্ নাই, তখন এরূপভাবে আমার শয়নগৃহে আসা তোমার ভাল কাজ হয় নাই।”

বিলাসবতী একবার বঙ্কিমকটাক্ষে নরেন্দ্রনাথের প্রতি চাহিয়া সহাস্যবদনে বলিল—“মনের মিলন হইলে ধর্ম্মের মিল্ আপনা হইতে হইবে।”

নরেন্দ্রনাথ বিস্মিতনেত্রে বিলাসবতীর মুখের প্রতি চাহিলেন! বিলাসবতী সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল কি না জানি না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বলিল—“নরেন্দ্র, আর আমি তোমার কাছে কোন কথা গোপন করিব না। আমি তোমায় দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ তোমার প্রতি অনুরাগিনী হইয়াছি। আমি তোমার বিনা সম্মতিতেই আমার মন, প্রাণ, রূপ, যৌবন সমস্তই তোমায় অর্পণ করিয়াছি। নরেন্দ্র, এখন তুমি আমার। আমার সম্মুখ থেকে তোমায় কাড়িয়া লয়—কাহার সাধ্য?”

নরেন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিলেন! মুহূর্ত্তের মধ্যে বিলাসবতীর পূর্ব্ব আচরণের সকল কথা এই সময় তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। এইবার তিনি তাহার সেরূপ আচরণের কারণ সমস্তই বুঝিতে পারিলেন—সে কথা বুঝিতে পারিয়া ঘৃণায় ও লজ্জায় নরেন্দ্রনাথ প্রথমে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন—“বিলাসবতী,—”

তৎক্ষণাৎ নরেন্দ্রনাথের কথায় বাধা দিয়া বিলাসবতী বলিল—“নরেন্দ্র, এখন হইতে আমায় শুধু ‘বিলাস’ বলিয়া ডাকিও।”

নরেন্দ্রনাথ পুনরায় আরম্ভ করিলেন—“তোমার মনের

ভাব যখন এরূপ জঘন্য, তখন আর তোমায় আমার শয়নগৃহে থাকিতে দিতে পারি না। তুমি ইচ্ছা করিয়া না যাইলে আমি তোমায় এ গৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিব। আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিও না। কর্ত্রী ঠাকুরাণী জানিতে পারিলে কি মনে করিবেন!"

তখন বিলাসবতী দন্তে দন্ত কিড়মিড় করিয়া আরক্তলোচনে কহিল—"কি! কর্ত্রীঠাকুরাণী? কর্ত্রীঠাকুরাণী! সে আমার কে? সে জানিতে' পারিলে আমার কি করিবে? তুমি তাকে ভয় করিতে পার, কিন্তু আমি তাকে এক কড়ারও ভয় করি না। সেই মায়াবিনীইত আমার সর্ব্বনাশ করিতেছে। সে আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে—আমি তাকে ভয় করিব?"

এই কথা বলিয়া বিলাসবতী ভয়ঙ্করনাদে পুনরায় দন্তে দন্ত ঘর্ষণ আরম্ভ করিল। সে ঘর্ষণে যেন তাহার চক্ষু হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। নরেন্দ্র সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে এক ভয়ানক প্রতিহিংসা মূর্ত্তি! নরেন্দ্রনাথের সে ভয় অপসৃত হইলে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন—"তোমার নিজের মন কলঙ্কিত বলিয়া তুমি সকলেরই মন কলঙ্কিত মনে কর। তুমি পাপিষ্ঠা—আমি তোমার পাপ সংকল্প সমস্তই বুঝিয়াছি।"

পদদলিত ফনিণী যেমন রোষভরে সগর্জ্জনে ফণা বিস্তার করিয়া পথিমধ্যে উর্দ্ধে উত্থিত হয়, জ্বলন্ত প্রতিহিংসা-মূর্ত্তি বিলাসবতীও সেইরূপ অভিমানে স্ফীতবক্ষে দাঁড়াইয়া উঠিয়া সগর্ব্বে গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"কি! আমি পাপিষ্ঠা! আর

তোমার সতীলক্ষ্মী রমাবাই বুঝি বড় পুণ্যবতী! আচ্ছা আগে তার সতীপনা বাহির করিব, তার পর তোমার সঙ্গে বোঝা-পড়া!”

এই কথা বলিয়া বিলাসবতী ক্রোধভরে, সে গৃহ হইতে চলিয়া গেল। তাহার পদভরে যেন নরেন্দ্রনাথের শয়ন গৃহ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহের কপাট অর্গলা বদ্ধ করিলেন; কিন্তু তত্রাচ সে রাত্রে তাঁহার আর নিদ্রা হইল না। সমস্ত রাত্রি চিন্তা করিতে লাগিলেন—“বিলাসবতী মানবী—না মানবী আকারে দানবী?”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অনন্ত নীলাম্বুরাশি দূরে—অতি দূরে—অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতপ্রমাণ উর্ম্মিমালা একটির পর একটি আসিয়া সৈকতে ভীষণগর্জ্জনে আঘাত করিতেছে। সে ভয়ঙ্কর গর্জ্জনের শব্দে চারিদিক কম্পিত হইতেছে। সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া সম্মুখে অনন্ত নীলাম্বুরাশি আর পশ্চিমাকাশে অস্তগমনোন্মুখ দিবাকরের সুন্দর দৃশ্য ভিন্ন, আর কিছুই নয়ন-গোচর হয় না। দিবাকরের মধ্যাহ্ন যৌবনের সে তেজ এখন

আর নাই, এখন তিনি অনন্ত জলরাশির উপর মৃত্যুশয্যায় শায়িত। দেখিতে দেখিতে ধীরে—অতি ধীরে—একটু একটু করিয়া সেই অনন্ততে মিশাইতেছে, আর ভয়েং বুঝি বা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে! আবার মনে হয়—ভয় নয়, যেন অকালমৃত্যু জনিত ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর আরক্তবর্ণ হইয়াছে, এবং সেই ক্রোধেই যেন এখন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে! দিবাকর, তুমি ভয়ই কর আর ক্রোধ কর—এ সংসারের নিয়মই এইরূপ। যিনি যতই তেজী হউন না কেন, সে তেজ সমভাবে চিরকাল কখনই থাকে না। একদিন না একদিন নিশ্চয়ই সে তেজের খর্ব্ব হইয়া থাকে।

এই সময় একখানি সুসজ্জিত বজ্‌রা তীর হইতে তীরবেগে অনন্ত জলরাশির দিকে ছুটিল। সে বজ্‌রার সুসজ্জিত কামরার মধ্যে কোন আরোহী ছিল না, কিন্তু বজ্‌রার ছাদের উপর এক যুবা অধোবদনে উপবিষ্ট, আর তাহারই সম্মুখে এক যুবতী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার সেই অধোবদন নিরীক্ষণ করিতেছিল। যুবতী ক্ষণপরেই গীত আরম্ভ করিল:—

যৌবন জলতরঙ্গে ভাস্‌লো সুখের তরি।
হয় এবার কূল পাবো—নইলে ডুবে মরি॥
মনের পাল খুলে দিছি, আশার হাল ধরে আছি,
তুফান দেখে ভয় করিনে—এম্নি বাহাদুরী।

বজ্‌রাখানি তখন তীর হইতে অনেক দূরে আসিয়াছিল, সুতরাং এই অমৃতময় স্বরলহরী ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ কম্পিত করিয়া নিম্নে সেই ধীরস্থির অনন্ত জলরাশির সহিত মিশিয়া অনন্তেই যেন বিলীন হইতেছিল। আর সম্মুখস্থিত

যুবকহৃদয়ে গিয়াও তাহা ভীষণবেগে ক্রমাগত আঘাত করিতেছিল। এই সমুদ্রসৈকতের উত্তাল তরঙ্গান্দোলিত সাগরবক্ষের সহিত যুবকহৃদয়ের সৌসাদৃশ্য আছে না কি?

যুবক সাগরের গর্জ্জনের ন্যায় একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যুবতীর সেই সঙ্গীতে বাধা দিয়া বলিলেন—"এলিফ্যাণ্টাইন গুহায় আমরা কতক্ষণে পৌছিব?"

যুবতী যুবকের সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া শেষ চরণ গাহিলঃ—

"মনে কর্‌লে এক পলকে স্বর্গে যেতে পারি॥"

সে গীতের এই শেষ চরণটি শুনিয়াই যুবকের মুখ অধিকতর বিষণ্ণ হইল! তখন তাহা দেখিয়া যুবতী সে গীত বন্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—

"মানুষের রুচি কি পরিবর্ত্তনশীল! যে যুবক একদিন আমার গীত শুনিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছিল, আজ সেই যুবকের আমার গীতে এরূপ ঘৃণা জন্মিল কিরূপে? নরেন্দ্র বাবু, এখন আর আমার গীত আপনার ভাল লাগে না—নয়?"

যুবক আর কেহ নহে—আমাদের নরেন্দ্রনাথ! আর বলা বাহুল্য যে, সে যুবতী আমাদেরই—রমাবাই। নরেন্দ্রনাথ রমার কথায় একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—"অমৃতে কাহার অরুচি থাকিতে পারে? তবে কি না—"

নরেন্দ্রনাথ আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সে কথা আর তাহার মুখে আসিল না; তিনি হঠাৎ নীরব হইলেন। তখন রমাবাই আগ্রহের সহিত বলিলেন—"কি বলিতে বলিতে

চুপ করিলেন কেন? আপনার কোন কথা আমায় বলিবার থাকে বলুন।"

নরেন্দ্রনাথ তখন ধীরে ধীরে বলিলেন—"আপনি আমার যতদূর বিশ্বাসী মনে করেন, আমি কিন্তু বাস্তবিক আপনার নিকট ততদূর বিশ্বাসী নই। আপনার মন অতি সরল হইতে পারে, কিন্তু আমার মন তত সরল নয়। আপনার ন্যায় আমি আমার মনের সকল কথা আপনাকে কখন প্রকাশ করিয়া বলি নাই, এবং বলিতে পারিবও না। সে বিষয় আমায় ক্ষমা করিবেন।"

রমাবাই তখন হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন —"যিনি আমায় অবিশ্বাস করেন, আমি তাঁহার সহিত একসঙ্গে কিরূপে বসিতে পারি? সুতরাং আমি নীচে বজ্‌রার মধ্যে গিয়া বসি, আপনি এইখানেই থাকুন।"

এই কথা বলিয়া রমাবাই হাসিতে হাসিতে হেলিতে দুলিতে যেমন বজ্‌রার ছাদ হইতে নীচে নামিতে যাইবে, হঠাৎ অমনি সে ক্ষুদ্র সোপান হইতে পদস্খলিত হইয়া ভীষণবেগে সমুদ্রগর্ভে পড়িয়া গেলেন। দাঁড়ীমাঝীরা প্রথমে একটা চীৎকার করিয়া উঠিল, তার পর হতবুদ্ধি হইয়া রহিল! তাহাদের সে চীৎকার শেষ হইতে না হইতেই নক্ষত্রবেগে নরেন্দ্রনাথ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ উভয়েরই আর কোন চিহ্ন দেখা গেল না। কিছুক্ষণ সেই স্তম্ভিত দাঁড়ীমাঝীরা রুদ্ধশ্বাসে হতাশনয়নে সেই তরঙ্গ তাড়িত ভীষণ অস্থির জলরাশির প্রতি চাহিয়া রহিল! হায় এখনও উভয়ের কোন চিহ্নই নাই! তবে উপায়?

হঠাৎ এই সময় দূরে সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে কি যেন ভাসিয়া উঠিতেছে দেখা গেল। তখন তীরবেগে সেই দিকে বজ্‌রা ছুটিল। ঐ না নীলাম্বুরাশির মধ্যে হঠাৎ একটি পদ্মফুল ফুটিয়াছে? একটি কেন এ যে একত্রে দুইটি। দেখিতে দেখিতে সেই কমলদ্বয় ভাসিতে ভাসিতে বজ্‌রার দিকে আসিতে লাগিল, আর সেই বজ্‌রাও যথাসাধ্য সেই দিকেই চলিতেছিল। মুহূর্ত্ত পরেই নাবিকেরা সবিস্ময়ে দেখিল—উহা কমলদ্বয় নহে, উহা তাহাদেরই সমুদ্রমগ্ন আরোহীদ্বয়!

নরেন্দ্রনাথ অতি সাবধানে প্রথমে রমাবাইকে বজ্‌রার উপর তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু বজ্‌রার নিকটবর্ত্তী হইলে রমাবাই নরেন্দ্রনাথের বিনা সাহায্যেই তৎক্ষণাৎ বজ্‌রার উপর অতি সুন্দর কৌশলে উঠিয়া বসিলেন। নরেন্দ্রনাথ কিন্তু সেরূপ কৌশলে এবং তত সহজে সেই অস্থির সমুদ্রবক্ষ হইতে বজ্‌রায় উঠিতে পারিলেন না। তাহা দেখিয়া নাবিকেরা বিস্মিত হইল।

নরেন্দ্রনাথ বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার মুখে এখন আর কোন কথাই নাই; রমাবাই কিন্তু এই সময় নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"আজ আপনি আমায় মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এখন আমার এ জীবনে আর কাহারও অধিকার নাই। এখন এ জীবন আপনারই জানিবেন। আমার অসংখ্য ধন্যবাদ—আর অসংখ্য—অসংখ্য—অসংখ্য জানিবেন।"

নরেন্দ্রনাথ রমাবাইয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার প্রফুল্লমুখ কমলে তখন অসীম কৃতজ্ঞতার চিহ্ন, কিন্তু অধরপ্রান্তে

তখনও অস্পষ্ট হাসির লহরী যেন বিদ্যুতের ন্যায় খেলা করিয়া বেড়াইতেছে দেখিলেন! নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বলিলেন—"আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছি, সুতরাং এতদূর ধন্যবাদের পাত্র নই। আপনার নিকট ত আমিই পূর্ব্ব হইতে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ; আজ যদি একজন নাবিক এইরূপে জলমগ্ন হইত, কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুরোধে তাহার জন্যও আমি আমার নিজের জীবনকে এইরূপ বিপদাপন্ন করিতাম।"

রমাবাই তখন বিস্মিতনেত্রে বলিল—"পূর্ব্বে আমি আপনাকে উপহাসছলে বীরপুরুষ বলিয়াছিলাম, এখন জানিলাম—বাঙ্গালীর মধ্যেও যথার্থ বীরপুরুষ আছেন। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি—আপনি একজন যথার্থ বীরপুরুষ।"

নরেন্দ্রনাথ তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আপনার এরূপ একটা ভয়ানক ভ্রম যে দূর করিতে সক্ষম হইয়াছি—ইহাই আমার এ কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার।"

তখন রমাবাইও সে হাসির উত্তরে ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"এরূপ আর্দ্র বস্ত্রে সে পর্ব্বত গুহা আজ আর দেখিতে যাইবার প্রয়োজন নাই, আজ ঘরে ফিরিয়া যাই চলুন।"

আজ্ঞা মাত্রেই নাবিকেরা তীরের দিকে বজ্‌রা ফিরাইল। তখন আকাশের পূর্ণচন্দ্র মস্তকের উপর হইতে সমুদ্র জলে নামিয়া আসিয়া আনন্দে ছুটোছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল, এবং ঊর্দ্ধের সেই অনন্ত আকাশ আর নিম্নের সেই অনন্ত জলরাশি—এই দুই অনন্ত যেন একত্রে মিশিয়া গেল। বজ্‌রা তখন তীরে আসিয়া লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রমাবাই গৃহে ফিরিয়া আসিয়াই অদ্যকার দুর্ঘটনার কথা সকলকে জানাইলেন, এবং নরেন্দ্রনাথ তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া, সকলের সম্মুখে তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিলেন। কর্ত্রীর এরূপ আকস্মিক বিপদ হইতে মুক্তির সংবাদে সকলেই আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল; কেবল বিলাসবতী মনে মনে বড়ই দুঃখিতা হইল। এ দিকে মোহন আর মোহিনী ত নাচিয়া ও গাহিয়া সকলকে মোহিত করিয়া ফেলিল। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত নানারূপ আনন্দ ও উৎসবে রাও সাহেবের গৃহ পরিপূর্ণ হইল। আজ উজ্জ্বল দীপমালা সেই সুসজ্জিত গৃহ আলোকিত করিয়াছে। নানাবিধ দেশী বিলাতী সৌগন্ধে চারিদিক আমোদিত এবং গৃহকর্ত্রীর সুমধুর স্বর্গীয় সঙ্গীতে এখন সে গৃহ যেন স্বর্গতুল্য হইয়াছে।

রাও সাহেবের গৃহের সকলেই আজ প্রফুল্লমনে এই আনন্দ ও উৎসবে যোগদান করিয়াছিল, কেবল একা বিলাসবতী আজ বিষণ্ণ! এই আনন্দ ও উৎসবের মধ্যে থাকিয়াও আজ তাহার নিরানন্দের সীমা ছিল না। তাহার মনে প্রফুল্লতার লেশ মাত্র নাই। অন্তরে বরং দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিল। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত এইরূপ আনন্দ ও উৎসব চলিল। তার পর যে যাহার নির্দ্দিষ্ট শয়ন গৃহে গিয়া সুখে নিদ্রা যাইতে

লাগিল। কিন্তু বিলাসবতীর চক্ষে আজ আর নিদ্রা নাই। তাহার শয্যা আজ শূন্য। বিলাসবতী সেই গভীর রাত্রে হৃদয়ের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ছাদের উপর বেড়াইতে ছিল। এই সময় হঠাৎ নিম্নে একবার তাহার দৃষ্টি পড়িল। বাড়ীর পশ্চাতে অন্ধকারে ৫।৬ জন লোক গোপনে কি পরামর্শ করিতেছে—তাহার বোধ হইল। কি ভাবিয়া বিলাসবতী তৎক্ষণাৎ ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া ধীরে ধীরে নিম্নে এক বাতায়নের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে তথায় দাঁড়াইয়া বিলাসবতী বাহিরে কাহাদের নিম্নলিখিতরূপ পরামর্শ শুনিতে পাইল :—

একব্যক্তি চুপি চুপি বলিতেছে—"আমি বাড়ীর চারদিক খুঁজে এলুম, ওঠ্‌বার সুবিধা ত কোথাও দেখ্‌তে পেলুম না,—এখন কি করা যায় ?"

তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তি সেইরূপ অস্পষ্টস্বরে বলিল—"এক খানা ১০।১৫ হাত মই পেলে আমি সুবিধে কর্‌তে পারি।"

এই সময় তৃতীয় ব্যক্তি বলিল—"এত রাত্রে এখানে মই কোথায় পাবো ? ভোরের সময় হলে, গ্যাস নিবুতে বেরেয়েছি বলে মই ঘাড়ে করে আন্‌তে পারি।"

চতুর্থ ব্যক্তি বলিল—"দূর শালা, ভোরের সময় কি এ কাজ হয় ?"

তার পর কিছুক্ষণ আর কাহার মুখে কোন কথা শুনিতে পাওয়া গেল না। উপরোক্ত কথোপকথন শুনিয়া ষড়যন্ত্রকারী-গণের উদ্দেশ্য বুঝিতে বিলাসবতীর বাকি রহিল না। সে উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তখন নিজের কোন উদ্দেশ্য সাধনের একটা

সঙ্কল্প বিলাসবতী মনে উদয় হইল। কিন্তু এখন বাহিরের সে কথাবার্ত্তার আর কোন সাড়াশব্দ নাই কেন? পাছে তাহারা চলিয়া যায়—এই ভয়ে বিলাসবতী আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মুখস্থ বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া চুপি চুপি বলিল—"কোন ভয় নাই, আমি তোমাদের দরজা খুলিয়া দিব; কিন্তু আমার এক উপকার করিতে হইবে।"

কিছুক্ষণ কি ভিতরে—কি বাহিরে—কাহারও মুখে কোন কথা আর শুনিতে পাওয়া গেল না; তার পর বাহিরে অস্পষ্ট কথা-বার্ত্তার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। কিন্তু বিলাসবতী সে অস্পষ্ট কথাবার্ত্তা কিছুই বুঝিতে পারিল না। বিলাসবতী তখন পুনরায় বলিল—"তোমাদের কোন ভয় নাই, আমায় বিশ্বাস কর, তা হ'লে তোমাদেরও কার্য্য সিদ্ধ হইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমারও উদ্দেশ্য সফল হইবে।"

তখন বাহির হইতে ধীরে ধীরে প্রশ্ন হইল—"তোমার উদ্দেশ্য কি?"

বিলাসবতী চুপি চুপি বলিল—"গৃহকর্ত্রীকে খুন করিয়া যাইতে হইবে। আরো যাহাকে ইচ্ছা খুন করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লইয়া যাইতে পার, কিন্তু এই বাড়ীতে একজন বাঙ্গালী যুবা আছে, তাঁহাকে নিরাপদে ছাড়িয়া দিতে হইবে। আমি কেবল তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া এ গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। এ ছাড়া আমি আর কিছুই প্রত্যাশা করি না।"

তখন সেই দস্যুগণের সর্দ্দার সঙ্গিগণের সহিত কি পরামর্শ করিয়া উত্তর করিল—"আচ্ছা, তাই হবে, কিন্তু আমরা সবর

দরজা দিয়ে যাব না ; তুমি এই পিছনের দরজা আমাদের খুলে দাও।”

প্রতিহিংসা বহ্নিতে তখন বিলাসবতীর হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। সুতরাং বিলাসবতী হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই পশ্চাতের দরজা অতি সাবধানে ধীরে ধীরে উন্মুক্ত করিল। সঙ্গে সঙ্গে এক একজন করিয়া ছয়জন দস্যুও তৎক্ষণাৎ রাও সাহেবের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। এই সময় দস্যুর সর্দারকে ত্রিতলের এক শয়নগৃহ দেখাইয়া দিয়া বিলাসবতী উর্দ্ধশ্বাসে অন্য এক শয়নগৃহের দিকে দৌড়িল। বিলাসবতী সে গৃহের দরজার সম্মুখে পৌঁছিয়াই সজোরে দরজায় আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণ পরেই ভিতর দিক হইতে কে তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। বিলাসবতী চাহিয়া দেখিল—তাহারই জীবনসর্ব্বস্ব নরেন্দ্রনাথ !

আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া বিলাসবতী নরেন্দ্রনাথকে আগ্রহের সহিত চুপি চুপি বলিল—“শীঘ্র আমার সঙ্গে চলিয়া আইস। বিলম্ব করিলে প্রাণ সংশয়। এ বাড়ীর আর কাহারও রক্ষা নাই, কেবল তুমি আর আমি নিরাপদে চলিয়া যাইতে পারিব।”

হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গের পর বিলাসবতীর মুখে এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন —“আমি তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমায় সমস্ত কথা খুলিয়া বল।”

বিলাসবতী তখন নরেন্দ্রনাথের নিকট অকপট হৃদয়ে সমস্ত প্রকাশ করিল। সে কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠি-

লেন! গৃহকর্ত্রীর জীবনরক্ষার জন্য এই সময় তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে ছুটিলেন। বিলাসবতী দৌড়িয়া গিয়া নরেন্দ্রকে টানিয়া ধরিয়া বলিল—"ওদিকে নয়—এই দিকে আমার সঙ্গে এস।"

নরেন্দ্রনাথ মুহূর্ত্তের মধ্যে বিলাসবতীকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গন্তব্যদিকে দৌড়িলেন। এই সময় রমাবাইয়ের আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণে গিয়া পৌঁছিল। সে আর্ত্তনাদে তাঁহার সাহস ও বল দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

রমার শয়নগৃহে পৌঁছিয়াই সেই গৃহের উজ্জ্বল দীপালোকে এক ভীষণ দৃশ্য তাঁহার নয়নগোচর হইল। এক বিকটাকার ভয়ঙ্কর দস্যু শাণিত তরবারিহস্তে রমার প্রাণসংহারে উদ্যত, আর প্রাণভয়ে ভীতা রমার আর্ত্তনাদে সে গৃহ কম্পিত। সে দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়া আর সেই আর্ত্তনাদ স্বকর্ণে শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ কি স্থির থাকিতে পারেন? ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় এক লম্ফে তখন সেই দস্যুর উপর পড়িলেন। নরেন্দ্র পশ্চাৎ-দিক হইতে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়াও সেই দস্যুর হস্ত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইতে সক্ষম হইলেন না। কিছুক্ষণ উভয়ের মধ্যে এক প্রকার মল্লযুদ্ধ চলিতে লাগিল। এমন সময়ে নিরস্ত্র নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ সেই দস্যুর অস্ত্রে আঘাত প্রাপ্ত হইলেন, সে আঘাত সাংঘাতিক না হইলেও তাঁহার সর্ব্বশরীর রুধিরাক্ত হইল। এই সময় রমবাই কোথা হইতে এক তীক্ষ্ণ তরবারিহস্তে নরেন্দ্রনাথের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলেন। তখন তাহার আলুলায়িত কেশ, রোষকষায়িত চক্ষু, আর দৃঢ়মুষ্ট্যাবদ্ধ ঊর্দ্ধোত্তলিত তরবারি দেখিলে

কাহার প্রাণে না ভয়ের সঞ্চার হয়? সুতরাং বীর রমণীর এই বীরোচিত কার্য্য দেখিয়া নরেন্দ্রনাথের বীরহৃদয় দ্বিগুণ উৎসাহিত হইল।

এমন সময় রুধিরাক্ত কলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে রঘুজীও তথায় আসিয়া পৌছিল—সঙ্গে সঙ্গে মোহন ও মোহিনীও আসিল। রঘুজী যে এতক্ষণ নিশ্চিন্ত ছিল না, তাহাকে দেখিয়া সে কথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। রঘুজী সেই গৃহে প্রবেশ করিয়াই, তীরের ন্যায় দৌড়িয়া গিয়া সেই দস্যুকে আক্রমণ করিল, এবং এক আঘাতেই তাহার জীবনসংহার করিতে পারিত, যদি এই সময় স্বয়ং রমাবাই উচ্চৈঃস্বরে রঘুজীকে তাহার প্রাণ সংহার করিতে নিষেধ না করিতেন। তখন সকলে একত্র হইয়া সেই দস্যুকে ধৃত করা হইল। দস্যু পরাজিত ও ধৃত হইয়া সেরূপ ক্ষুব্ধ হইল না, কারণ একজন স্ত্রীলোকের সাহস ও কার্য্য দেখিয়া তখন সে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল!

রমাবাই প্রথমেই সেই দস্যুকে প্রশ্ন করিলেন—"তুমি আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই আমার প্রাণ সংহারে উদ্যত হইয়াছিলে কেন? তোমার এ ডাকাতির উদ্দেশ্য আমার জীবন নষ্ট করা—কি আমার ধনরত্ন অপহরণ করা?"

একজন ভুবনমোহিনী রূপযৌবনসম্পন্না কোমলাঙ্গী অবলার মুখে এরূপ অকুতোভয়ের সহিত প্রশ্ন শুনিয়া দস্যুর প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল! দস্যু বিস্মিতনেত্রে সেই উন্নতবদনা সিংহীর ক্রোধরক্তিম মুখকমলের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল! তখন সে প্রশ্নের আর কোন উত্তর দিতে

পারিল না। রমাবাই পুনরায় বলিলেন—"সমস্ত কথা সত্য বলিবে, সত্য বলিলে তোমায় ক্ষমা করিব।"

এই কথা কয়েকটি এরূপ তেজের সহিত উচ্চারিত হইল যে, দস্যুর আর কোন কথা গোপন করিতে সাহস হইল না। সে তখন অকপটহৃদয়ে বিলাসবতী সম্বন্ধীয় সকল কথাই প্রকাশ করিয়া বলিল। সে সকল কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে রমা বাই দস্যুকে তৎক্ষণাৎ মুক্তিদান করিলেন। দস্যু উর্দ্ধশ্বাসে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিবার সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য একবার রমা বাইয়ের মুখের প্রতি চাহিল। কিন্তু তখন রমাবাই হাস্যময়ী, সুতরাং তাহার পূর্ব্বমূর্ত্তির কোন চিহ্নই সে এখন আর দেখিতে পাইল না।

তার পর রমাবাই নগেন্দ্রনাথের ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া অতি যত্নের সহিত কি ঔষধ দিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই স্থান বাঁধিয়া দিলেন। এইবার রঘুজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার সংবাদ কি রঘুজী?"

রঘুজী বিনীতভাবে অভিবাদন করিয়া যোড়হস্তে নিবেদন করিল—"মাজী, আপনার আশীর্ব্বাদে রঘুজী কখন কাহারে নিকট পরাস্ত হয় নাই; তবে একাকী ৫।৬ জন দস্যুর সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম। উপরে যে একজন কোথা হইতে আসিয়াছে, তাত জানি না, সেই কারণ তাহাদের দূর করিয়া দিয়া উপরে আসিতে আমার কিছু বিলম্ব হইয়াছে। আজ আমার এই প্রথম অপরাধ—"

রঘুজীর কথায় বাধা দিয়া রমাবাই আগ্রহের সহিত বলিলেন—"তুমি কি আহত হইয়াছ রঘুজী?"

রঘুজী আপনার অঙ্গের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"দস্যুর রক্তে কেবল এ দেহ কলঙ্কিত হইয়াছে মাজী।"

তখন রমাবাই নরেন্দ্রনাথ, রঘুজী, মোহন আর মোহিনীকে বলিলেন—"তোমরা এখন সকলেই বড় ক্লান্ত, সুতরাং তোমরা এখন বিশ্রাম করিতে পার। তবে একটী কথা বলিয়া রাখি, দস্যুদিগের সহিত বিলাসবতীর গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথা যে আমি জানিতে পারিয়াছি, এ বিষয় বিলাসবতী যেন কোনক্রমে না জানিতে পারে।"

সে কথা শুনিয়া রঘুজী অবনতমস্তকে গৃহকর্ত্রীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিল; মোহন মোহিনীর মুখের দিকে ফাল্ ফাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। কিন্তু নির্ব্বাক নরেন্দ্র একবারেই স্তম্ভিত! তখন এই ঘটনা যেন তাঁহার স্বপ্নবৎ মনে হইতে লাগিল।

—০—০—০—
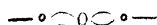
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিলাসবতীর মনের অবস্থা আমরা বর্ণনা করিতে এখন অক্ষম। তাহার বিশ্বাস সেই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের কথা নিশ্চয়ই প্রকাশ হইয়াছে; সুতরাং বিলাসবতী মনে করিয়াছিল—এইবার

নিশ্চয়ই তাহাকে এই আশ্রয় ত্যাগ করিতে হইবে। এরূপ কালসর্পিনী জানিয়া কে তাহাকে গৃহে রাখিবে? কিন্তু নরেন্দ্রকে ছাড়িয়া বিলাসবতী স্বর্গে যাইতেও প্রস্তুত নহে। নরেন্দ্রকে যে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে—ইহাই বিলাসবতীর মর্ম্মান্তিক দুঃখ।

পরদিন প্রাতে রমাবাই প্রথমেই বিলাসবতীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে কোন্ সাহসে এখন সেই স্নেহময়ী আশ্রয়-দায়িনীর সম্মুখে যাইবে? সে সংবাদ পাইয়া ভয়ে বিলাসবতীর প্রাণ উড়িয়া গেল। গৃহকর্ত্রীর নিকট মুখ দেখাইবে কিরূপে? আচ্ছা—গোপনে এ গৃহ হইতে পলায়ন করিলে হয় না কি? সেরূপ পলায়নে ধৃত হইবার সম্ভাবনাও থাকিতে পারে, কিন্তু এরূপ স্থলে যে বিষপ্রয়োগে আত্মঘাতিনী হওয়াও ভাল। বিলাসবতী তাহাতেও প্রস্তুত; কিন্তু তাহা হইলে যে জন্মের মতন নরেন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। বিলাসবতী তাহা কিরূপে পারিবে? এই সময় পুনরায় মোহিনী বিলাসবতীকে লইয়া যাইতে আসিল; সুতরাং মোহিনীর সঙ্গে বিলাসবতীকে ধীরে ধীরে গৃহকর্ত্রীর নিকট যাইতে হইল। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি যেরূপ ঘাতক কর্ত্তৃক বধ্যভূমিতে আনীত হয়, মোহিনী কর্ত্তৃক বিলাসবতীও সেইরূপ ভাবে রমাবাইয়ের নিকট আনীত হইল। বিলাসবতী সেখানে আসিয়া দেখিল যে, রমাবাই ও নরেন্দ্রনাথ একত্রে বসিয়া কি কথোপকথন করিতেছে! সে দৃশ্য দেখিয়া বিলাসবতীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, বিলাসবতী মনে করিল—উভয়ে নিশ্চয় তাহারই বিষয় কথোপকথন করিতেছে! সুতরাং

কম্পিতহৃদয়ে অধোবদনে কোন ভয়ঙ্কর গুরুতর অপরাধে অপরাধীর ন্যায় বিলাসবতী তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন রমাবাই দৌড়িয়া আসিয়া বিলাসবতীর সেই অধোবদন উন্নত করিয়া সস্নেহবচনে বলিলেন—"বিলাস, তোমার মুখ এত বিষণ্ণ কেন? বোধ হয়—গত রাত্রের ডাকাতের ভয়ে তুমি নিদ্রা যাইতে পার নাই। আমি রাত্রে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়া বড় অন্যায় কার্য্য করিয়াছি।"

রমার এই সস্নেহসম্ভাষণ বিলাসবতীর হৃদয়ে যেন শেলসম বিদ্ধ হইতে লাগিল। তবে গত রাত্রের তাহার সেই ভয়ঙ্কর কার্য্যের কোন কথা রমা জানিতে পারে নাই, ইহার জন্য নরেন্দ্রের উপর বিলাসবতী বড়ই সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু বিলাসবতীর মুখে এ সময় কোন কথা আসিল না; বিলাসবতী কেবল নরেন্দ্রনাথের প্রতি এক বঙ্কিমকটাক্ষ করিলেন। সে কটাক্ষের অর্থ নরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিয়া সহাস্যে বলিলেন—"বিলাসবতী, তোমার কোন ভয় নাই, সে ডাকাতেরা আমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই, বরং তাহারা উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছে।"

এই সময় রমাবাই বলিলেন—"সে কেবল নরেন্দ্র বাবুর অনুগ্রহে। তা না হ'লে এতক্ষণ আমার মৃতদেহ দেখিয়া শোকে তুমি আকুল হইতে। নরেন্দ্র বাবু না থাকিলে আমার ধনরত্ন ত দূরের কথা, আমার জীবন পর্য্যন্ত রক্ষা হইত না। আমি কিরূপে আমার হৃদয়ের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না।"

স্বয়ং নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে এই সকল কথা শুনিয়া বিলাস-

বতীর অন্তরে পুনরায় এক ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা অনুভব হইতে লাগিল। কিন্তু এই সময় সে মুখে বলিল—"নরেন্দ্র বাবুর নিকট আমরা সকলেই ঋণী ; সে ডাকাতেরা নিশ্চয়ই আমাদেরও প্রাণ সংহার করিত।"

রমাবাই তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"নরেন্দ্র বাবু, বিলাসবতীও আপনাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিতেছে। আপনি আমাদের উভয়ের নিকটই ধন্যবাদের পাত্র। আপনার এই বীরত্বের কথা অদ্যই আমি ডাকযোগে আমার স্বামীকে পত্র লিখিব।"

এই পত্র লিখিবার কথায় বিলাসবতীর মনে হঠাৎ কি কথা উদয় হইল। তখন বিলাসবতী ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আসিল। তথায় অনেকক্ষণ নির্জ্জনে বসিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিল। চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ তাহার সেই বিষন্ন মুখ প্রফুল্ল হইল। তখন বিলাসবতী রাও সাহেবকে এক পত্র লিখিতে বসিল। সে পত্রে নরেন্দ্রনাথ ও রমা বাইয়ের চরিত্র সম্বন্ধে এক ভয়ঙ্কর কলঙ্কের কথা লিখিত হইল, এবং গোপনে গৃহে আসিয়া স্বচক্ষে আরোপিত কলঙ্কের প্রমাণ দেখিতেও অনুরোধ করা হইয়াছিল। পত্র লেখা শেষ হইলে বিলাসবতী তাহার কোন বিশ্বস্ত ভৃত্যের দ্বারা সে পত্র তৎক্ষণাৎ ডাকঘরে প্রেরণ করিল। তখন বিলাসবতীর অধরপ্রান্তে বজ্রাঘাতের পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণপ্রভার ন্যায় পুনরায় ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল!

—০*০—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাত্রিকাল। নগরের কোলাহলের শব্দ এখন আর বড় শ্রুতিগোচর হয় না। তবে মধ্যে মধ্যে দ্রুতগামী শকটের শব্দ আর পুলিশ কর্ম্মচারীর কর্কশ কণ্ঠস্বর রাত্রির সে গম্ভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। দূরে—অস্পষ্ট সমুদ্র গর্জ্জনের শব্দও মধ্যে মধ্যে তাহার সঙ্গে মিশিতেছিল। এমন সময় নিকটস্থ গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করিয়া বারটা বাজিয়া গেল। পর মুহূর্ত্তেই নরেন্দ্রনাথের শয়নকক্ষের দেয়ালস্থ ঘড়িতেও ঠুং ঠুং ঠুং করিয়া বারটা বাজিল। তখনও নরেন্দ্রনাথ নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। তখনও তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর আন্দোলন চলিতেছিল। কোথা হইতে এক অনিবার্য্য চিন্তাস্রোত আজ তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি নিদ্রা যাইবার জন্য এখন প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছিলেন, কিন্তু আজ আর তাঁহার চক্ষে নিদ্রা নাই। 'প্রণয় বা কৃতজ্ঞতা?'—এই বিস্ময়-জনক প্রশ্ন থাকিয়া থাকিয়া ক্রমাগত তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইতেছিল!

নরেন্দ্রনাথ যতই সেই অশান্তিজনক চিন্তাকে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ততই পুনঃপুনঃ তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে প্রশ্ন হইতে লাগিল—"প্রণয় না কৃতজ্ঞতা?" এইবার নরেন্দ্রনাথ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন যে, এরূপ প্রশ্নকে আর হৃদয়ের মধ্যে স্থান দিবেন না; কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সেই হৃদয় হইতেই প্রশ্ন হইল—"প্রণয় না কৃতজ্ঞতা?" তাহার পর

নরেন্দ্রনাথ সজোরে স্বহস্তে আপনার হৃদয়ে এক মুষ্ট্যাঘাত করিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে আঘাতেরও প্রত্যাঘাত হইল—"প্রণয় না কৃতজ্ঞতা ?" নরেন্দ্রনাথ তখন উন্মত্তের ন্যায় শয্যায় আছাড় খাইয়া পড়িয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন—সে ক্রন্দনেরও প্রতিধ্বনি হইল—"প্রণয় না কৃতজ্ঞতা ?"

এইরূপে নরেন্দ্রনাথ আপনার হৃদয়ের আবেগে অস্থির হইয়া শয্যায় পড়িয়া যখন ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন, এমন সময় একজন স্ত্রীলোক কপাট ঠেলিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। সে গৃহে তখনও আলো জ্বলিতেছিল, সেই আলোকে বিস্মিতনেত্রে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সে স্ত্রীলোক অন্য কেহ নয়, স্বয়ং গৃহকর্ত্রীরই একজন অতি প্রিয় পরিচারিকা মোহিনী। মোহিনী গৃহে প্রবেশ করিয়াই তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। নরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি সে পত্র উন্মোচন করিয়া প্রথমেই আগ্রহের সহিত স্বাক্ষরের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন—স্পষ্ট উজ্জ্বল অক্ষরে সে পত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে—"তোমারই লজ্জাহীনা রমা বাই!" সেই অক্ষর পড়িয়াই তাহার প্রাণ গুর্ গুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তখন তিনি কম্পিতহৃদয়ে নিম্নলিখিত পত্রখানি পড়িলেন :—

প্রিয়তম নরেন্দ্র,

আজ স্ত্রীসুলভ লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া তোমায় এই পত্র লিখিতে বসিলাম ; কারণ আমার অন্য সকল চেষ্টাই বৃথা হইয়াছে। স্ত্রীলোকে আর কত স্পষ্ট করিয়া মুখে বলিতে পারে ? ভালবাসার ভাষা ইঙ্গিতে বুঝিতে হয়। আমি তোমায় ভালবাসিয়া প্রাণের ভিতর যে যন্ত্রণাভোগ করিতেছি, তাহা

পত্রের দ্বারা জানাইতে অক্ষম। আমার এ অতৃপ্ত বাসনা কি পরিতৃপ্ত হইবে না? যদি এ ক্ষুদ্র হৃদয়নিহিত অনন্ত ভালবাসার বিনিময়ে তোমার বিশালহৃদয়ের কণামাত্রও প্রতিদান পাই, তবে স্বর্গসুখ অনুভব করিব।

এই পত্রবাহিকার নিকট আমার কোন কথা গোপন নাই। মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া ইহার সঙ্গে আমার শয়নগৃহে আসিলে দাসী কৃতার্থ হইবে। ইতি—

তোমারই লজ্জাহীনা
রমাবাই।

পত্র পাঠ শেষ করিয়া নরেন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হইয়া অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার প্রাণের ভিতর এই সময় যে এক ভয়ঙ্কর আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল, মুখমণ্ডলে তাহার কতক অংশ মাত্র প্রকাশ পাইতেছিল। নরেন্দ্র কি করিবেন —অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়াও কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। শেষে পরিচারিকার সহিত রমার শয়নগৃহে যাওয়াই স্থির করিলেন। তখন মোহিনীকে শুষ্ককণ্ঠে অস্পষ্ট কথায় বলিলেন— "তুমি অগ্রে অগ্রে চল, আমি তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইব।"

মোহিনী অগ্রে অগ্রেই চলিল, আর ভীতমনে কম্পিতহৃদয়ে নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

এই সময় অন্ধকারে দাঁড়াইয়া একজন স্ত্রীলোক একজন পুরুষকে নরেন্দ্রনাথের সেই অনুসরণ দেখাইতেছিল। নরেন্দ্রনাথ যখন নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে চোরের ন্যায় অন্ধকারের মধ্যে রমাবাইয়ের শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন সেই

স্ত্রীলোক বলিল—"এখন নিজের চক্ষে দেখিয়া আমার কথায় আপনার বিশ্বাস হইল কি?"

সেই পুরুষ তখন সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"আর কিরূপে অবিশ্বাস করিতে পারি? কিন্তু এখনও এ ঘটনা যেন আমার স্বপ্ন বলিয়া ভ্রম হইতেছে।"

স্ত্রীলোক। গৃহের দরজা এখনও বন্ধ হয় নাই। অন্ধকারে দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিলে সে ভ্রমও দূর হইতে পারে।

পুরুষ। ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে, জানি না এখনি কি একটা বিভ্রাট ঘটিবে। বিলাসবতী, তুমি সঙ্গে না থাকিলে, আমি রমার শয়নগৃহের সে দৃশ্য দেখিতে পারিব না সুতরাং তোমায় আমার সঙ্গেই থাকিতে হইবে।

সে স্ত্রীলোক আমাদেরই বিলাসবতী। বিলাসবতী তখন মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—"আমি আপনার সঙ্গেই থাকিব।"

সেই পুরুষ তখন ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল—"শীঘ্র চল, আর বিলম্ব করিও না।"

বলা বাহুল্য পুরুষ অন্য কেহ নহে, রমা বাইয়ের স্বামী, স্বয়ং বিশ্বনাথ রাও।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রনাথ সে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—গৃহের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে, এবং তাহা অপেক্ষা উজ্জ্বল রূপের জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া তাঁহারই অভ্যর্থনার জন্য

বাই অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আজ রমা এক অপূর্ব্ব মনমোহিনীবেশে ভূষিতা। নরেন্দ্রনাথ সে গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র আগ্রহের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া রমা এক বহুমূল্য আসনে তাঁহাকে বসাইলেন। তার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"এতদিনের পর আজ আমার মনোবাঞ্ছাপূর্ণ হইল।"

কিন্তু নরেন্দ্রনাথের মুখে কোন কথাই নাই। গৃহের সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রথমে তিনি মোহিত হইয়া গেলেন, তার পর সে গৃহের গৃহকর্ত্রীর সৌন্দর্য্যের কথা আর কি বলিব? বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে আজ আবার সেই সৌন্দর্য্যকে যেন পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত করিয়াছে। নরেন্দ্রনাথের সম্মুখে রমা এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি প্রকাশে মোহিনীশক্তি বিস্তার করিয়া ভিন্ন আসনে উপবিষ্ট হইল।

এইবার রমা পুনরায় আরম্ভ করিলেন—"আমি জানি বাঙ্গালী যুবকেরা রমণীসমাজে আসিতে স্বভাবতই লজ্জিত হয়; আর রাত্রিকালে গোপনে কোন ভদ্র মহিলার শয়নগৃহে যে আসিতে পারে, এ বিশ্বাস আমার মনে স্থান পায় নাই। সেই কারণ আপনার আগমনে আমি আশাতীত ফললাভ করিয়াছি। আনন্দে বিহ্বল হইয়া যদি অভ্যর্থনার কোনরূপ ত্রুটি করি, সে অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।"

নরেন্দ্রনাথ এই সময় কি কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে অস্পষ্ট কথা বুঝিতে পারা গেল না। তাঁহার মুখ বিবর্ণ, সর্ব্বশরীর বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মে সিক্ত হইতেছিল। নরেন্দ্রনাথ অধোবদনে বসিয়া রহিলেন।

কি জানি কেন, তাহা দেখিয়া রমাবাইয়ের মুখকমলও

এখন ক্রমে বিবর্ণ হইতে আরম্ভ করিল। বিবর্ণ মুখে ক্ষীণ স্বরে রমা এইবার বলিলেন—"আপনি অত দূরে এইরূপ অধোবদনে থাকিলে আমি বড় দুঃখিত হইব। আমি স্ত্রীলোক হইয়া নিলর্জ্জভাবে, আপনাকে পত্র লিখিতে পারিলাম, আর আপনি পুরুষ হইয়া ওরূপ লজ্জা করিলে চলিবে কেন? আপনার বীরত্ব আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সুতরাং বাঙ্গালী হইলেও আর আপনাকে ভীরু বলিতে পারি না। তবে কিনা—এরূপ স্থলে আপনার ন্যায় বীরপুরুষের যে সাহস কোথায় গেল? ,এখানে আপনি যেন নায়িকা আর আমি যেন নায়ক। এখন আমি নায়ক হইয়া আপনার কাছে যাইব—না আপনি নায়ক হইয়া আমার কাছে আসিবেন?"

এইবার নরেন্দ্রনাথ অতি কষ্টে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"না,—না—আপনি যেখানে আছেন সেইখানে থাকুন।"

রমাবাই। আচ্ছা, তাতে আমার আপত্তি নাই। তবে আমি যে কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব, আপনি তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর আমায় দিবেন। আমার প্রথম প্রশ্ন এই—আমার স্বামী তাঁহার অনুপস্থিতিকালে আপনাকে আমার রক্ষকস্বরূপ রাখিয়া বিদেশ গিয়াছেন। এখন আমার জাতি, ধর্ম্ম, মান, সম্ভ্রম সমস্তই আপনার উপর নির্ভর করিতেছে, এরূপস্থলে আমার প্রতি আসক্ত হওয়া কি আপনার কর্ত্তব্য হইয়াছে?

এই প্রশ্ন শুনিয়া নরেন্দ্রনাথের সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। তখন রমা তাহা বুঝিতে পারিয়া আরম্ভ করিলেন—"আপনি আমার কথায় ঐরূপ শিহরিয়া উঠিবেন না; কারণ সে জন্য আমি তিরস্কার করিতে আপনাকে এখানে ডাকি নাই। আমি

আপনার হৃদয়লুক্কায়িত প্রণয়ের বিষয় যে দিন জানিতে পারিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমি অধীরা হইয়া পড়িয়াছি ; কারণ আমার এ হৃদয়ও শূন্য নয়। কণামাত্র ভালবাসার পরিবর্ত্তে এখানে অনন্ত ভালবাসা পাইতে পারিবেন।"

এই কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে রমা লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। সে লজ্জার সহিত যেন আরো কিছু মিশ্রিত ছিল। তাহা না হইলে ঐ আরক্তিম মুখকমল আবার এরূপ পাণ্ডুবর্ণ হইবে কেন ?

রমাবাই এবার সলজ্জভাবে বলিতে আরম্ভ করিল—"আমার প্রতি আপনার ভালবাসা পরীক্ষা করিবার জন্যই সে দিন আমি বজরা হইতে সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছিলাম। আমি—"

এই সময় রমার কথায় বাধা দিয়া বিস্মিত নরেন্দ্রনাথ বলিলেন---"তবে কি আপনি সে দিন ইচ্ছা করিয়া সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছিলেন ?"

রমা। ইচ্ছা করিয়াই সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছিলাম। আমি বাল্যকাল হইতেই সন্তরণপটু, আপনি সে দিন আমায় রক্ষা না করিলেও আমি অনায়াসে রক্ষা হইতে পারিতাম। এই আমার প্রথম পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় আপনি সম্পূর্ণ জয়ী হইলেন, আর আমি ও আপনাকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা দিতে গিয়া ভালবাসা দিয়া ফেলিলাম। তার পর সে দিন রাত্রের ডাকাতির ঘটনায় আমি আপনার কার্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছি। সে ঘটনা কিছু আর আমার ইচ্ছায় ঘটে নাই। সেই রাত্রের ঘটনা হইতেই আমি আপনার দাসী। সে কথা আকার ইঙ্গিতে যত দূর প্রকাশ করিতে হয়, তাহা আমি করিয়াছি, কিন্তু

তাহাতেও কোন ফল না পাইয়া, অবশেষে লজ্জার মাথা খাইয়া আপনাকে পত্র লিখিতে হইয়াছে। কিন্তু পত্র লিখিয়া যে আশানুরূপ ফললাভ করিয়াছি—ইহাই আমার আনন্দের কারণ। আমি আপনাকে ভালবাসি—”

এই সময় রমার কথায় পুনরায় বাধা দিয়া উন্মত্তের ন্যায় নরেন্দ্রনাথ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—“আপনি আমার সম্মুখে এরূপ কথা আর মুখে আনিবেন না। আমার সন্দেহ সত্য হইয়াছে, আর আমি আপনার ঐ সকল কথা শুনিতে ইচ্ছা করি না। আমাকে কি আপনি এত নীচ মনে করেন ?”

এই কথা বলিতে বলিতে নরেন্দ্রনাথ উন্মত্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন রমা দুঃখিতহৃদয়ে কাতরকণ্ঠে বলিলেন —“আমি দেবী নই, রক্তমাংসে নির্ম্মিতা দুর্ব্বলা রমণী মাত্র।”

নরেন্দ্র। কিন্তু আমি এতদিন আপনাকে দেবীজ্ঞানে পূজা করিয়া আসিয়াছি। আমি আপনার রূপে ও গুণে মোহিত হইয়াছি সত্য, কিন্তু পাপীর চক্ষে সে রূপ ও গুণ কখন দেখি নাই। আপনার উন্নতহৃদয় স্বামী সে কথা জানিতে পারিয়াও যখন আমার প্রতি আপনার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া গিয়াছেন, তখন আমি কি এতই বিশ্বাসঘাতক যে সেই পবিত্র বিশ্বাসকে কলুষিত করিব ? সেরূপ নীচবংশে আমার জন্ম নয়। ঐরূপ বাহিক সৌন্দর্য্যের ভিতর যে এরূপ জঘন্য নরকসদৃশ অপবিত্র কামনা লুক্কায়িত থাকিতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না। আপনি এক জনের বিবাহিতা স্ত্রী। আপনার স্বামীর ন্যায় রূপবান্ ও গুণবান্ স্বামী বোধ হয়, রমণীকূলে কাহার

অদৃষ্টে ঘটে নাই। সেরূপ স্বামীর নিকট অবিশ্বাসিনী হইতে কিরূপে আপনার প্রবৃত্তি হইল? আমি নীচ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া আপনার অনুরোধে এখন এ গৃহে আসি নাই; আপনাকে এই সকল কথা বলিতেই কেবল আসিয়াছি। অনেক সময় আপনার প্রলোভনে আমার হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল সত্য, অনেক সময় আমি আমার হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম সত্য; কিন্তু এখন আমি আমার হৃদয়ের পূর্ণ বললাভে সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছি। এখন আপনি আমার গর্ভধারিণী জননী, আর আমি আপনার সন্তান।

"ধন্য নরেন্দ্রনাথ! ধন্য নরেন্দ্রনাথ!" উচ্চৈস্বরে বলিতে বলিতে এই সময় সেই গৃহমধ্যে স্বয়ং বিশ্বনাথ রাও দৌড়িয়া আসিলেন। তাহার সঙ্গে বিলাসবতীকেও টানিয়া আনা হইয়াছিল। রাও সাহেবের এই আকস্মিক আগমনে নরেন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কিন্তু রমাবাই ভয় বা বিস্ময়ের কোন চিহ্নই প্রকাশ করিলেন না।

রাও সাহেব তখন হাসিতে হাসিতে বিলাসবতীকে বলিলেন —"কেমন বিলাসবতী, তোমার কথা কি সত্য?"

বিলাসবতী প্রথমে লজ্জায় অধোমুখী হইল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাহার মুখ হইতে বাহির হইল—"নরেন্দ্রবাবুর সম্বন্ধে আমার কথা সত্য নয় বটে, কিন্তু আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে আমার কথা সম্পূর্ণ সত্য।"

বিশ্বনাথ রাও তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"সে সম্বন্ধেও তোমার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই বাঙ্গালী যুবার চরিত্র পরীক্ষা করিবার জন্য রমাকে আমি যে সকল উপদেশ দিয়াছিলাম, রম

আমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া সেই সকল উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছে মাত্র! অবশ্য, ইহাতে আমার নিষ্ঠুরতা থাকিতে পারে, কিন্তু রমার অবিশ্বাসিনী হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই।''

রাও সাহেবের এই সকল কথায় নরেন্দ্রনাথের বিস্ময়ের সীমা ছিল না; কিন্তু সে কথা শুনিয়া বিলাসবতী তখন উর্দ্ধশ্বাসে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল!

—০○০—

নবম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে সস্ত্রীক রাও সাহেব নরেন্দ্রনাথের সহিত নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। আজ সকলেরই মন প্রফুল্ল, কাহার মনে কোন রূপ বিষাদের চিহ্ন মাত্র নাই। রমা বাইকে এখন আর অন্তরে এক ভাব, আর বাহিরে সম্পূর্ণ তাহার বিপরীত ভাব প্রকাশ করিয়া কষ্ট পাইতে হইতেছিল না। সুতরাং স্বাভাবিক প্রফুল্লতায় রমার মন পরিপূর্ণ। নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ও এখন আর কোনরূপে সন্দেহতরঙ্গে আন্দোলিত নয়, সুতরাং সে হৃদয়েও এখন চিরশান্তি বিরাজমান। রাও সাহেবও নরেন্দ্রনাথের চরিত্রগুণে মোহিত হইয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সেই উন্নতহৃদয়ও এখন সম্পূর্ণ প্রফুল্ল।

রাও সাহেব নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন—''আপনি সমুদ্রতীরে এদেশের ভদ্রমহিলাগণকে বেড়াইতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, সুতরাং রমার ঐরূপ বিস্ময়জনক ব্যবহারে নিশ্চয়ই অধিকতর বিস্মিত হইয়া থাকিবেন।''

নরেন্দ্রনাথ বিনীতভাবে উত্তর করিলেন—"পূর্ব্বঘটনা সমস্তই এখন যেন আমার স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে।"

রাও সাহেব। আপনাদের দেশে স্ত্রী স্বাধীনতা নাই, কিন্তু আপনি স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষ কি না তাই বলুন দেখি।

নরেন্দ্র। আমি এরূপ স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষ নই। বিশেষতঃ আপনি আপনার স্ত্রীকে যেরূপ স্বাধীনতা দেন, তাহা মনে হইলে এখনও আমার দেহ রোমাঞ্চিত হয়!

রাও সাহেব। যে স্ত্রীলোক যেরূপ স্বাধীনতার উপযুক্ত, আমরা তাহাকে সেইরূপ স্বাধীনতা দিয়া থাকি। আমি রমাকে অতিরিক্ত স্বাধীনতা কিছুই দিই নাই।

নরেন্দ্র। মনে করুন—যদি আমি আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া বিশ্বাসঘাতক হইতাম, তাহা হইলে কি হইত বলুন দেখি?

রাও সাহেব রমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা হইলে কি হইত রমা?"

রমা তৎক্ষণাৎ আপনার কবরী হইতে এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তা হইলে এই সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা সেই বিশ্বাসঘাতকের হৃদয়ের রক্ত পান করিত!"

নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে তিনি এতদিন যাহাকে কবরীর ভূষণ মনে করিয়া আসিতেছিলেন—সেই হীরকাদিখচিত অলঙ্কার কেবল শোভার জন্য নহে, তাহার একদিকে অলঙ্কার আর অন্যদিকে সুতীক্ষ্ণ ফলা!

অল্পক্ষণ পরেই কিন্তু নরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"কিন্তু তত্রাচ আমি আপনার এরূপ স্ত্রীস্বাধীনতার প্রশংসা করিতে পারি না। আচ্ছা মনে করুন, যদি আমি হঠাৎ আপনার স্ত্রীর দুই হাত

ধরিয়া ফেলিতাম এবং ঐ অস্ত্র ব্যবহার করিতে তিনি সম্পূর্ণ অক্ষম হইতেন। তা হইলে কি হইত ভাবুন দেখি।”

রাও সাহেব এবারও ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—“সে জন্য আমি ও আমার ভৃত্য রঘুজী প্রস্তুত ছিল। আমি বিলাসবতীর পত্র পাইয়া গোপনে প্রথমে রমার সহিত সাক্ষাৎ করি ; আমারই অনুরোধে রমা তোমায় সেরূপ পত্র লিখিয়াছিল। তার পর বিলাসবতীর সাক্ষাতে এই ঘটনা ঘটিয়াছে।”

নরেন্দ্র। আপনি ইচ্ছা করিয়া কেন এরূপ বিপদজনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন—তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

রাও সাহেব। আপনি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, আর আমরা মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। বাঙ্গালীর সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রভেদ দেখান, আর একজন বাঙ্গালীর চরিত্র পরীক্ষা করিবার জন্য আমার এই কৌতুক।

নরেন্দ্র। আপনার সহধর্ম্মিনীর নিকট আমি এক বিষয়ে বিশেষ অপরাধী আছি। আমি তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে অন্যায় সন্দিহান হইয়া অনেক কর্কশ কথা—

এইবার নরেন্দ্রনাথের সে কথায় বাধা দিয়া রমা বাই বলিলেন,—“সে অবস্থায় সেরূপ ব্যবহার না করিলে আমিও আপনার চরিত্রসম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া মনোকষ্ট পাইতাম।”

নরেন্দ্র। আমাদের দেশে পুরুষের সহিত অন্য স্ত্রীলোকের কোনরূপ বন্ধুত্ব হইতে পারে না ; এখানে আসিয়া কিন্তু আমি আপনার ন্যায় একজন অমূল্য স্ত্রী-বন্ধু লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, এবং আমার বিদেশ ভ্রমণও সার্থক হইয়াছে।

রমা। আপনি আমার কেবল বন্ধু নন। আমি আমার

জননীর একমাত্র কন্যা। আমার বড় দুঃখ যে এসংসারে আমার কোন ভাই নাই। এখন হইতে আমি আপনাকে আমার সহোদর ভাই বলিয়া আজীবন ভক্তি করিব। ছোট ভগিনীর সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহার প্রণাম গ্রহণ করুন।

এই শেষোক্ত কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে রমা নরেন্দ্রনাথের চরণে প্রণতা হইল। নরেন্দ্রনাথ আনন্দে অধীর হইয়া সাশ্রুনয়নে "রমা —আমার স্নেহের ভগিনী রমা"—বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

এই সময় মোহিনী সেইগৃহে দৌড়িয়া আসিয়া বলিল "সর্ব্বনাশ হয়েছে—সর্ব্বনাশ হয়েছে—বিলাসবতী বিষ খেয়ে প্রাণত্যাগ করেছে!"

তিন জনেই তৎক্ষণাৎ স্তম্ভিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিন জনেই দ্রুতগতিতে বিলাসবতীর শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু আসিয়া যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে কাহার মুখে আর কথাই নাই! তাঁহাদের আসিবার অনেকপূর্ব্বেই বিলাসবতীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছিল। রমাবাই কাঁদিয়া আকুল হইলেন। কিছুক্ষণ পরে এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাও সাহেব বলিলেন "নরেন্দ্রবাবু, আপনাদের দেশে এখনও স্ত্রী স্বাধীনতার সময় হয় নাই; আপনাদের স্ত্রীস্বাধীনতার ফল এই হতভাগিনী বিলাসবতী; আর আমাদের দেশের স্ত্রীস্বাধীনতার ফল দেখুন—এই আমার **রমা বাই।"**

—০○০—

শ্মশানে সন্ন্যাসী।

১।

"বলো হরি—হরি বোল"—ধ্বনিতে চারিদিক কম্পিত করিতে করিতে আমি শব বহন করিয়া নিমতলার শ্মশান-ঘাটে চলিয়াছি। আমার সঙ্গে আরো পাঁচ জন লোক ছিল। আমরা কলিকাতার বড় রাস্তা দিয়া চলিয়াছিলাম, আর আমাদিগকে দেখিয়া রাস্তার লোকে দূরে পলাইতেছিল। আমাদের হরিধ্বনিতে অনেকেই আবার শিহরিয়া উঠিতেছিল। মৃত্যুকে এত ভয় কেন? জন্ম হইলেই যখন নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে, তখন মৃত্যুকে এত ভয় করিলেই বা চলিবে কেন? আমি রাস্তার লোকের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া এই কথা মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিলাম। এই কথা হইতে একে একে কত কথা আমার মনে উদয় হইতে লাগিল। জন্মের পর মৃত্যু হয় কেন? এ মৃত্যুর উদ্দেশ্য কি? মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কি সব শেষ হয়, না মৃত্যুর পরও মনুষ্যের অবস্থান্তর ঘটে? আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে বলে—মৃত্যুর পর মানুষের আবার জন্ম হয়। কিন্তু জন্ম হইবার পূর্ব্বে—স্বর্গ-নরকও অবশ্যই ভোগ হইয়া থাকে। অন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের মতন

আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক নাই। আমার মনে হইতে লাগিল—তবে হিন্দু হইয়া মৃত্যুকে লোকে এত ভয় করে কেন? এ মৃত্যু ত মৃত্যুই নয়। হিন্দুকে ত মৃত্যু ভয় করিতেও নাই। অদৃষ্ট মানিয়া চলিলে, বাস্তবিক কোন ভয়ই হিন্দুর আদৌ থাকে না। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলই আমরা এ জন্মে ভোগ করিয়া থাকি। যাহা অদৃষ্টে আছে—তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে—তবে ভয় করিব কাহাকে? ভয় কাহাকে বলে—হিন্দুর তাহা জানা উচিত নহে। আজ স্বচক্ষে সেই ভয়শূন্য মৃত্যু দেখিয়াছি। তাই থাকিয়া থাকিয়া আমার মনে এই সকল কথা উদয় হইতেছে। আমি আজ কাহার শব বহন করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইতেছি—জান কি? এ শব আমার ভ্রাতৃজায়া বড় বধূঠাকুরাণীর।

বধূঠাকুরাণী এ সংসারে কেবল কষ্ট সহ্য করিতে আসিয়াছিলেন, কষ্ট সহ্য করিয়া চলিয়া গেলেন। তবে আমরা যাহাকে কষ্ট বলি—বধূঠাকুরাণী তাঁহার অসহ্য সহিষ্ণুতাগুণে সে কষ্টকে কষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন না! শৈশবে বধূঠাকুরাণীর পিতৃমাতৃ বিয়োগ হয়। একজন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের যত্নে লালিত-পালিতা হইয়া বধূঠাকুরাণী আমাদের গৃহ আলো করেন। কিন্তু তিনি এখানে আসিয়াও সুখী হইতে পারেন নাই। গুরুনিন্দা করিতে চাহি না, কিন্তু বধূঠাকুরাণীর কষ্ট দেখিয়া অনেক সময় আমি নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি।

আমার দাদার মৃত্যুর পর হইতে বধূঠাকুরাণীকে আমি চিনিলাম। আগুনে না পোড়াইলে সোনা চেনা যায় না। চিনিলাম—বধূঠাকুরাণী পাকা সোনা। এরূপ পাকা সোনা এ সংসারে

দুর্ল্ভ। সেই জন্যই এত অল্প বয়সে বধূঠাকুরাণী চলিয়া গেলেন। বধূঠাকুরাণীর পঁয়ত্রিশ বৎসর মাত্র বয়স—এই বয়সেই তাঁহার সকল সাধ—সকল আহ্লাদ ফুরাইয়া গেল। আজ দুইমাস পূর্ব্বে তিনি যে শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন, সে শয্যা আর ত্যাগ করেন নাই।

ডাক্তার কবিরাজ আনিলে বধূঠাকুরাণীর রাগের সীমা থাকিত না। আত্মীয়স্বজন আসিয়া ভাল হইবে বলিলে বধূ-ঠাকুরাণীর মুখখানি বিষণ্ণ হইয়া যাইত। ঔষধ খাইতে হইলে বধূঠাকুরাণীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইত। মৃত্যুকে ভয় করা দূরে থাকুক—সাদরে আলিঙ্গন করিবার জন্য বধূঠাকুরাণী শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেন; মনেত তাঁহার পাপ ছিল না—সুতরাং তিনি মৃত্যুকে ভয় করিবেন কেন? তবে যে এত কষ্ট ভোগ করিলেন—সে কেবল পূর্ব্ব জন্মের অদৃষ্টের ফলে।

২।

"বলোহরি হরিবোল" বলিতে বলিতে আমরা শ্মশানে আসিয়া পৌঁছিলাম। এইখানে শব পৌঁছিয়া দিলে শববাহকের আর বিশেষ কোন কার্য্য থাকে না। গঙ্গাপুত্র আসিয়া একবার শব দেখিতে চায়, শব দেখা হইয়া গেলে মৃত্যুরেজষ্টারী করিতে হয়—তার পর ৩৵০ আনা জমা দিলেই তোমার কার্য্য ফুরাইয়া যায়।

চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে—এমন সময় খটাখট্ খড়মের শব্দ করিতে করিতে এক সন্ন্যাসী শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীর পরিধানে গৈরিক বসন—মস্তকে জটাজুট লম্বমান, হস্তে কিন্তু কিছুই নাই! রাত্রি তখন চারিটা। নিমতলার শ্মশানঘাটে

এরূপ সন্ন্যাসীর দিকে আমার কোন লক্ষ্য ছিল না। এমন সময় আমাদের শবের একটা পা স্থানচ্যুত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। পড়িবামাত্র সেই সন্ন্যাসী দৌড়িয়া গিয়া সেই অর্দ্ধদগ্ধ পা-খানি স্বহস্তে উঠাইয়া লইয়া সেই জ্বলন্ত চিতায় তুলিয়া দিলেন! যে ভাবে সন্ন্যাসী এই কার্য্য করিলেন—তাহাতে বোধ হইল যে অগ্নির দাহিকাশক্তি তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ পরাভূত হইয়াছে! শ্মশানস্থ সকল লোকে অবাক হইয়া গেল। আমার মুখ হইতে তৎক্ষণাৎ বাহির হইল—"আপনি কি করেন! ছোঁবেন না—ছোঁবেন না।"

সন্ন্যাসী আপনার কার্য্য শেষ করিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"কেন বাবা, আমিত কোন মন্দ কাজ করি নাই। এ যে আমার মা! আমি মার শেষ কাজ করতে এসেছি। এতে তোমাদের কি আপত্তি আছে বাবা?"

আমি কহিলাম—"দেখুন, এ যে ব্রাহ্মণের মড়া আপনি সন্ন্যাসী সুতরাং আপনার এ মড়া স্পর্শ করা উচিত নয়। আর কেবল স্পর্শ করা নয়—এখানে আপনি নিশ্চয়ই বুজরুকী দেখাতে এসেছেন। তা না হলে অমন জ্বলন্ত চিতার মধ্যে আপনি কি করে হাত দিলেন? আপনাকে কিছু পয়সাকড়ি দিচ্ছি, আর অমন বুজ্রুকী দেখাবেন না।"

সন্ন্যাসী। তোমার পয়সা কড়ি আমি ত চাই না বাবা।

আমি। তবে কি চান?

সন্ন্যাসী। এক ছিলিম গাঁজা খাওয়াতে পারিস্?

আমি। গাঁজা এখন কোথায় পাবো?

এই সময় অপর শববাহক দলের এক ব্যক্তি আসিয়া কহিল —"আমার কাছে গাঁজা আছে।"

সন্ন্যাসীর হুকুমে তৎক্ষণাৎ সে গাঁজা প্রস্তুত করা হইল। সন্ন্যাসী প্রাণ ভরিয়া গাঁজা সেবন করিলেন। তার পর আরো তিন চারি জন লোক সন্ন্যাসীর প্রসাদ গ্রহণ করিল। এইরূপে সন্ন্যাসীর হুকুমে আরো দুই ছিলিম গাঁজা প্রস্তুত হইল এবং সন্ন্যাসীও অম্লানবদনে তাহা সেবন করিলেন। সন্ন্যাসীর প্রথম কার্য্য দেখিয়া আমার মনে যে ভক্তির উদয় হইয়াছিল, এইরূপ উপর্য্যুপরি গাঁজা সেবন করিতে দেখিয়া আমার সে ভক্তি উড়িয়া গেল। আমি তখন সন্ন্যাসীকে এক জন ভণ্ড যোগী মনে করিয়া বিরক্ত হইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলাম।

৩।

সন্ন্যাসী এইবার আমাদের শবদাহ কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। আর মধ্যে মধ্যে "মা—মা" রবে শ্মশানভূমি কম্পিত করিতেছিলেন। দেখিলাম—পুনরায় আবশ্যক হইলেই সন্ন্যাসী জ্বলন্ত চিতার মধ্যে হাত দিতে লাগিলেন। আমি সন্ন্যাসীকে কহিলাম—"কি করেন—আপনার হাত পুড়ে যাবে যে!"

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া আমায় সেই হাতখানি দেখাইয়া কহিলেন—"হাত পুড়বে কিরে বাবা? আমার হাতের একগাছা লোমত কই পোড়ে নাই!"

চিতার আলো ও মাথার উপরের গ্যাসের আলোয় আমি সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম—সন্ন্যাসীর কথাই সত্য—হাতের এক গাছি লোমও পোড়ে নাই! এই সময় একটা কৃষ্ণবর্ণ কুকুর কোথা হইতে শ্মশানের মধ্যে দৌড়িয়া আসিল। সন্ন্যাসী তখন চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"এইবার আমার আনন্দময়ী মা গঙ্গাস্নানে আস্‌ছেন।"

আমি বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিলাম ! সন্ন্যাসী কহিলেন—"তুই আনন্দময়ী মাকে দেখ্বি ?"

আমি বসিয়া ছিলাম—উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তার পর সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানের দক্ষিণ দিকের স্নানের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী কহিলেন—"ঐ মা আনন্দময়ী গঙ্গাস্নান কর্‌ছেন ; মা না স্নান করে গেলে, আমার স্নান করা হবে না।"

আমি চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম—কোথাও কেহ নাই—তখন একজন প্রাণীও ঘাটে স্নান করিতে আইসে নাই। তৎক্ষণাৎ আমার মুখ হইতে বাহির হইল—"কই মা আনন্দময়ী ?"

"ঐ যে মা স্নানের পর ধীরে ধীরে চলিয়া আসিতেছেন।" এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী যেন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। আমি তখন বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিলাম, এমন সময় সন্ন্যাসী আমার হাত ধরিয়া টানিয়া সিঁড়ি দিয়া গঙ্গাতীরে নামিতে নামিতে বলিলেন—"আয় তোমে মাকে দেখাবো—আয় !"

কয়েকটি সিঁড়ির ধাপ নামিয়া সন্ন্যাসী আমায় বলিলেন—"এই দেখ—মার পদচিহ্ন।"

আমি বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া দেখিলাম—এইমাত্র কোন স্ত্রীলোক যেন স্নান করিয়া উঠিয়া গিয়াছেন—সেইরূপ জলসিক্ত পদচিহ্ন সিঁড়ির ধাপে ধাপে রহিয়াছে ! কি আশ্চর্য্য ! আমিত সিঁড়ির উপর রহিয়াছি—কাহাকেও স্নান করিয়া যাইতে ত দেখি নাই, সুতরাং সেই জলসিক্ত পদচিহ্ন কোথা হইতে আসিল ? তবে কি যথার্থই আনন্দময়ী আমার পাপ চক্ষের অগোচরে স্নান করিয়া গেলেন ! আমার গা তৎক্ষণাৎ রোমাঞ্চিত হইল—আমি সেই পদচিহ্নে মস্তক লুটাইতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরে চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম—কিন্তু সে সন্ন্যাসীকে আর দেখিতে পাইলাম না !

সম্পূর্ণ।